একটি স্মরণীয় রাত্রি

নিবেদন

চরকাশেম, পদ্মদীঘির বেদেনী, দক্ষিণের বিল-এর ঔপন্যাসিক অমরেন্দ্র ঘোষ দুর্ভাগ্যের বিষয় বিস্মৃতির কবলে—কিন্তু কেন, তার বিচার সাহিত্য-সমালোচকদের, প্রকাশকের নয়। আমরা কেবল আমাদের দায়িত্ব পালন করবার জন্যই এযাবৎ অগ্রন্থিত 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'একটি স্মরণীয় রাত্রি' প্রকাশ করলাম।

অমরেন্দ্রনাথ-এর জন্ম ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭-এ অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলার শুক্তাগড়ে। বাবা জানকীকুমার ঘোষ। আই. এস. সি পর্যন্ত পড়ে জীবিকার্জনে প্রবৃত্ত হ'তে হয় সাংসারিক প্রয়োজনে। সরকারের খাদ্য বিভাগে চাকরি নেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। চাকরির সঙ্গে চলে তাঁর সাহিত্য-সাধনা। দেশভাগ, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত যাত্রা ছিল তাঁর লেখার প্রধান উপজীব্য।

চরকাশেম, দুই খণ্ডে দক্ষিণের বিল, পদ্মদীঘির বেদেনী ছাড়াও ভাঙ্গছে শুধু ভাঙ্গছে, একটি সঙ্গীতের জন্ম কাহিনী, কনকপুরের কবি, বে-আইনী জনতা, জোটের মহল, মন্থন তাঁর বিখ্যাত বই।

১৯৪২-র ১৪ জানুয়ারি-তে মাত্র পঞ্চান্ন বছরে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

সমাজ-সচেতন ও জীবনমুখী এই ঔপন্যাসিকের অগ্রন্থিত উপন্যাসটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে আশা রাখি।

বিনীত

প্রকাশক

এই লেখকের কয়েকটি বই

চরকাশেম
পদ্মদীঘির বেদেনী
ভাঙছে শুধু ভাঙছে
একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী
কনকপুরের কবি
বে-আইনী জনতা
জোটের মহল
মন্থন
দক্ষিণের বিল (১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড)
কুসুমের স্মৃতি
ঠিকানা বদল
অহল্যা কন্যা
রোদন ভরা এ বসন্ত
স্বনির্বাচিত গল্প
মন দেয়া নেয়া
নাগিনী মুদ্রা
কলেজস্ট্রিটের অশ্রু
মৃগসৌরভ
জবানবন্দী
জি-হুজৌর
অমরেন্দ্র ঘোষের সেরা গল্প
অনাস্বাদিত চুম্বন
অথচ সিঁড়িটা একদিন এমন ছিলনা
এপার ওপার
ধূসর রাগিণী
সমুদ্র পোত
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ
ফসল (গীতিনাট্য)

এক

পাঁচটা দশ, ‘ক পনর। ডালহৌসি স্কোয়ারের অফিসগুলো দিয়ে জলপ্রবাহের মত মানুষ নামছে—বড় সাহেব, কেরাণী, মেয়ে টাইপিস্ট, বেয়ারা। নীল কিংবা লাল উর্দিপরা দারোয়ানগুলো আর হাত ফিরাতে পারছে না। সময়তে ভুল করে অপ্রতিভ হয়ে পড়ছে। জীবন যুদ্ধে যে কখনো সামান্য একটি বিশুদ্ধ সেলাম পর্যন্ত পায় নি, তারই ভাগ্যে হঠাৎ জুটে যাচ্ছে রাজকীয় কুর্ণিশ।

রাস্তা, ফুটপাত, ট্রাম, বাস দেখতে দেখতে সব ভরে গেল।

একটু পূর্বের টাকা, আনা, পাউণ্ড শিলিং যেন দমকা হাওয়ায় উড়ে গেল। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না লেজার, ড্রাফ্‌ট। ছুটির উল্লাসে যেন চাপা পড়েছে এতক্ষণের গুরু গাম্ভীর্য।

নিতান্ত নিয়মতান্ত্রিক বড় বাবুও একটু কেমন যেন বেহিসেবী হয়েছেন।

সমগোত্রীয় বন্ধুর কাছে বলছেন, ও ট্রামটা যাক্ না পাঁচু, একটা মজার কথা শোনো। হরিদাসের ছেলেটা পাশ করল বটে বাংলায় এম. এ.—কিন্তু একটা লেটার ড্রাফ্‌ট করতে জানে না। আমার কাছে লিখেছে কিনা প্রীতিভাজনেষু।

তাই নাকি! বিস্ময়ে পাঁচুবাবুর প্যাঁচার মত মুখখানাও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভাগ্যিস আমরা এম. এ.—বি. এ. পাশ করিনি।

বড়বাবুর আর কোন জবাব শোনা যায় না।

অল্পবয়সী কয়েকটি মেয়ে কেরাণীর তরল হাসি ভেসে আসে।

তারপর শুধু মানুষের উর্মিমালা। কুলায় প্রত্যাশী পাখীর যেন পক্ষ বিধুনন। অবকাশের উত্তেজনায় অধীর জনতা চতুর্দিক সচকিত করে চলে।

কিন্তু মনে হয় সওদাগরী অফিসগুলোর যেন মুখ ভার। একটা দুটো করে বন্ধ হচ্ছে কপাট। কোথাও বা শেষ অংকের মত নামবে পর্দা ঝুল বারান্দায়, ঘনিয়ে আসে শীতের সন্ধ্যা।

এর পর ফ্যাকাশে কফিনের মত কনকনে নিঃসঙ্গ রাত্রি। হিসেবী অফিসগুলো যেন গোমড়া মুখে চেয়ে থাকে।

চেক সই হয়নি। হুণ্ডি হ্যাণ্ডনোট এখনো পাওয়া যায়নি। আজ হিসেব মিলাতে পাবেনি নতুন ক্যাশিয়ার, লোকসান, লোকসান—কেবলই লোকসান। কি করে মিট করা যাবে সাম্বৎসরিক বাজেট?

বৃদ্ধেব চোখের পাতাব মত বড় বড় ইমারতগুলোর সার্শি বুজে যায়।

হঠাৎ হেসে ওঠে অমিয়।

আজ তোমাকে যেতেই হবে নিখিল, সার্টের কলারটা অমিয় চেপে ধরে তার।

কোথায়? নিখিল জিজ্ঞাসা করে, ভয়ে ভয়ে চেয়ে থাকে। অমিয় কি ড্রিঙ্ক করেছে এর ভিতর?

ভিড়ের চাপে ট্রাফিক বন্ধ হয়েছে। ওরা দুজনেই একটু থামে। নিখিল ভাল করে তার স্বল্প দামের ময়লা মোটা চাদরটা গায়ে জড়ায়। বড্ড শীত। তা' এর মধ্যে কোথায় যেতে চাইছ?

একটু গরম হতে। মনে নেই কথা দিয়েছিলে গত কাল?

আমি? মনে তো পড়ে না। কোথায় যাবি বলতো? চাদরের নীচ দিয়ে একটা রেশন ব্যাগ বেরিয়ে পড়েছিল, সেটাকে তাড়াতাড়ি সামলাতে চেষ্টা করে নিখিল।

বামাল নাকি? বাঁ হাতে অমিয় নিজের টাইটা একটু ঠিক করে, ডান হাতে টেনে বার করে ব্যাগটা।

ওকি মাইরি? লোকে বলবে কি বলতো? নিখিল সংকোচে একটু সরে যেতে চায়, সে টানাটানি করে ব্যাগটা ধরে।

কিন্তু কেমন যেন তেল চিটচিটে ঠেকে অমিয়র হাতে সে-ই ঘৃণায় ছেড়ে দেয় ব্যাগটা। দিয়েই রুমাল বার করে পকেট থেকে।

নিখিল সমস্ত বুঝতে পারে। সে আরো যেন মরমে মরে যায়।

অথচ দুজনে একই অফিসে কাজ করে। একই মাইনে, ডিয়ারনেস। নিখিলের মাঝারি গোছের একটা সংসার ঘাড়ে। সে আবার নাকি বিয়েও করেছে এই কিছুদিন আগে। অমিয়র কোন দায়িত্বই নেই।

তাই একজনে যখন ড্রাইওয়াশ করা সার্জের কোট প্যাণ্ট পরে, অপরে কুণ্ঠিত হয়ে থাকে ছেঁড়া স্যাণ্ডেল পায়। জামার পিঠটাব ওপর দিয়ে তো নিখিল মরে গেলেও চাদরটা সরায় না।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে আজকাল প্রায়ই পড়তে হয় নিখিলকে। তবু বন্ধুত্বের দাবী সে ত্যাগ করে না। অমিয় মুখ ফিরিয়ে নিলেও দায়ে পড়ে ওকে তোয়াজের সুরে কথা বলতে হয়। মাসের প্রথম দিক যেকাল দেখলে

শেষের দিকে তো বটেই। একটা দিন তফাৎ তফাৎ থাকলে উপায় নেই।

এখন সেই মাস কাবারের মুখ।

কি বলেছিলাম রে? আমার তো মনে নেই।

তা থাকবে কেন? এতক্ষণ মনে ছিল রিসিভডেসপ্যাচ, এবার মন জোড়া বেগুন, আলু, কাঁচা কুমড়া—যত সব বাজে ফরমাস। তারপর একদিন দেখা যাবে রবারের চুষি, অয়েল ক্লথ। তুই টিপিক্যাল ভেতো বাঙালা। আই মিন্ ভেতো কেরাণী। এমন পরিবর্তনও মানুষের হয়!

ভেবেছিলাম বিয়ে করব না। মা নেই বুড়ো বাবা ও ছোট ভাই এল দেশ থেকে। কবার কটা ঝি চাকর রাখলাম, একটাও স্থির হয় না তাই শেষকালে মত দিলাম।

তাই নাকি? বেশ করেছ। একটা স্থায়ী সমস্যার সমাধান হল। এ কেরাণীটি আর উঠে যেতে পারবে না! একেই বলে পাকা বৈষয়িক বুদ্ধি। এককালে দেশে বোধহয় বেশ কিছুটা বিষয় সম্পত্তি ছিল?

নিখিল কিছু বলে না। সে চিন্তা করে দেখে এক হিসাবে অমিয়র কথা সত্য। কিন্তু তার অতিরিক্তও কিছু আছে। সে আস্বাদ নিখিল বার বার পেয়েছে। তার মনে পড়ে স্ত্রীর গোলগাল সদাপ্রফুল্ল মুখখানা।

ওরা হেঁটে চলে।

তা এতদিন আমাকে বলিস নি কেন? আমি তো কম দিন জয়েন করিনি ছুটি কাটিয়ে। আন্দাজে হানা না দিলে তো জানতেও পেতুম না এ বাহাদুরীর কথা। সাবাস কেরাণী ভীম সেন!

কিছু সময় অমিয় আর কথাবার্তা বলে না। সে যেন উন্মনা হয়ে কত কি ভাবে নিখিল ঠাহর করে। ব্যাগটা যে অমিয় ছুঁয়েছে তারই অস্বস্তিকর অনুভূতিতে সে যেন অভিভূত। ইতিমধ্যে রাস্তার আলোগুলো জ্বলেছে। দোকান পসারে উজ্জ্বলতর হয়েছে নিয়ন লাইটের উগ্র দীপ্তি। বিজ্ঞাপনের আলোর ঝলকানি আরো যেন তীব্রতা পেয়েছে। মাঝে মাঝে প্রতিফলিত হচ্ছে ওদের দেহে।

অমিয়র মনের যেন তাল কেটে গেছে। চড়া সুর একেবারে যেন খাদে নেমে এসেছে। এখন সে চায় নিখিলকে ত্যাগ করতে। *কথা কি বলে যাবে?

তুই থাকিস কোথায়?

একেবারেই অন্য প্রশ্ন—একটু পূর্বের তুলনায় অবান্তরও বটে। নিখিল জবাব দেয়, কেন তুই কি জানিস নে? এই কটা মাসের মধ্যে ভুলে গেলি

সব? কলোনীতে।

ও, জানব না কেন একদিন বলেছিলি।

মাত্র এক দিন! একটু হাসে নিখিল। আমাদের কথা মনে রাখার মত নয় তাই ভুলে গেছিস।

দূর তা নয়। সারা রাজ্যের আজে বাজে কথা আমার মনে থাকে না।

তা বটে! নিখিল একটু আঘাত পায়। কিন্তু সে প্রতিবাদ করে বলতে পারে না, কি করে অমিয় স্মরণ রাখে যত বাজে বন্ধু-বান্ধবী সার্কাস সিনেমা এ্যাক্টট্রেসদের কথা—স্মিতা, রেখা, অনুভা প্রভৃতির অতি তুচ্ছতম ঘটনাদি পর্যন্ত সে কোনদিন ভোলে না।

একখানা ছ'নম্বর স্টেট বাস এসে থামে। নিখিল একটু উসখুস করে ওঠে। কোন রকমে অমিয়র খপ্পর এড়াতে পারলে হয়!

যাবে নাকি—যা না। এরপর বৌ কাঁদবে।

তেমন বৌ নয়রে। বাস্ত কি, পরে যাব। আর ওটা তো ছ'নম্বর নয়, মনে হল যেন ন' নম্বর।

প্লেটটা হয়তো উল্টো লাগিয়েছে।

গৌরী সেনের কোম্পানী। হবে না?

তুই আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলি?

বেজায় শীত একটু গরম হতে, মেট্রোতে। একখানা ভাল বই নাকি চলছে: ড্যান্স ড্রামা!

না, না তা হয় না ভাই। কি করে বাজার নিয়ে ফিরব রাত দশটায়?

এবার কি যেন তার হয় নিখিল সমস্ত জড়তা কাটিয়ে ওঠে। তার গলার স্বর সম্যক না হলেও বার আনা বদলায়।

একটু আশ্চর্য হয় অমিয়। এমন যে নিখিল করবে তা সে জানত। তবু জানা কথায় সে যেন কেমন ঘা খায়! বিস্ময় কেটে গিয়ে জন্মে অহেতুক ক্রোধ। কেন বলতো যেতে পারবি নে?

যা বললাম ঐ পর্যন্তই বলা যায়—তার অতিরিক্ত বোঝান যায় না।

যাবি কি করে? একেবারে যে ভেড়া বনে গেছিস। তারপর আরো একটু ব্যঙ্গের মাত্রা চড়িয়ে অমিয় বলে, কি করে বাজার নিয়ে ফিরব রাত দশটায়? বলতে লজ্জা করল না পুরুষ মানুষ হয়ে?

ঠিক লাগসই জবাব দিতে না পেরে নিখিল চুপ করে থাকে। ওরা মোড় ঘুরতেই এক ঝলকা আলো এসে পড়ে নিখিলের মুখে। কতদিন যে দাড়ি কামায় নি। ময়লা চাদরটা আরো যেন ময়লা দেখাচ্ছে।

অমিয় বলে, এতক্ষণ আমি ঠাট্টা করছিলাম। তোকে নিয়ে আজকে মেট্রোতে ঢোকাই যেত না। তোর বৌ কি কেঁদে কেটে প্রাণনাথ বলে সিকনি পোঁছে এই চাদরটায়? গুড নাইট—কাল দেখা হবে ফের দশটায় গুড নাইট, মনে কিছু করিস নে।

অপমানের জ্বালায় নিখিলের চোখ দুটো ছল ছল করে।

দুই

নিখিলের পরিবেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে অমিয় হাঁফ ছাড়ে। একটা দোকানের লাইটের সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে নিজের পোষাকটার দিকে। কোথাও কিছু লেগে যায় নি তো। সবই ধোপ দুরস্ত ফিটফাট। তবু সে বার কয়েক টোকা দেয় কোটের হাতায়।

গুটি তিনেক মেয়ে আসছে পিছন থেকে। একটির গায়ে ইংলিশ কোট, বাকী দুটি স্কার্ফে মোড়া। কিন্তু শাড়ির পাড় তিনটিরই এক ছন্দের। পায়ের জুতোর লঘু অথচ যান্ত্রিক শব্দ সচকিত করে আশপাশের পথিককে।

অমিয় স্মার্ট হয়ে দাঁড়ায়।

ওরা কাছাকাছি আসে। পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ওরা আদৌ কারুকে লক্ষ্য করে না। তবু অমিয় সসম্ভ্রমে সমুদ্ধত হয়ে থাকে। চেয়ে দেখে লুটিয়ে পড়া পাড়গুলির চঞ্চল নৃত্য। তিন রংয়ের তিনটি ময়ূর যেন পেখম মেলে চলেছে।

আবছা ও উজ্জ্বল আলোতে ওদের রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছে। অমিয় ভাবে, ওর মধ্যে তার অতি পরিচিত যেন কে আছে।

অমিয় পিছন পিছন এগিয়ে আসে। কিন্তু দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

মেয়ে তিনটি লাট সাহেবের বাড়ির বিপরীত ফুটে এসে থামে।

অমিয়কেও এখন থামতে হয়।

একটু দাঁড়িয়েই অমিয় অস্বস্তি বোধ করে। ওরা পিছন ফিরলে সর্বনাশ—কিছু যদি সন্দেহ করে!

করুক না! তরুণের প্রতি তরুণীর সন্দেহ। এ তো অতি মধুর শাশ্বতকালের ইতিহাস। শুধু বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মাত্র। ওমর খৈয়ামের সাকি কেন তারও বহু পূর্বের কোন তন্বী যেন রাখি বন্ধন পাঠিয়ে দিয়েছে এই বিংশ শতকের রাজপথে। সেই রাখির এই রং লেগেছে ঐ মেয়ে তিনটির গায়।• স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবু যেন যৌবন উছলে পড়ছে সর্বাঙ্গে।

যাকে অমিয় খুঁজছে, ওদের মধ্যেও সে লুকিয়ে থাকতে পারে।

অমিয় একটা সিগারেট ধরায়। একটু একটু করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী মিশে যেতে থাকে শীতের সান্ধ্য বাতাসে। আবার সে টানে, পুনর্বার ধোঁয়া ছাড়ে। সিগারেটটা অর্ধেক নিঃশেষিত হয়ে যায়।

ওদের কথা শেষ হয় না। ঘড়িতে বাজে পৌনে ছটা। ভাল বই টিকিট পাওয়া যাবে কিনা। কে জানে?

বড্ড মুস্কিলে পড়া গেল তো।

অমিয় আর দাঁড়াতে চায় না। তার চাঞ্চল্য প্রকাশ হয়ে পড়ে সিগারেটের ঘন ঘন টানে।

কি কথার প্রসঙ্গে যেন ওরা এক সঙ্গে হেসে ওঠে। এমনি করেই তো সে হাসত। অমিয় টিকিট পাওয়া না পাওয়া প্রশ্ন ভুলে যায়। ওপারের তরঙ্গ যেন এপারের বুকে এসে ভেঙে পড়েছে। ঝিন ঝিন করে ওঠে তার শোণিত কনিকাগুলি।

কি কথা বলছে, একটু কি শোনা যায় না? অমিয় কান পেতে থাকে। বিধুর মন তার সমগ্র দুয়ার অকপটে খুলে দেয়। জানায় সুস্বাগতম।

অমিয় আর একটা সিগারেট ধরায়। ধরিয়ে একটু পায়চারি করে অন্যমনস্ক নায়কের মত। এখন এইতো তার জীবননাট্য—যত কাল বাঁচবে ততকাল এই অভিনয়। কিন্তু বড় দুরূহ ভূমিকা—শুধু খুঁজে খুঁজে ফেরা। শুধু আঁখি জল ফেলা।

কোন কথা স্পষ্ট বোঝা যায় না।

ভীরু দক্ষিণ বাতাস। উন্মুক্ত উদাস বাতায়নে প্রবেশ করতে যেন সাহস পাচ্ছে না। ও একটু এগিয়ে যাবে নাকি?

মেয়ে তিনটি আবার সরে যায়। লাস্যের ও লাবণ্যের ঢেউ যেন ফুটপাথে ছড়িয়ে পড়ে। ওরা আবার দাঁড়ায়।

ছটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। অমিয় মনে মনে বিরক্ত হয়। এখনো টিকিট পাওয়া যেত। আমেরিকান ড্যান্স ড্রামার আকর্ষণ এক অদ্ভুত।

ওরা তিনটে সখীতে কি কারুর জন্য অপেক্ষা করছে? কে সেই অতি সৌভাগ্যবান পুরুষ? অমিয়র ভিতরে ভিতরে হিংসা হয়। যেন প্রচ্ছন্ন বহ্নিমালা। ও আবার সিগারেট টানে।

সুমুখে চিরন্তনী নারী। কিন্তু সুর ও সুরা কোথায়? কোথায় বা ইরাণী গুলবাগ, মোঘল হারেম, বিদিশা, গান্ধার রাজ্য? অন্তত সে চেঙ্কের পাহাড়ী

পরিবেশ কোথায়—যেখানে এবারের মত শেষ সাক্ষাৎ ?

নিতান্তই ফুটপাথ, একান্তই জলন্ত সিগারেট—তবু মোহ জাগে। ভাল লাগে খুঁজতে। এ' এক পরম আশ্চর্য ? যুগ যুগান্তরের রূপকথা।

হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে।

বাবু, কাঁহা দাঁত কা দরদ কা দাওয়াই মিলতা ?

অমিয় গম্ভীর হয়ে থাকে। কিন্তু মনে মনে বলে, রাসকেল, জাহান্নাম মে। বলেই অমিয় একটু বিশেষ করে নজর করে দেখে। প্রশ্নকারী রাসকেল নয়—এক মহিলা। মহিলাও নয়—চিরন্তনী নারী। হয়ত মদ্রদেশীয়া—তবে নির্ঘাত ফুটপাতের বাসিন্দা। অন্তত বেশবাসে তাই মনে হচ্ছে।

পাগলী নাকি ? ঐ যে বিড়বিড় করছে ?

অমিয় সরে যায়…

ঠিক ছটা।

আমেরিকান ড্যান্স ড্রামা নাচতে শুরু করে বিলাসিনী মেট্রোর পর্দায়। কেন অমিয় দাঁড়িয়ে আছে। সে নিজেই যেন বুঝতে পারে না। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে এক প্রকার দৌড়ে চলে।

টিকিট পাওয়া চাই-ই চাই যে কোনো কাউণ্টারে, যে কোনো মূল্যে। অসম্ভব ভিড়। ধর্মতলার মোড়ের কাছ পর্যন্ত এসে একজনের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে যায়।

আপনি কি দেখতে পান না ?

ভেরি স্যরি ! ক্ষমা করুন।

ভদ্রলোক আপটুডেটও নন, মামুলি বিদেশী বুলির সাথে হয়ত মোটেই পরিচিত নন। ছেঁড়া স্যাণ্ডেলের ভিতর থেকে একখানা পা বার করে আনেন তিনি। একেবারে থেতলে দিলেন তো আঙুলটা। একটু দেখে শুনে চলতে হয়।

রেবতী, ও রেবতী—আবার কোথায় গেলি মা ?

অমিয় একেবারে কাচুমাচু হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ একটা ছোট-খাটো হট্টোগোল পাকিয়ে তোলবার উপক্রম করেন।

অমিয় প্রায় হাত জোড় করে থাকে। এক্সকিউজ মি দেখতে পাইনি বুঝলেন ? বড্ড লজ্জার কথা।

বুঝলাম তো, কিন্তু আমার আঙুলটাতো বুঝছে না। শীতের ব্যথা কি যেতে চায় ! বৃদ্ধ একটা উজ্জ্বল আলোর কাছে এগিয়ে আসেন।

একজন পথিক বিষয়টা সম্পূর্ণ না জেনেই বলে, ট্যাক্সি ডাকব—ফার্স্ট এড

লাগবে নাকি ?

হাসপাতাল ! অমিয় অবাক ও সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে যায়। ভাল করে ভিড় জমার আগে যা হক একটা প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেলে ভাল কি।

অপর এক ব্যক্তি বৃদ্ধকে বলে আর দেরি করছেন কেন বলুন তো ? হাসপাতালে যেতে হলে সময় থাকতেই যাওয়া উচিত। একবার আমার পিশেমশাই—

বাঃ রে আমার মেয়েটা আগে আসুক !

বোঝা গেল এখন বৃদ্ধের ষষ্টিটি না হলে কিছুই হবে না। সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। অমিয়ও নড়তে সাহস পায় না। একটু এদিক-ওদিক হলে হয়ত তাকে সবাই মিলে গাঁট কাটার মত কলার চেপে ধরবে। সাহেবী বেশ দেখে এখন আর কেউ ডরায় না।

একটি পনর ষোল বছরের ফ্রক পরা মেয়ে একখানা গোলাপী লাঠি চুষতে চুষতে এগিয়ে আসে। কি হয়েছে, একেবারে যেন বাঘে ধরেছে, কি হয়েছে তোমার বাবা ?

পাটা মা থেতলে দিয়েছেন ইনি।

আপনারা কি চোখের মাথা খেয়ে পথ চলেন ? দেখতেই তো পাচ্ছেন বুড়ো মানুষ—মেয়েটির আর বাক্যটা সমাপ্ত করা হয় না। রস জমেছে গোলাপী লাঠিটার গায়। সে তার পাতলা জিভটা বাড়িয়ে তা চেটে নেয়। তারপর পরীক্ষা করে দেখে পিতার পা-খানা।

সুন্দর মুখ, সুন্দর ভঙ্গি অমিয় চেয়ে থাকে নির্নিমেষে। এ মুখ যেন সে কোথায় দেখেছে। না, না—সেই মুখের একখানা কচি ছাপ যেন।

কিছুইতো হয়নি বাবা, কেবল তোমার আদিখ্যেতে। যান, যান আপনারা সরুনতো—এসো বাবা, উঠে এসো।

যে ক্ষুদ্র ভিড়টা জমেছিল তা ভেঙে যায়।

মেয়েটি পিতার হাত ধরে অধিক মনোযোগ দেয় রাঙা লাঠিটার দিকে। অমিয় মুগ্ধ হয় মেয়েটির মহানুভবতায়। এমনি উদারতা ছিল তার মধ্যে। কিন্তু সে কি বেঁচে আছে।

তখনো ভিড় কমেনি। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ট্রাফিক পুলিশ টহল দিচ্ছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে। লাল নীল আলোগুলো জ্বলছে নিবছে একচোখা রাক্ষসের মত। মোটরের হঠাৎ আর্তনাদ। কণ্ডাক্টারের চীৎকার। পেট্রোলের গন্ধ। ফেরিওয়ালার সনির্বন্ধ অনুনয়—সব জড়িয়ে যেন শীতের নৈশ আবহাওয়া থমথম করছে।

কিছুদূর এগিয়ে এসে মেয়েটি এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে শিয়ালদার বাস কোন্ স্টপে থামবে ?

এইতো সুযোগ। অমিয় এগিয়ে গিয়ে বলে, শিয়ালদা যাবেন ? চলুন না দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে এই বাসটা।

রোকো, রোকো কণ্ডাক্টার। বুড়োমানুষ উঠবেন।

মেয়েটি তার পিতাকে নিয়ে উঠে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে খালি হয়ে যায় মহিলা-সিট।

বসুন, বসুন।

ওকি, আপনিও কি শিয়ালদা যাবেন ? বাবা উনিও যাবেন।

সত্যি ? ভালোই হল নইলে নামতে উঠতে যে কষ্ট। দেখুন, তখন একটু লেগেছিল। এখন আর কোন বাথা নেই।

এ আপনার নিছক হার্টের পরিচয়। আমাকেই ক্ষমা করবেন। আমি আপনার ছেলের তুল্য।

না, না ওকি কথা ! তুমি দাঁড়িয়ে কেন ? বোসো তো বাবা ঐ খালি সিটটায়। রেবতী একটু সরে আয় না।

সরতে হবে কেন দেড়জনার জায়গা তো রয়েছে ওদিকটায়। না, না আমি বসব না !

আহা বসুনই না, অত লজ্জা কিসের আপনার ?

অমিয় অনিচ্ছায়ই বসে পড়ে। বৃদ্ধ নীচু গলায় ভর্ৎসনা করেন কন্যাকে।

বাবু টিকিট ?

আমিই দিচ্ছি। অমিয় একখানা নোট বার করে।

বৃদ্ধ আপত্তি তোলেন। তুমি দেবে কেন বাবা ?

তা হয়েছে কি, বললাম যে আমি ছেলের মত আপনার।

তবে দাও। তোমার সদিচ্ছার আমি আর বাধা দেব না। রেবতী কিছু বলে না। সে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। অমিয় বাসের ঝাঁকুনিতে সময় সময় টাল-মাটাল হয়ে পড়ে রেবতী মুখ মুচকে হাসে। বাস দ্রুত ও মন্থর গতিতে চলতে থাকে।

অনুচ্চ কণ্ঠে রেবতী বলে একটু সরে এসে ঠিক হয়ে বসুন না। ছোঁয়া লাগলে পোষাকটা আর ময়লা হবে না।

অমিয় সাহস সঞ্চয় করতে করতে শেয়ালদা এসে বাস ব্রেক করে। বৃদ্ধ চোখে কম দেখেন। তার হাত ধরে প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। রেবতীর হাতে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। সে মাঝে মাঝে

দল ছাড়া হয়ে পড়ছে। অমিয় একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। আপনার কাজ থাকলে আপনি এখন যেতে পারেন। বাবা ওঁর হাত ছেড়ে দাও।

এখন আমার কোনো কাজ নেই। চলুন প্লাটফর্ম পর্যন্ত।

এর জন্য কিন্তু কোনো কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করবেন না। কারণ আসছেন কিন্তু আপনি ইচ্ছে করে।

তুই চুপ কর তো মা। একি কথা!

বলতে দিন আমি তো কোনো আপত্তি তুলছি নে।

অর্ধপথে এসে অমিয়র নজর পড়ে রেবতীর ব্যাগটার দিকে। এই কুলী, কুলী।

লাগবে না এতক্ষণ কোন দিকে চেয়েছিলেন?

সে কথা অমিয় প্রকাশ করে বলতে পারে না, তাহলে আমার হাতে দিন। এই যে—

না—তারও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ঐ তো প্লাটফর্ম।

আপনারা কোথায় যাবেন?

ঘুঘু ডাঙা।

দাঁড়ান একটু এক্ষুণি আসছি।

মেয়ে ও বাপকে কোনো কথা বলার সময় না দিয়ে অমিয় চলে যায়, দু'খানা টিকিট কিনে ফেরে।

এক্ষুণি গাড়ী ছাড়বে আসুন, আসুন।

ট্রেনের কামরায় উঠতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। ডেলি প্যাসেঞ্জার যারা, তারা তো একেবারে নির্মম। রীতিমত একটা খণ্ড যুদ্ধ করে তুলে দিতে হয় বাপ মেয়েকে।

গাড়ী ছেড়ে দেয়।

অমিয় বলে নমস্কার।

রেবতী মুখ বার করে বাতায়ন পথে। অপূর্ব মুদ্রার ভঙ্গীতে হাত দু'খানি সংযুক্ত করে সেও বলে নমস্কার। আপনি মহাশয় ব্যক্তি। আমাদের জন্য অনেক করলেন—আর একটা অনুরোধ রাখবেন?

ট্রেনের সঙ্গে এগিয়ে আসতে আসতে অমিয় বলে তাড়াতাড়ি বলুন।

গোটাকুড়ি টাকা দেবেন?

অমিয় একটু থমকে যায়। কিন্তু দু'খানা নোট বার করে রেবতীর অঞ্জলি পুটে গুঁজে দেয় তখনি।

অমিয় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ট্রেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে।

তিন

প্লাটফর্ম ছেড়ে অমিয় ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। গাড়ীর শব্দ, মানুষের গম-গমানি কিছুই তার যেন কানে প্রবেশ করে না। কজন ট্যাক্সি ড্রাইভার হাত ইসারা করল, তাও সে দেখল না। তার মন জোড়া শুধু একটি মেয়ের চিত্র—ফ্রক পরা, বেণী দোলান। বেণী নয় খোঁপা করে এক রাশ চুল বাঁধা। সে ভালো করে ওসব লক্ষ্য করে নি। কিন্তু এতক্ষণ ধরে সঙ্গলাভ করেছে এক অদ্ভুত মেয়ের।

রূপ? ওর চাইতে অনেক রূপসীকে দেখেছে অমিয়। কিয়ার্স লেনের মিত্রাকেই ধরা যাক না। কেমন তার নাক, চোখ, মুখের ডৌলটি পর্যন্ত।

বুদ্ধি? ওদের এক অফিসের অমিতার কথাই চিন্তা করে দেখা যাক না। কি রকম ঘায়েল করে দিল সেবার পয়লা এপ্রিল। শুধু অমিয়কে নয়, ওর বন্ধু-বান্ধব সবাইকে। সাবাস মেয়ে একটি!

বিদ্যা? তার তো কোন পরিচয়ই দিতে পারে নি রেবতী। আর বোধ হয় তা নেইও ওর মধ্যে। যাদের পেটে একটু কিছু থাকে, তারা কি আজকাল ওসব না কপচে চুপ করে বসে থাকতে পারে? ট্রামে বাসে কলেজের মেয়েদের কি দেখে না অমিয়!

কিন্তু রেবতী—?

একটু গোলাপী লাঠি চুষল, গোটা কয়েক কথা বলল, কি অদ্ভুত দাগ কেটে গেল অমিয়র মনে।

কোন পরিচয় আদান-প্রদানের সময় হল না। ওদের সাংসারিক অবস্থাটা মোটামাট জেনে নেওয়া উচিত ছিল। কটি ভাই বোন? ওর চেয়ে বড় কেউ আছে কি না? কি ভাবে আয় ব্যয় সংকুলন হয়? সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতর ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করা তো কঠিন ছিল না।

অমিয় না হয় টিকিট-পত্র আনায় ব্যস্ত ছিল। কিন্তু মেয়েটি তো শেষ পর্যন্ত কিছু বলে যেতে পারত।

ওরা পরিচয় দেবে কেন? শুধু বলবে ঘুঘুডাঙা।

ওদের উদ্দেশ্য সহৃদয় মানুষের ট্যাঁক কাটা। কি যে অবস্থা হয়েছে দুনিয়ার!

নিজের বোকামির জন্ত আপশোষ হয় অমিয়র। দুটো একটা নয়, কুড়িটা টাকা—দুখানা কড়কড়ে নোট। যাক গে, ওতো হাতের ময়লা, মিনিটের রোজগার। পরিশ্রমের পয়সা নয় যে ও-নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে।

অমিয় রাস্তায় এসে বাসে ওঠে। বাইরে ঘোলাটে বায়ুমণ্ডলের মতই ওর মনটা হয়ে থাকে অস্বচ্ছ মলিন। এত যে মানুষজনের কলরব, ব্যবসা-বাণিজ্যের উজ্জ্বল বিজ্ঞাপন কিছুই তার ভাল লাগে না। পৃথিবীর এ হল কি? যেখানে যাবে, যে দিকে তাকাবে কেবলই ধোকাবাজী!

মুহূর্তের মুগ্ধতাই হয়েছে ওর মূঢ়তার কারণ। অমিয় অক্ষম আক্রোশে চলতে চলতে আবার এসে ধর্মতলায় নামে। ও মাথার মণি হারিয়ে এমনি দাগা যে কত খেয়েছে। হয়ত ভবিষ্যতেও খাবে। তবু সারা জীবন ঘুরে বেড়াতে হবে।

কতগুলো ক্যাটালগের ছবির দিকে নজর পড়ে। প্রায় সমস্তগুলিই সিনেমা-স্টারদের দেহ বিলাসের ভঙ্গি। কী বীভৎস রুচি।

আজ আর অমিয়র ভাল লাগে না বইর দোকান-গুলোর দিকে তাকাতে। যদিও এতদিন অমিয় সশ্রদ্ধভাবে ওগুলিকে এড়িয়ে চলেছে। তবু আজ মনে হয় ওর ভিতর শুধুই মামুলী উপদেশের মোরব্বা।

ভয় কিম্বা চিত্ত জয় করার মত কিছুই নেই। নইলে জগৎ ভেঙে-চুরে যাচ্ছে কি জন্যে?

অমিয় জীবনের উত্থান পতনের যে স্তরে এসে পৌছাক না কেন, রেবতীকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না। কোনদিন পারবেও না। গোলকের অন্ধকার দিকটাই তার বার বার নজরে আসছে।

সে অন্যমনস্ক চিত্তে ভিড় কাটিয়ে চলে। পেরিয়ে যায় মেট্রো। প্রায় উলঙ্গিনী নর্তকীর ছবি তাকে এখন আর উতলা করে না।

সহসা সে থামে। পুলিশ কিম্বা কোনও প্রহরী নয়। সেই মেয়ে তিনটি। একই ছন্দে মেট্রোর আলোর নীচে গিয়ে দাঁড়ায়।

অমিয় হতবাক হয়ে দেখে। প্রথমটির মেক-আপে বোঝা যায় না, তার বয়সের গাছ-পাথর আছে কিনা! দ্বিতীয়টি বিবাহিতা না অনূঢ়া সহজে স্থির করা কঠিন। একটা সমস্যার মত হয়ে রয়েছে কপালের সূক্ষ্ম রক্ত বিন্দুটি। [illegible] বহু দিনের বুভুক্ষিতা। ম্যালনিউট্রিশনের চিহ্ন তার চোখে মুখে, দেহে ও [illegible]লে।

সোজা হেঁটে গিয়ে অমিয় একটা বারে ঢোকে—হুইস্কি।

বড়া।

সৌখিন ট্রেতে সফেন মদ আসে। অমিয় এক চুমুকে সাবাড় করে একটা চেয়ারে বসে। সিগারেট ফুরিয়েছে। বয়কে ডেকে পয়সা দেয়। অল্প সময়ের মধ্যেই সিগারেট আসে।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়তে থাকে বেঁায়াটে রঙের রেশমের মত। ক্রমে ক্রমে তা বিলীন হয়ে যায় দেয়ালে ও ছাদে ঠেকে! বিষন্ন গম্ভীর ঘরখানা। তারই সঙ্গে অদ্ভুত সমন্বয় রয়েছে। আলো ও চারিদিকের রঙের।

সারা দিনের অফিসের খাটুনি, তারপর মনের উপর এই কশাঘাত— অমিয় বড় ক্লান্ত। এখন বেশ লাগছে এই নিস্তব্ধ পরিবেশ। আর দু একটি বন্ধু আছে একান্তই অপরিচিত। কিন্তু তারাও শান্ত ধীর। নীরবে নিজের করণীয়টুকু করে যাচ্ছে। কোনো হৈ চৈ বড় কথা নেই। প্রত্যহ অমিয় এখানে আসে না। আসে যখন আর দমে কুলায় না। সে সিগারেট টানে চোখ বুজে। ফুসফুসটা যেন এরই মধ্যে সঞ্চয় করেছে সজীবতা।

বাইরে মিটিং ফেরতা একটা জনতার হৈ চৈ শোনা যায়. যৌথ আওয়াজ। কলোনি আমরা—ছাড়ব না। ছাড়ব না···ইনকিলাব জিন্দাবাদ···

সমস্ত শ্লোগানগুলো অমিয় কান পেতে শোনে। একি জীবন প্রবাহ? খেতে পাচ্ছে না, তবু রুখে দাঁড়িয়েছে, কণ্ঠে আপসহীন ধ্বনি। ভাঙনের মুখে এক বলিষ্ঠ প্রতিশোধ?

ভাঙন—দুরন্ত দুর্নিবার ভাঙন বই কি। তার বুকটা হু হু করে ওঠে। স্মরণ হয় সমস্ত বিগত কথা। সত্যি সত্যি ভেঙে দিয়ে গেছে তার পাঁজরটা। অথচ কাঁদনেরই বা পরিচয়।

এবার একটু হাসি পায় মত্ত অমিয়র। ব্যঙ্গ বিষাক্ত হাসি। কোথায়ও এতটুকু আশা নেই, ভরসা নেই। শুধু বিবর্ণ বিশুষ্ক ধ্বংস। তার ভিতর প্রতিরোধ! যেন সমুদ্র কল্লোলে বালির বাঁধ। ও বাঁধ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে কতক্ষণ?

সিগারেটের স্তিমিত অগ্নি ক্রমে নিবে আসে। ছাইটুকু ঝাড়ার শক্তিও যেন অমিয় হারিয়ে ফেলেছে। হতাশার অন্ধকারে সে যেন তলিয়ে যেতে বসেছে। আর তার পাখা ঝাপটাতে ইচ্ছা করছে না। সে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কাছে দিয়েছে যেন আত্মসমর্পণ করে। সে কেমন যেন একটু সুখ পাচ্ছে তলিয়ে যেতে। ঠিক সুখও বলা চলে না—এক নিরুপায় ভীরু অসহায় অবস্থা।

ট্রাফিক আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না।

পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি হয়েছে বাইরে। লাল নীল হলদে জ্বলছে ঘন ঘন। খাঁকি, সাদা, নানা রঙের উর্দি। হুইসেল…ইসারা…

সঙ্গে সঙ্গে ইনকিলাব জিন্দাবাদ…

আশপাশের ইমারৎগুলো, ফুটপাথ ট্রাম বাস যেন প্রতিধ্বনি তোলে।

অমিয় ডানা ঝাপটায়। উর্দ্ধমুখী করতে চায় সে তার গতি। মৃত্যুর থাবা সে এড়িয়ে আসতে চেষ্টা করে।

আবার সিগারেটের আগুন ঘন ঘন জ্বলে ওঠে।

কিন্তু দুপায় ভর করে সে দাঁড়াতে পারে না। নেশায় তাকে টেনে ধরে সজোরে। প্রিয়া নয় যেন প্রেতিনী।

আবার সে তলিয়ে চলে ভারী সীসার মত। গভীরে, আরো গভীরে— অবশেষে বুঝি বা অতলে।

অন্ধকারে জ্বলে শুধু একটি নারীর মুখ। দীপ্ত যৌবনা, উদগ্র প্রেমে কামনায় ভরপুর।

সে কিন্তু রেবতী নয়। লক্ষ রেবতীর অংশে তিলোত্তমা বর্ষীয়সী এক তন্বী।

অমিয় ভাল করে চোখ মেলতে চেষ্টা করে। কিন্তু চোখ তো খোলা যায় না। চোখের পাতায়ও কি পাথর ঝুলান?

সে অসহ্য আগ্রহ ও যাতনায় অভিভূত হয়ে পড়ে। কিছুতেই সে চোখ মেলতে পারে না। তখন সে বাতায়ন উন্মুক্ত করে দেয় মর্মের। সে বাতায়ন পথে দুটি বিস্ময় বিমুগ্ধ আঁখি পাতা।

অমিয়রই চোখ দেখছে সেই তিলোত্তমা তন্বীকে।

পলাতকা তবু যেন সমূখে এসেছে।

অদ্ভুত! অদ্ভুত!

কত রূপ নারী দেহে! কত লাবণ্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঢেউ কপালে ও গণ্ডে। ভ্রূ-তেও কি কামনা! মুখে ওকি হাসি!

তারপর শুধু রহস্য—রহস্যের উদ্বেল সমুদ্র; কিন্তু হারিয়ে গেছে সে এ পৃথিবীর জল তরঙ্গে।

আবার কিছু সময় কেটে যায়। অমিয় ধীরে ধীরে উঠতে চেষ্টা করে এবং এক সময় বার থেকে বেরিয়ে পড়ে বড় রাস্তায়।

সে নিজেকে একটু স্থির করে নিয়ে ওপারে চলে আসে। সে কোলাহল বর্জন করতে চায়।

গড়ের মাঠের পাশের গাছপালা। বহু পরিচিত, কিন্তু ওর ভিতর এক নৈশ

আলোছায়া অমিয়র বড় ভাল লাগে। ওপারে সহস্র স্বার্থের হানাহানি, লাভালাভের গুঞ্জন, এপারে কেমন নিঃসঙ্গ নীরবতা। এই ভাল। এই পথেই ওর আজ যাত্রা শুরু হোক, ও বড় ঠকেছে।

আজ নয় বহু দিন ধরেই অমিয় একা চলেছে। ভিড়ে ও কোনো দিনই মিশতে পারে নি, যখনি মিশেছে কেবলই ধাক্কা খেয়েছে।

ওর অপরাধ, ও চায় একটি রমণীর সন্ধান। যে অভিমানে অসম্মানে আত্মগোপন করেছে। যার জন্য সে ছুটে বেড়িয়েছে কাশ্মীর থেকে বিন্ধ্যাচল। দক্ষিণ ভারতের সমস্ত উপকূল থেকে মাড়োয়ারের মরুভূমি পর্যন্ত। যৌবনের উগ্র মধ্যাহ্ন এখন—তবু সে খুঁজে পেল না তাকে।

তার তৃষ্ণার্ত জীবন যত হাত বাড়ায়, যত ছুটে মরে, মৃগ তৃষ্ণিকা ততদূর সরে যায় যেন ক্ষিপ্র চঞ্চল পদে।

এরপর অপরাহ্ন। উঃ সে কথা ভাবা যায় না! তারপর পলিত কেশ, গলিত নখদন্ত। সহসা নেশা ছুটে যায় অমিয়র। সে পূর্ণ বাস্তবে ফিরে আসে।

ভিড়ের দিকে, কোলাহলের দিকে সে দ্রুত পায় এগিয়ে চলে। ট্যাক্সি, ট্যাক্সি।

অমিয়র পাশ কাটিয়ে দুটি পথিক চলেছে। হল এ্যাণ্ডারসনের বিপরীত ফুট ধরে। নীরবেই যাচ্ছিল, বিরক্ত হয় অমিয়র চীৎকারে। মাতাল নাকি?

এখানে ট্যাক্সি কোথায়?

অমিয় মন্তব্যটা শোনে। সে নিজেকে আর একটু ধীর স্থির করে নিয়ে, ঠিকঠাক পা বাড়ায়। যতটা এগিয়ে গিয়ে ট্যাক্সি ডাকা উচিৎ তাই ডাকবে ভাবে।

চার

কিছুদূর এগিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাবেন?

তাইত নামটাই যে ভুলে গেছে কলোনীর। ঠিকানা, প্লট নম্বর, কিছুই অমিয়র মনে নেই। নিখিল কতবার বলেছে, কিন্তু ও বারবার ভুলেছে। কোন গুরুত্বই দেয়নি। আজ অথচ সেই ঠিকানার একান্ত প্রয়োজন। নিজেকে বাঁচাতে হলে, সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যে এতটুকু সান্ত্বনার আলোক নিশানা দেখতে হলে নিখিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই হবে। জগৎ ওকে অপমানে জর্জরিত

করেছে। ও করেছে নিখিলকে অসম্মান। ওর অনুশোচনা হচ্ছে। এমন ধারা নিতান্তই অচল। ও ধুয়ে মুছে দিতে চায় নিখিলের গ্লানি। আর হানা-হানি নয় মানুষে-মানুষে মৈত্রী।

ড্রাইভার বিরক্ত হয়। আপনি কি মিছামিছি দাঁড় করিয়ে রাখবেন আমাকে।

না, না।

তবে উঠুন - কোথা যাবেন ?

নেতাজী কলোনী।

ঠিকত না ঘুরতে হবে ? ওদিকের রাস্তাঘাটগুলো তেমন ভাল না দেখুন, চিন্তা করে বলুন।

চিন্তা করার কি আছে ? গেলেই অনায়াসে খুঁজে নেওয়া যাবে।

কি বলেন—অনায়াসে ?

না হয় একটু আয়াস করলে, পুরোপুরি বকসিশ পাবে।

ড্রাইভারের যেন দম বাড়ে। সে মিলিটারী কায়দায় স্টার্ট দেয়। মোটর উড়ে চলে।

আলোছায়ার সতরঞ্চ। তার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ী নিজের না হলেও আপাতত নিজস্ব। মন্দ লাগে না। কিন্তু অমিয়র মনে দ্বন্দ্ব রয়েছে গন্তব্যের। একটা নয় অজস্র কলোনী সহস্র সহস্র পথ। এর ভিতর থেকে খুঁজে বার করতে হবে নিখিলকে। ওর মাসকাবার হয়ত রেশন আনা হয়নি হয়ত ওষুধ বাদ গেছে রুগ্ন ভাইয়ের। অমিয়কে এখন সে দণ্ড দিতে হবে। ওর আছে। নিখিলের নেই। থাকতে না দিয়ে ঠকান চলবে না। ও মাতাল হতে পারে, তা বলে নির্লজ্জ মেয়েঠগী নয়।

রেবতীরও ত অভাব হতে পারে ? থাকতে পারে ওদের সংসারে দৈনন্দিন নিষ্ঠুর প্রশ্ন। অভাবটাকে ও স্বভাব বলে কেন ব্যাখ্যা করছে ? রাত্রির গর্ভ-কোষেই তো থাকে আগামী দিনের বর্ণাঢ্য ভ্রূণ।

অমিয় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে এক ঠগী অপাংক্তেয় মেয়েকে উঁচু আসনে বসিয়েছে। তার ভিতরে জেগে উঠেছে অপূর্ব এক অভিনব বিশ্লেষণ।

ছন্দে ছন্দে গাড়ী ছুটে চলে।

জোরসে চালাও।

ড্রাইভার ভাবে, কি বলেরে ? নেশায় চুর বুঝি ? এমন খদ্দেরও তার ভাগ্যে জুটেছে। বলিহারী তার আজকার বরাতটা।

স্পীড বাড়িয়ে দাও—রাত হচ্ছে।

হাজরা মোড়, যদি চাপা পড়ে ?

ও! তা' বুঝে সুজে চালাও, একটু দেরিতে আর কি হবে ?

নিখিলের কাছে বেশ রসাল করে বলতে হবে রেবতীর কাহিনী। নিছক সত্য কথাই বলবে। তবে রস দেবে কি করে ? রস দিলেই তো সতীত্ব রইবে না। না থাক—স্রেফ কাঁচা ছানায় কি আর রসগোল্লার স্বাদ পাওয়া যায় না।

কি রস দেবে ? তিক্ত মধুর না কষায় ?

বলতে বলতে যা এসে যায় তাই ভাল।

একটা মোড়ে এতক্ষণ ? একটু পাশ কাটিয়ে আগ বাড়িয়ে গেলেই হতো। ড্রাইভারটার কেবল ভাড়া বাড়াবার বজ্জাতি। ঐ তো ওপাশ দিয়ে কেমন প্রাইভেট খানা চলে গেল।

এবার ড্রাইভারটা মিছামিছি ব্রেক কষল। মানুষ নয়, একটা কুকুর। সাপ নয় রজ্জু ? এই ভারতই না এককালে দেখিয়েছে সর্ব জীবে প্রীতির আদর্শ। এখনও ত মরা নদীর মত বেঁচে আছে নানা স্থানে—নইলে খাটিয়ায় মানুষ বেঁধে রক্ত খাওয়াবে কেন ছারপোকা দিয়ে ? ইদানীং ইউরোপীয় অথবা ঐ জাতীয় শিক্ষিতরা আরো উচ্চগ্রামে চলে গেছেন। সে প্রেমে আরো রোম্যান্টিক এবং অবশ্য অনুকরণীয়। তাইত অমিয় একটা কুকুর পুষেছে। এবং বেশ প্রীতির চোখেই দেখছে। ওদের সঙ্গেই তো ড্রাইভারটা হামেশা চলা ফেরা করে। তার অবচেতন মনে থাকবে না কেন এ প্রীতির আদর্শ ?

দুর, দুর···একেই বলে মাতাল, নইলে এমন আবোল তাবোল কেউ কি ভাবে ?

একটু জোরে চালাও—সেখানে গিয়ে তা আবার খোঁজাখুঁজি করতে হবে। হক না সারা রাত ভাড়া খাটলেও আমার আপত্তি নেই।

হুঁ তা বুঝেছি রাতটা সারা করবে। যাক যা ইচ্ছা হয় কর। এখনত আর নাবতে পারব না। ভাড়ার টাকা কিন্তু আমি সেখানে না গিয়ে দিতে পারব না।

গাড়ীর গতি একটু মন্দীভূত হয়ে আসে। কি বললেন ?

আর বলার দরকার হবে না। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। এই যে দেখছি গাড়ীর স্পীড বেড়েছে।

কোন জবাব না দিয়ে ড্রাইভার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে চলে। আবার তার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। কে জানে উত্তর দিতে গেলে কিসে কি জবাব দিয়ে বসবে ? বাইরের হাওয়া হঠাৎ শীতল হয়ে গাড়ীর ভিতর ঢোকে। অমিয় নিজেকে অত্যন্ত প্রফুল্লবোধ করে। বেশ আরামপ্রদ এই সময়টা।

লেক ছাড়িয়ে গাড়ি টালিগঞ্জের সীমানায় ঢুকেছে। আরো খানিকটা এগিয়ে রেস কোর্সের পাশ দিয়ে চলেছে। শুকনো দেবদারু পাতা স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে পথের দক্ষিণে। উগ্র হেড লাইটের আলোতে সেগুলো ঝলকে ঝলকে উঠছে।

একটা ভয়ার্ত কলবর শোনা যায় কয়েকটি মেয়ের।

ওদের মধ্যে ফ্রক পরা একটি সপ্তদশী। রেবতী নাকি? না, না, তা হয় কি করে? আরো আছে ক'জন। সুশ্রী, সুবেশা। কিছু বয়েস হয়েছে দু'টির। যৌবন যেন সীমানা অতিক্রম করে ভেঙে পড়তে চাইছে। পড়লেই হত, অমিয় কুড়িয়ে নিত গাড়ী থামিয়ে। এদের দু'জনের তুলনায় রেবতী স্নেহের যোগ্যা। এতক্ষণ নির্বোধ অমিয় শুধু ভুলেরই ফসল বুনেছে। স্নেহের পাত্রী যদি নিয়ে থাকে কটা টাকা চেয়ে, নিক না। অমিয় একটা মহৎ কাজ করেছে। সে আজ ধন্য হয়েছে। আত্মীয় বান্ধব হীনের আজ একটা ভগ্নী জুটেছে ঈশ্বরের কৃপায়। চলন্ত মোটরে, গলন্ত স্নেহে অমিয়র বুকের ভিতরটা যেন ভিজে উঠতে থাকে।

এবার একটু জোরসে হাঁকাও।

উপায় নেই। কলোনীর রাস্তা। একে সন্ধ্যাবেলা, তাতে মিটিং ফেরতা একটা বাস। ধীরে ধীরে যেতে হবে?

আমাকে নামিয়ে দাও রিক্সা করে যাব।

ইচ্ছা হলে যেতে পারেন, তবে জানবেন রিক্সার কিন্তু ডানা নেই।

অগত্যা অমিয় চুপ করে থাকে।

এই কয়েকটা বছর আগে এদিকটা বলতে গেলে ছিল নির্জন। দু'চার জন সাহেব-সুবো কিম্বা বড়লোকের মাত্র ছিল বাস। এ সময়ত মানুষ জনই দেখা যেত না। রাস্তাটা একেবারে মসৃণ ফাঁকা। শুধু মাঝে মাঝে হুস করে বেরিয়ে যেত দু'একটা দামী মোটর—হয়ত এক আধখানা ট্যাক্সী। সন্ধ্যার পর থেকে থম থম করে চতুর্দিক। সময়েতে উচ্ছৃঙ্খল মিলিটারীরা নিয়ে আসত ভাড়াটে মেম সাহেব। দু'একটা খুন জখমও যে না হত তা নয়। গৃহস্থের বৌঝিরা তো সহজে এ পথ মাড়াত না। যুদ্ধের সময় ত মহা দুঃসাহসীও এ পথ চলত এড়িয়ে।

কিন্তু আজ চলছে পিঁপড়ের মত মানুষ। তরুণ ও তরুণী, বৃদ্ধ বালক মায় দুগ্ধপোষ্য শিশু পর্যন্ত। সাইকেল রিক্সা মোটর বাস কিছুর কি অভাব আছে।

এত উদ্বাস্তুর ভিতরে নিখিলের সন্ধান করতে যাওয়া বাতুলতা। তবু যেতে হবে। হৃদয়ের তাগিদ বড়। অমিয় তা' হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

কিছু সময় পরে ট্যাক্সি এসে নেতাজী কলোনীর সম্মুখে থামে। অমিয় নেমে এসে দেখে, সমুদ্রের মত কলোনী। তার ভেতর অসংখ্য ঢেউয়ের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ। এই ঘন বসতির মধ্যে কোথায় নিখিল ?

পাঁচ

একটা সিগারেট ধরায় অমিয়। বাঁকা চোখে দেখে মিটারের দিকে। গাড়ী থেমেছে, কিন্তু ওটা থামেনি। নিজের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই, তাই সাহস হচ্ছে না ট্যাক্সিটা বিদায় দিতে। কতদূর ঘুরতে হয় কে জানে!

একখানা চায়ের দোকান, তার পাশেই মুদীখানা। ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে হয় না ? কোটের কলারটা একটু ঠিক করে অমিয় এগিয়ে যায়। কিন্তু সংকোচে সে আবার পিছিয়ে আসে। একে ওর অস্বাভাবিক অবস্থা তাতে এ হেন অস্বাভাবিক প্রশ্ন। অমিয় যতটা মাতাল হক না হক—মুখ খোলামাত্র সাব্যস্ত হবে তার চেয়েও বেশী। হয়ত সংগতি থাকবে না কথার। সে নিরুপায় হয়ে পায়চারী করে। রিস্টওয়াচটার দিকে একবার চেয়ে দেখে না, খুব বেশী রাত হয়নি মাত্র আটটা। এটুকু রাততো হবেই।

মিনিট তিনেক কেটে যায়।

ড্রাইভারটা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এমনি কি দাঁড়িয়ে থাকবেন ?

যদি ঘুমিয়ে থাকি তোমার কি ? আমি ভাড়া দিলেইতো হল ?

তা বটে। আপনার যা খুশি তা করুন। কিন্তু এভাবে বাবুর খোঁজ পাওয়া যাবে না।

না পেলে কি করব ? তোমারও তো বকশিস নেওয়ার কোনো আগ্রহ দেখছিনে। জিজ্ঞাসা করতে করতে বিলেতও যাওয়া যায় ?

তবে আমি জিজ্ঞাসা করি, বাবুর নাম ?

নিখিল সেন!

কেমন দেখতে ?

মানুষ যেমন দেখতে হয়।

তা নয় বাবু, তা নয়—এই নাক মুখ চোখ। রংটা—

সম্বন্ধের কথাত আমরা তুলব না—তবে, অত detail-এর প্রয়োজন কি ?

ঠিকানা সঠিক না জানায় প্রায় সম্বন্ধের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আপনি সঙ্গে চলুন।

ওরা এগিয়ে যাওয়ার পূর্বেই কয়েকটি উৎসাহী তরুণ এগিয়ে আসে।

ক্ষমা করবেন—আপনিই কি শ্রীযুক্ত অমিয় রায়—নিখিল সেনের বন্ধু ?

অমিয় অবাক হয়ে বলে, হ্যাঁ।···কোন্ নিখিল সেন, যে এই এ-তে কাজ করে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ তিনিই। নিখিলদা আপনার একখানা ফটো আমাদের উপহার দিয়েছে। আমরা সযত্নে এন্‌লার্জ করে ক্লাবে টাঙিয়ে রেখেছি।

অর্থাৎ আমার ফটো ? কেন ? আমি কি একটা ব্যক্তি কিছুই তো বুঝতে পারছিনে ?

একটু পরেই জানতে পারবেন সব। কিন্তু নিখিলদা আপনার সঙ্গে এলেন না কেন ? সে আপনাকেই নিয়ে আসতে গেছে।

বুঝতে পারছিনে। বিষয়টা একটু খুলে বলো। আমিত এখনও মরিনি।

একটি ছেলে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর ক'জনে চোখে ঠার দেয়। একজনে তো একটা চিমটিই কেটে বসে বেশ জোরসে। চুপ কর গবেট গোবিন্দ।

গোবিন্দ ভদ্রতার খাতিরেই কেবল মুখ বুজে সহ্য করে চিমটিটা নইলে সে জবাব দিত বিষম। সে-ও চ্যাঙড়ামিতে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট।

সকলে মিলে ড্রাইভারকে বলে, কলোনীর ভিতর নিয়ে চল গাড়ী। অমিয়কে অনুরোধ করে ভিতরে ঢুকে বসতে। ওরা চারিদিকে ঝুলতে থাকে বাঁদরের মত। সে কি অত্যুৎসাহের কিচির মিচির।

অমিয় ভাবে, সে যেন এক প্রাগৈতিহাসিক জীব। ধরা পড়ে চলেছে চিড়িয়াখানায়। সে অস্বস্তি অনুভব করে, কিন্তু উপায় নেই।

সে খানিক নীরব থেকে বলে, তোমরা ভুল করছ না ত ? আমি, আমাকে কেনই বা খোঁজ করতে যাবে নিখিল ? সারাদিন এক সঙ্গে ত' ছিলাম। কিছু তো বলল না।

তিনি কাল পরশু নাগাদই বলতেন, কিন্তু সময় দিলেন না সভাপতি। আমরাও তেমন প্রস্তুত হতে পারলাম না।

কিসের প্রস্তুতি ?

পরে শুনবেন। নিখিলদা নিজের মুখেই বলবে। অনুগ্রহ করে আমাদের ত্রুটি নেবেন না।

শুরকির সড়ক দিয়ে মোটর গড়িয়ে চলে ধীরে ধীরে। আকস্মিক পরিচিতা রেবতী এক রহস্য। বহুদিনের পরিচিত নিখিলও হল তাই। জগৎটাই কি শুধু রহস্যময় ? এর শেষ কোথায় ? নিখিল হাঁপিয়ে ওঠে খেই না পেয়ে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার ভাল লাগে। ধাওয়া করে চলো কিম্বা বুঁদ হয়ে

থাকো। সুখ পাবে নিবিড় অনুভবে। স্পর্শে, গন্ধে, সান্নিধ্যে যদিও না পাও, তোমার ঐশ্বর্য বাড়াবে দেহাতীত বৈভবে।

রেবতী ও নিখিল—অমিয়র আজ যেন কি গৌরব, কি ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে—ও কতক বুঝে কতক না বুঝে তন্দ্রাতুর হয়ে থাকে।

কলোনির ছোট ছোট বাড়ীগুলো পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকে যেন স্নান করে এখনও শাড়ি বদলাতে পারেনি। আলো নেই তবু চাঁদের আলোতে যেন সলজ্জ কোন সৌখিন গৃহস্থের দুয়ারে হয় ত ডালিয়া ফুটেছে অপর্যাপ্ত। অর্থাভাবে হয়ত ঘর-দুয়ার এখনও সম্পূর্ণ করতে পারেনি, কিন্তু মনের পিপাসা সে কায়িক পরিশ্রমে ঠিকই মিটিয়েছে।

একজন লাউমাচায় ঠেকা দিচ্ছে। একটি কিশোরী তাকে করছে সাহায্য। এতবড় লকলকে লাউগাছ প্রায় বাড়ীটা জুড়ে। এ যে প্রদর্শনীতে পাঠাবার যোগ্য। ইচ্ছা করে অমিয়র হাত দিয়ে স্পর্শ করতে! বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরতে।

ওকি ঐ যে? পাটি বুনছে একজন মহিলা। কোথায় পেল পূর্ব বাঙলার নরম বেতি?

এদের মন থেকে তবে এখনও স্মৃতি যায়নি মাটির। অনেক ভাঙন ভেঙেছে, অনেক কান্না কেঁদেছে, তবু মায়া যায়নি দেশের।

ঐ কে যেন একটুখানি ঘোমটা টেনে লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ে।

ঐ কে যেন শাঁখ বাজায়।

ঐ কারা যেন উলু দেয়।

অমিয় অধীরতা অনুভব করে। তার চিত্ত উদ্বেল হয়ে ওঠে। মোটর থামে। অমিয় নেমে পড়ে। তার কণ্ঠে একটি মেয়ে মালা দেয়। আবার শাঁখ বাজে।

এ তবে ঠিক গৃহস্থ বধূর শঙ্খধ্বনি নয়।

অমিয়র হাত ধরে কচি দুটি শিশু স্বাগতম জানায়। কিছু বলতে পারে না অমিয়। তার যেন একটু পূর্বেই বাক্‌রোধ হয়েছে।

একটি বিবাহিতা মহিলা এগিয়ে এসে অমিয়র কপালে চন্দনের ফোঁটা দেয়। ওরে তোরা শাঁখ বাজা আবার, থামলি কেন? নমস্কার অমিয় বাবু, আমি আপনার বন্ধুস্ত্রী। আজ আপনার বিয়ে।

অমিয় বিস্মিত না হয়ে পারে না। এতটা প্রগলভতা অর্জন করল কি করে এই মহিলা? অমিয়র সঙ্গে আলাপ থাকা দূরের কথা, ওকে যে কখনও দেখছে তা-ও তো মনে পড়ে না।

চোখ তুলে অমিয় গোলগাল মুখখানা একবার দেখে নেয়। বেশীক্ষণ চাইতে পারে না দীপ্তিতে। তৃপ্তির রক্তাভা ঠিকরে বার হচ্ছে ত্বকের সুকোমল আবরণ ভেদ করে। পুরুষ যা দেয়, নারী যা চায়—তার পূর্ণযৌগিক মহিমা ঐ মুখে। এ ঐশ্বর্যের যে অধিকারিণী সে কেন হবে না একটু প্রগলভা? তার ভিতরের উচ্ছলতা কি করে রুখবে? পাহাড়ী উপলে তো রুদ্ধ থাকে না ঝরণার সুমঙ্গলধারা। কারা প্রাচীর ভেঙে সে ললিত নৃত্যে নামে।

সত্যি একটা কিস্তি মাৎ করেছে মুখচোরা নিখিলটা। কেমন যেন একটু টাটিয়ে ওঠে অমিয়র হৃদয়। এ আর যাই হোক সিকনি পোঁছা বৌ নয়।

দেরি হয়ে গেছে বলে একটু অপ্রতিভ হয়ে অমিয় বলে নমস্কার। ওর দরকার নেই, আপনি এই ঘরে উঠে বসুন। আপনাকে একদিন বাসে বসে দূর থেকে উনি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়িতে নিত্য হয় আপনার কথা অফিস থেকে ফিরে তো ঘণ্টা খানেক এই নিয়েই কাটে।

সংকোচে এবং লজ্জায় অমিয় এতটুকু হয়ে যায়। নিখিল কি আর কিছু বাদ দেয় স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

ওকি আপনি অমন করছেন কেন—ভিতরে চলুন। পুরুষ মানুষের কি এত লজ্জা সাজে? আপনি না চাইলেও আমরা জোর করেই আপনাকে বিয়ে দেব। মুখে কাপড় চেপে ললিতা হেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ লুকিয়ে হাসে অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েরা।

একখানা দো-চালা টালির ঘর। লম্বা একটি বেঞ্চ; ছোট একটি টেবিল। আলমারী একটি মাঝারি গোছের। এক পাশে তক তকে ঝক ঝকে নতুন বই। অন্য পাশে পুরান 'বসুমতী সংস্করণ'। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মুলি বাঁশের বেড়ায় দুখানা পাশাপাশি ফটো। একখানা অমিয়র, অপরখানা কার তা অমিয় তা বলতে পারে না। পূর্ণ কুম্ভ ও ফুল লতা-পাতা দিয়ে তোরণ সাজান হয়েছে বাইরে। তবে সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়নি। ছেলেরা হাতে হাতে কাজ করছে।

এমন সময় নিখিল এসে পড়ে।

আশ্চর্য! তোকে খুঁজে এলাম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আর তুই কিনা এখানে! কি করে ঠিকানা পেলি, হঠাৎ কেন মনে পড়ল এই আজে বাজে ঠিকানাটা?

তুই যত ভাবিস আমার স্মরণ শক্তি অত ভোঁতা নয়।

যাক ওসব কথা পরে হবে, এখন আসল কথাটা শোন। এটা আমাদের কলোনীর লাইব্রেরী। নাম দিয়েছি জীবন বান্ধব পাঠাগার। তুই এখানকার সভাপতি। যিনি সভাপতি তিনি হঠাৎ আজ কাশীবাসী হচ্ছেন। একটা

দানপত্র রেজেস্টি করে দিয়েছেন এই জমি পাঁচ কাঠার। একটা জবর দলিল সম্পত্তি নয়। সে দলিল কে হাতে করে নেবে? তাই তোকে প্রয়োজন। একটা বিশেষ অনুষ্ঠান করে দুদিন বাদে নেব ভেবেছিলাম, কিন্তু ভদ্রলোক তর সইলেন না। বুড়ো মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখন কাশী পর্যন্ত পৌছতে পারলে হয়।

অমিয় চাপা গলায় বলে মেট্রো পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলি?

হাঁ্যা—এই দেখ টিকিট। ভিতরে লোক পাঠিয়ে একেবারে গো খোঁজা খুঁজেছি। ট্যাক্সি ভাড়া গেছে পাঁচ টাকা।

ললিতা এগিয়ে এসে বলে, টাকার হিসাব দিচ্ছ যে? তোমার ট্যাক্সি ভাড়া কি উনি দেবেন নাকি? জমি আদায়ের চোটে সভাপতি যাচ্ছেন কাশী। ট্যাক্সি ভাড়া দাবী করলে সহ-সভাপতি কোথায় যাবেন জান-ব্যাসকাশী। তখন আমাদের লাইব্রেরীর উপায় হবে কি? ললিতা হেসে ওঠে।

অমিয়র সমস্ত শরীরে যেন ঐ হাসির ঝঙ্কার বাজে। সে ললিতার মুখখানার দিকে আবার তাকায়। আবার ভাবে, এতো যখন তখন কাঁদার মত বৌ নয়! এর শাড়ি ব্লাউজ তেমন ধোপ দোরস্ত না থাকলেও মনটা আছে আশ্চর্য সতেজ। ঐ কলকে লাউডগাগুলোর মত সর্বাঙ্গ যেন প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর।

মুখ ফিরিয়ে অমিয় নিখিলের দিকে চেয়ে দেখে। কদমফুলি মুখেও একটা গৌরবের প্রীতির স্মিতাভা।

ফিটফাট স্মার্ট অমিয় নিজেকে মুহূর্তের জন্য বড় দীন মনে করে। অনেক থাকতেও কি যেন নেই। অনেক পেয়েও কি যেন পায়নি। তার চিত্ত সমুদ্র হাহাকার করে আছড়ে পড়ে তটপ্রান্তে।

হঠাৎ অমিয়র গলার মালাটা ছিঁড়ে পড়ে।

ললিতা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলে। ছিঃ ছিঃ কেমন করে গেঁথেছিস আরতি! শীগগির একটু সুঁই সুতো নিয়ে আয়।

একটি আঠার উনিশ বছরের মেয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে ছুটে যায়। দ্রুত ফিরে আসে। মালায় নতুন করে গ্রন্থি দেয় ললিতা।

অমিয় বলে, ও গৌরব আমার জন্য নয়, আমি উপযুক্ত নই—আর থাক বৌদি। অমিয়র মানসিক ক্লান্তির রেশটা কান্নার মতই নিজের কানে ঠেকে। কিন্তু অন্য কেউ তা বুঝতে পারে না।

সেকি! তা হয় না। দে দে আরতি পরিয়ে দে তো।

কেন তুমি দাও না বৌদি?

আমি অমন খিঙি মানুষের গলা নাগালে পাব না। তুই দে ভাই—উনি যে আজ আমাদের বরণীয় অতিথি। মুখে যা কেন বলিনা, ব্যবহারে ত ত্রুটি রাখা উচিত নয়। আর তুই হচ্ছিস মহিলা সম্পাদিকা, উনি সহ সভাপতি।

আরতি এগিয়ে যায়।

অমিয় একটু ঘাড় নুইয়ে দাঁড়ায়।

ললিতা চাপা গলায় মন্তব্য করে, এই হয়ে গেল কিন্তু।

আরতি ছুটে না পালিয়ে কৃত্রিম ক্রোধ চেপে শুধু বলে সব সময় ঠাট্টা ফাজলামি ভাল নয় বৌদি।

বিধাতাও বোধ হয় তখন গুরুতর একটা কিছু লিখন লিখছিলেন বর্তমানকাল ও মুহূর্তের সমাজ দর্শন সম্বন্ধে। তাই মালাটা আবার ছিঁড়ে যায়। টাটকা গোলাপ ও ডালিয়া গড়িয়ে পড়ে ঘরের প্রাঙ্গণে।

সকলেরই মুখ শুকিয়ে যায় ক্ষণেকের জন্য।

অমিয়র মনে পড়ে অনেক বিগত কথা। আজকার যা অভিনয় একদিন তা প্রায় সত্য হতে চলেছিল। সেখানেও যেন মালা বদলের ছন্দ এমনি হঠাৎ কেটে গেল। আজ তা আর যেন ভাবা যায় না! চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে যেন বিয়ের রাত্রের রোশনাই মিলিয়ে গেল।

ছয়

অনুষ্ঠান কিছুই নয়! কেবল একখানা দানপত্র পাঠাগারের তরফ থেকে গ্রহণ করল অমিয় এবং ধন্যবাদ জানাল কাশীগামী বৃদ্ধ সহৃদয় ব্যক্তিকে। তিনি হয়ত আর ফিরে আসবেন না কিন্তু সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপিয়ে গেলেন অমিয়র স্কন্ধে।

তোমার কথা অনেক শুনেছি নিখিলের মুখে; এখন দেখলাম যে তুমি সত্যই একজন উপযুক্ত লোক। এ পাঠাগারের ভবিষ্যত তোমার ওপর ন্যস্ত করে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত মনেই কাশী চললাম। বাবা বিশ্বনাথ তোমাদের মঙ্গল করুন।

অমিয় বলে, আমাকে ভুল বুঝেছেন, নিখিল অন্তত তাই আপনাদের বুঝিয়েছে—আমি নিতান্ত অনুপযুক্ত এ বিষয়ে।

না বাবা। তোমার বেশ-বাসে অন্তত তা মনে হচ্ছে না। যদি তোমার দায়িত্ববোধ না থাকবে, তুমি কি দিতে পার তিনশ টাকা এককালীন চাঁদা?

আমি দিয়েছি—আমি!

গোপনে সৎকাজ করেছ, বলতে চাচ্ছ না—আমি ত জেনেশুনে স্বীকার না করে পারছিনে। দরিদ্রকে দান করার মত অনেক মহাশয় ব্যক্তি আছেন, কিন্তু কৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিকে বাঁচাবার মত কজন বন্ধু পাওয়া যায় বাঙালীর ভিতর? আমি পূর্ববাঙলার বাসিন্দা নই, ভাঙনের কোনো বাতাসই আমার গায় লাগেনি, শ্রেফ তোমার উদারতায় আমি এগিয়ে এসেছি। সেজন্য আমিও তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে বিদায় নিতে পারছিনে।

সভা সমাপ্ত হয়। অমিয় একটা চেয়ারে বসে পড়ে। একে একে ঘর খালি হয়ে যায়; সে ওঠার নাম করে না। নিখিলের এসব কারসাজির সে কোনো সূত্রই খুঁজে পায় না। যে বই দেখলে দূর থেকে প্রণাম করে, সে কিনা একটা উদার মহাশয় ব্যক্তি। কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বাহক। এই শীতের আবহাওয়ায়ও সে ঘেমে উঠতে চায়, সে আর মুখ তুলে তাকাতে পারে না। নিখিলকে যে কিছু জিজ্ঞাসা করবে কি ভর্ৎসনা করবে সে শক্তিও তার যেন নষ্ট হয়েছে।

সে একটু জিরিয়ে নেয়।

কিন্তু একি! তলতল ছলছল করছে কেন তার হৃদয়ের অতলে। মিথ্যা গৌরব মিথ্যা খাতিরও মাদকতা কম নয়। সে কি অমনি উপযুক্ততা অর্জন করতে পারে না? পারে না সব কিছু বিলিয়ে দিতে পরহিতার্থে? দাতাকর্ণের উপাখ্যান কি সে পড়েনি?

কোথায় আজ সে যুগ? অমিয় সামান্য একটি কেরানী—টেম্পুরারী যার সার্ভিস—যার একটা মাত্র নোটিশের অপেক্ষা! সংসারই যার আজ পর্যন্ত হল না—কোথায়ই বা তার সন্ধান নিয়ে মহাকাব্য রচনার স্বপ্ন সাধ ও প্রেরণা! অমিয়র মাতাল হওয়া সম্ভব, দাতাকর্ণ তার কাছে নিছক জলো কল্পনাবিলাস। তার হাসতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বড়ই আনন্দে কাটল সময়টা।

অমিয় ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখে। আটটা পঁচিশ।

ড্রাইভার সুমুখে এসে দাঁড়ায়। সে মুখ ফুটে কিছু বলে না। বাবুর যে লঙ্কাপোড়া কথা।

সভাপতিকে বিদায় করে দিয়ে নিখিল, ললিতা এবং ছেলেমেয়েরা ফিরে এসেছে। ললিতা বলে চলুন গরীবের বাড়িটা দেখে যাবেন।

না, না আমার সময় হবে না।

কেন বলুন তো, বউ কাঁদবে নাকি?

অমিয় নিখিলের দিকে কটমট করে তাকায়। মনে মনে বলে, রাসকেল!

মুখে জিজ্ঞাসা করে, কবে আমি চাঁদা দিলাম রে ?

নিখিল চুপ করে থাকে। অমিয়র ক্রোধের মুখে সে ঠিক জবাবটা দিতে সাহস পাচ্ছে না।

স্বামীর অবস্থা বুঝে ললিতা এগিয়ে আসে। একখানি শান্ত স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়। বলে, চলুন—যেতে যেতে আমিই বলছি। সে হাত ধরে অনুনয় জানিয়ে অভ্যর্থনা করে। চলুন অমিয়বাবু—আমাদের কুঁড়ে ঘরে কি পা দেবেন না ?

এসব কি বলছেন, নিশ্চয় যাবো। কিন্তু দেখলেন তো বন্ধু হয়ে আমাকে কেবল অপদস্থ করলে।

ছেলেমেয়েরা হতবাক্ হয়ে থাকে। এমন তারা কখনো শোনে নি। তারা নিখিল ও অমিয়র দিকে তাকাতে থাকে।

বড়ই দুঃখের বিষয় একটা সিন্ ক্রিয়েট করে ছাড়ল।

তাতে কি আপনি ছোট হয়েছেন, ঠিক করে বলুন তো আজ আপনার জন্যে কি আমাদেরও মুখ উজ্জ্বল হয়নি ? শান্ত-শ্রীর ভিতর দিয়ে একটা দৃঢ় জিজ্ঞাসা ফুটে বার হয়। সমস্ত অন্তরের রহস্য জানা এক দৈবজ্ঞান সম্পন্নার যেন প্রশ্ন, আপনি কি খুশি হন নি ?

কিন্তু টাকাটা ত আমি দিইনি।

এটা আরও সহজ প্রশ্ন—এক্ষুনি উত্তর বলে দিচ্ছি। কেউ না দিলে আর দশজনে অত সহজে স্বীকার করে নেয় না। আপনি অধীর হচ্ছেন কেন ? জানুন আপনিই দিয়েছেন।

ওরা লাইব্রেরী ছাড়িয়ে অনেক দূর এসেছে। চাঁদের আলোতে পথটা মন্দ লাগছেনা, এখনও কলোনীর বাসীন্দারা ঘুমায়নি। দিনের পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরেও যে যার ঘর-দুয়ার মেরামত করছে। কেউ বা কোদাল চালাচ্ছে নতুন ফসল বোনার আশায়। এরা শহুরে হয়েও একেবারে শহুরে নয়। আবার মনমুগ্ধকর ডালিয়া, আবার গোলাপের সুগন্ধ।

ছেলেমেয়েরা একে একে অমিয়কে অভিবাদন করে নানা দিকে চলে যায়। শুধু আরতি আসে ললিতার সঙ্গে।

ড্রাইভার বলে আমি গাড়িতে গিয়ে বসি।

আচ্ছা যাও আমি এক্ষুনি আসছি।

আর একটু এগিয়েই ললিতা সোজা পথে বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়। আপনারা আসুন, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

আমার জন্য কোন ভদ্রতার প্রয়োজন নেই, একসঙ্গেই চলুন।

তা নয়—। আরতি ব্যঙ্গকণ্ঠে বলে।

নিমিষের জন্য ভ্রম হল রেবতী বলে। এ শুধু মুহূর্তের ভুল। মাতাল পুরুষের স্নায়বিক উত্তেজনা মাত্র।

—তা নয়। ছেলে কাঁদছে বৌদির।

এর মধ্যে নিখিলের সন্তান হয়েছে! কিরে নিখিল আমাকে তো বলিস নি? সাধে তোর মাসে খরচা বাড়ছে। বেশ বেশ উত্তম। অমিয় হাসে।

হাসির অন্তরালে যেটুকু বিষ তাতে কিন্তু দগ্ধ হয় নিখিল।

অমিয় হাসলেও কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে,—ঐ খরচার ভয়েইতো এখন পর্যন্ত আমরা কিছু করতে সাহস পেলাম না। সাবাস তোকে, সত্যিই তুই দুঃসাহসী বটে! অমিয়র আর এক পা-ও এগোতে ইচ্ছা করে না। এর কারণ সঠিক সে বুঝে উঠতেও পারে না। সে আজ মনে মনে একটা খসড়া হিসাব করে দেখে কত টাকা নিখিল ধার নিয়েছে। কম নয় শ'পাঁচেক। টাকাগুলো ব্যাংকে জমালে একটা মূলধন হত।

ছেলেটা দেখতে কেমন হয়েছে? ওর মতই কি খোঁচা খোঁচা দাড়ি? দূর, দূর তা হয় কি করে? তবে সুন্দর যে হয়নি এ একেবারে সঠিক। এ বিয়ে সুখের এবং স্বাচ্ছন্দের নয়। উপায় নেই বলেই ললিতা হাসি ঠাট্টায় মশগুল হয়ে থাকে। গভীর মুহূর্তে হয়ত তেমন ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এলে গড়িয়ে পড়ে চোখের জল।

বাড়ির ভিতর থেকে একটা লণ্ঠন নিয়ে ললিতা এগিয়ে আসার পূর্বে ওরা এসে উঠানে দাঁড়ায়।

কিরে একটা ফুলগাছও কি লাগাতে পারিস নি? একটা ডালিয়া? অফিসের পর এসে কি করিস! একেবারে কুনো হয়ে গেছিস দেখছি।

ললিতা বেরিয়ে আসে। হাতে তার আলো। সে হাসতে হাসতে বলে, উনি সন্ধ্যের পর একটা টুইসনি করেন—সময় পান কোথায়? সকলের কি এ সমাজে ফুল ফোটাবার অধিকার আছে?

একটু যেন মন্ত্রপুত ঔষধ পড়ে। অমিয় ক্ষণিকের জন্য চুপ করে। আবার ফণা তুলে দাঁড়ায়। সে ভুলে যায় যে ললিতার সঙ্গে আজ প্রথম পরিচয় তার।—না—বৌদি কলোনীর কেউ বসে থাকে না, কারু আলস্য নেই—ও শুধু ব্যতিক্রম। আপনারজন বলেই বলছি, নইলে আমার কি। তারপর সে চাপা গলায় বলে, দিন দিন কেবল ধার কর্জ বেড়েই চলেছে।

এ অভিযোগের ললিতাও যেন জবাব দিয়ে উঠতে পারে না। কথার সুরটা যেন অস্বাভাবিক কেটে গেছে। সে অনুরোধ করে ঠাণ্ডায় না দাঁড়িয়ে ভিতরে

এসে বসুন।

নিখিল,—সমস্ত অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী নিখিল, বাদীর মুখের দিকে একবার মাত্র চেয়ে দেখে। দেখেই বুঝতে পারে, অভিযোগ নয়-সাহারার তৃষ্ণাদীর্ণ হাহাকার, চাতকের ফটিকজল, ভিক্ষা, যাযাবরের নীড় বাঁধার অবদমিত অভিলাষ। সে মনে মনে ক্ষমা করে বন্ধুকে।

পরিস্থিতিটা আরো ঘোরাল হয়ে না ওঠে তাই আরতি ঘরের ভিতর ছুটে যায়। এবং রেবতীর মতই বুদ্ধির পরিচয় দেয় একটা। সে ফিরে এসে বলে, এই দেখুন কে বললে আমাদের নিখিলদাকে ঘরকুনো আলসে? সারা কলোনীর বাগানে কি কেউ এমন একটি ডালিয়া ফোটাতে পেরেছে। বলেই সে একটি ফুটফুটে মাখনের মত ছেলেকে ছেড়ে দেয় অমিয়র কোলে।

আহা হা ঠাণ্ডা লাগবে, ঠাণ্ডা লাগবে যে। অপ্রতিভ অমিয় তোয়ালে-খানা দিয়ে অত্যন্ত গুছিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে ঘরে ওঠে। লণ্ঠনের দীপ্ত আলোতে শিশু অমিয়র দিকে চেয়ে হাসে।

এ রক্ত-মাংসের ডালিয়ার যে সত্যই তুলনা হয় না। অমিয় সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে। যেমন সুন্দর দুটি চোখ। একটি পালক থেকে অপরটি যেন কোন হিসাবী ভাস্কর দূরত্ব বজায় রেখে এঁকেছে। গাল দুখানি কত সুকুমার তা অমিয় বুঝিয়ে বলতে পারে না। নাকটি দেখলেই যেন শিরীষ ফুলের কথা মনে পড়ে। সবচেয়ে আকর্ষণ, ওর শুধু মুখে নয় সর্বদেহে যেন হাসি মেশানো। বুঝিবা খুবই খুশি হয়েছে এই নবাগত সাহেবকে দেখে। শিশু টাইটা টেনে ধরে দুহাতে। কত তার বাহাদুরি, কত তার আবল-তাবল গর্ব। সে কাবু করেছে এক মত্ত মাতঙ্গকে।

ঘরখানা ভাল করে গোছাতে পারেনি ললিতা। ভাঙা তক্তপোষের পাঁজরার ওপর একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু তার আগেই অমিয় বাধ্য হয় একটা ময়লা কাঁথায় বসতে—। যে কাঁথাটার পাশে সেই রেশন ব্যাগটা বেড়ায় টাঙান।

নিখিল একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ললিতা বলে, ওকি এই চাদরটার ওপর বসুন।

না বৌদি ব্যস্ত হবেন না আমরাও সাধারণ ঘরের ছেলে।

কিন্তু ললিতা সুস্থ হবে কি করে, খোকা যে অনেকক্ষণ 'হিসি' করেনি।

ললিতার মনের কথা নিখিল ও আরতি সহজেই বুঝতে পারে। আরতি একটা মজা দেখাবে বলে মুখ মুচকে হাসে। নিখিল চোখ ঠার দেয়। আরতি তবু সংযত হয় না। ও মুখে আঁচল গুঁজে দেয়।

ললিতা বলে, ওকে আমার কোলে দিয়ে একটু সুস্থ হয়ে বসুন।

অমিয় জবাব দেয়, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? আমি আর ওকে নিয়ে পালিয়ে যাব না। কি বলিস নিখিল?

ললিতা একটু লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। সে রান্না ঘরের দিকে চলে যায়। আমার সঙ্গে একটু আয় ভাই আরতি। তুমিও একটু শুনে যাও।

অমিয় বলে, আমি কিন্তু এখন কিছু খাব না।

ওরা অমিয়র কথায় কান না দিয়ে চলে যায়।

খোকা ও অমিয় ব্যতীত ঘরে আর কেউ নেই। এইত অবকাশ! এইত সুযোগ! অমিয় মুখ নীচু করে। সহস্র চুম্বনে অস্থির করে দেবে শিশুকে।

অমিয় অধীর ওষ্ঠপুষ্ট নামাতে পারে না। সংকোচে দ্বিধায় সে স্তব্ধ হয়ে থাকে। একটু পূর্বেই না সে এই ঠোঁট দুখানা ডুবিয়ে পান করেছে মদ্য। নিষ্কলঙ্ক শিশুর মুখে সে কিছুতেই ছোঁয়াতে পারে না এ অপবিত্র ওষ্ঠ।

টাইটা ধরে শিশু তাকে টেনে আনে। সে তার দুধে লালায় ভরে দেয় অমিয়র মুখমণ্ডল। অমিয় চুপ করে থাকে। সে যেন স্বর্গসুখ অনুভব করে এই কুঁড়ে ঘরে বসে।

হঠাৎ তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সে সইতে পারে না এ সুখময় স্পর্শ। মদ্যপ ভুলে যায় পারিজাতের পবিত্রতা। যে চুম্বন করে ঘন ঘন।

ফেরার মুখে ট্যাক্সিতে উঠে অমিয় বলে, বেশ করেছিস্ নিখিল পাঁচ শো টাকা আমাকে ফেরৎ না দিয়ে তবু একটা সৎ কাজে কিছু সাহায্য হল। আর যে দুশ আমাকে শোধ করে দিয়েছিস, তাও না দিলেই বোধ হয় ভাল হত। যে আমার চরিত্র।

নিখিল বলে, অতটা সাহস হল না। দেখ মানুষের যদি কৃষ্টিই না থাকে—তবে পশুতে আর মানুষে তফাৎটা কি দাঁড়ায়?

অমিয় কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বে, সেই মিটিং ভাঙা একটা খণ্ডিত জনতার কণ্ঠ শোনা যায়, দূরে: কলোনি আমরা ছাড়ব না ছাড়ব না···

মোটর স্টার্ট দেয়···

অমিয় মনে মনে বলে, কে তোমাদের কলোনি ছাড়তে বলে? ধনে জনে তোমাদের ঘর ভরে উঠুক,—ঈশ্বর তাই যেন করেন।

ললিতাও শিশুকে অঞ্চলে ঢেকে সঙ্গে এসেছিল। সে বলে আবার আসবেন ঠাকুর পো।

নিশ্চয়ই আসব।

কিন্তু একা নয়—যেন শাঁক বাজিয়ে ঘরে তুলতে পারি।

আরতিও পিছু পিছু এসেছিল। সে শুধু মৌন থাকে।

কলোনি ছাড়িয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মোটর এসে বড় রাস্তায় ওঠে। ভুল হয়ে গেল নিখিলকে রেবতীর কথা বলতে। ভুল হল নিখিলের নিজস্ব অভাব অভিযোগ জানতে। সব ওলোট পালট করে দিলে কে যেন। শুধু একটা সুখ স্বপ্নভরা তন্দ্রাজড়িত মধুরিমা অমিয়কে যেন আচ্ছন্ন করে রাখে।

ড্রাইভার মোটরের গিয়ার অদল-বদল করে। এড়িয়ে যায় মুখোমুখি রিক্সা কিম্বা বাসের সংঘর্ষ। রাস্তার ভিড় একটু পাতলা। সন্ধ্যাবেলার ধোঁয়া ও কুয়াশা একটু হালকা। টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর মোড়। স্পীড কমিয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবেন এখন ?

হাত ঘড়িটার দিকে নজর পড়ে অমিয়র হঠাৎ। রাত মাত্র ন-টা। সেই নটাও তো ঠিক বাজে নি। এখনো পাঁচ মিনিট বাকি। এরপর দশটা, এগারটা, বারটা, একটা, দুটো—উঃ শেষ নেই, শেষ নেই।

অমিয় কোথায় যাবে ?

সাত

এই ঘিঞ্জি বসতি কলকাতা শহর। এখানে একটি গৃহ নেই যে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। একটি উত্তপ্ত শয্যা নেই যে তাকে জানাবে প্রতিটি শীতের নৈশ নিঃসঙ্গ মুহূর্ত আমন্ত্রণ। একটা সুন্দর ফ্ল্যাটের অমিয় বাসিন্দা। সুদক্ষ বলিষ্ঠ চাকরও আছে একজন। স্তূপীকৃত বিছানাও রয়েছে দামী। কিন্তু তা সে চায় না। সে যা চায় তা আপাতত পাওয়া সম্ভব নয়। হাতের বাইরে ফস্‌কে গেছে যেন যাদুকরের যাদুদণ্ড। সে মদ খেলেও ঠিক মাতাল নয়। বাউণ্ডুলে বয়াটে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ালেও, আসলে যাযাবর নয়। তার সাধ-আহ্লাদ বাসনা আছে অগাধ। কিন্তু সবই ছাই চাপা আগুনের মত হয়ে রয়েছে যেন !

বাবু কতদূর যাবেন ?

তাই তো কতদূর কোথায় তার গন্তব্যের সমাপ্তি সে তো জানে না। অন্ধকারের আবর্তে না জ্যোৎস্নার প্লাবনে ? এখনো সে ঠিক বলতে পারছে না।

কিছুক্ষণ ধরে ভাবে অমিয়। মোটরটার তালে তালে তার দেহ স্পন্দিত হয়। আলোছায়া পড়ে মুখে ড্রাইভার মাঝে মাঝেই মুখ ফিরিয়ে তাকায়। কোনো উত্তরই অমিয় দেয় না। অনেকগুলো টাকা মিটারে উঠেছে। পাবে তো ? চোখ বুজে রয়েছে কেন ? বেটা যেন লাট সাহেব। হেলান দিয়ে

বসেছে বেশ যুত করে আরামসে। আহা নিজের গাড়ী যেন! "ক" পাট খেয়েছে।

অতলান্ত অন্ধকারের আবর্তই অমিয় তার চারদিকে দেখতে পায়। সব থাকতেও কিছু যেন নেই। বিদ্যা বুদ্ধি ঐশ্বর্য সমস্তই বৃথা হয়ে গেছে। রূপে কোন কাজ হয়নি, তার প্রেমার্ত্ত কণ্ঠের আকুতি শুনে কেউ সাড়া দেয়নি। এ পৃথিবী বড়ই নিষ্ঠুর।

না, না এ অত্যন্ত অসত্য কথা। আবার একটি মুখ মনে পড়ে। নিষ্পাপ শুভ্র প্রভাতী ফুলের মত। দক্ষিণা বায়ুর নাড়ায় নাড়ায় সে তো সাড়া দিয়েছিল। অমিয়র ডাক তো বৃথা হয় নি। কিন্তু লগ্ন এল না মিলনের। সে তো সংসার করে নিখিলের চাইতে অনেক বেশী সুখী হতে পারতো!

বাবু—।

সোজা চালাও, বিরক্ত কর না এখন।

কিন্তু তখন তো আর উপায় থাকবে না—আপনার কথামত চালান মানে মোটরখানা খোয়ান—নির্ঘাত অ্যাকসিডেন্ট।

ঠাট্টা করছ?

না স্যার—সত্যি বলছি।

জগু বাবার বাজার পর্যন্ত তো চলো।

ঐ তো বাজার, চিনতে পারছেন না? একটু মুখ বার করে দেখুন।

অমিয় লক্ষ্য করল দোকান পসারের দিকে। তারপর বেরিয়ে গেল দরজা খুলে। তুমি একটু এখানেই দাঁড়াও।

লোকটা পালিয়ে যাবে না তো? গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয়। এমন কত ভাড়া যে তার কত মারা গেছে। এই আসি বলে একেবারে পগার পার। কিন্তু উপায় নেই। এর জন্য আগাম কোনো দলিল রেজেস্ট্রী করে নেওয়া চলে না। বড্ড ঝঞ্ঝাট ট্যাক্সি ড্রাইভারী। মোটা খদ্দের হলেই, হয় গুণ্ডা নয় জুয়াড়ী, নিদেন পক্ষে মাতাল জুটবেই জুটবে, তবু ভাল যে ডাকু নয়।

ওর এতক্ষণ বাদে মনে পড়ে, মানদার কথা। গরবিনীর সে কি শাসানি সকালবেলা। কতদিন একেবারে নিরামিষ যাচ্ছে—সিনেমা দেখা হয় নি।

এই নে পয়সা—ব্যাগটা খুলে দেখ। দশ টাকা রয়েছে। একটু ঘুমাতে দে মাইরি আর চেঁচাসনে। ভোর রাত্তিরে এসে শুয়েছি।

বড় মাথা কিনে নিয়েছেন। সারারাত কোথা গিয়ে হুল্লোড় করা হয়েছিল যে পকেটে মাত্তর দশ টাকা? একটাকে রাখা মুরোদ নেই পাঁচ জায়গায় চাখা। ঝ্যাঁটা মার ঝ্যাঁটা মার এ সব কুকুরের কপালে। ও টাকায়

আমার শাড়ি হবে না কি করে সিনেমায় যাবো?

তার পর বলবি যে গাড়ীও লাগবে না? একেই বলে কালকা যোগী...তন্দ্রা জড়িত কণ্ঠেই ড্রাইভার বলে চলে, একটু সুন্দরীই যদি না হতিস তো তোর দিকে তাকাত কে? দশটাকায় সিনেমা দেখা হবে না!

সেদিন যে ভেদ বমি হল—সারা রাত গু মুত কাচলাম না হয় ফাউ, কিন্তু ডাক্তারের টাকা ওষুধের দাম দেবে কে? বলি আমি কি তোর বিয়ে করা মাগ নাকি? ওঠ, ওঠ হারামজাদা হাজার চাটা কুত্তা।

রাগ করলি নাকি মানদা? তুই আমার চাঁদের কলঙ্ক এই শহরে সতী সাধ্বীর বাড়া, এখন একটু ঘুমাতে দে, তোর দুটি পায়ে পড়ি।

তবে বাবুকে যে ট্যাক্সি ভাড়া দিবি সে টাকা দশটাও নিলাম।

ওরে না না—তবে আর গাড়ি বার করতে দেবে না। ঠায় মারা যাব না খেয়ে।

এত যার বিবেচনা সে বাড়ী না ফিরে কি করে ওড়ায় টাকা পয়সা মদে মাগীতে? আমি সব শুনেছি ত্রিবেদীর মুখে। এখন আমার হাত নিসপিস করছে। ঝাঁটা খানা কই। মানদা সমার্জনী খোঁজে। বেটা হাজার চাটা চরিত্রহীন। এর জন্য আমি গয়না বন্দক রেখে ডাক্তার কোরেছি!

বড্ড সতীপনা দেখাচ্ছিস। তুই গান জানিস; নাচতে জানিস? ইয়ার বন্ধুরা ধরলে কি করি? একটা দিন বই তো না।

ঝাড়ু পাওয়া যায় না। ড্রাইভার ধাক্কা খেয়ে উঠে বসেছে। তাইতো এত দেরী হচ্ছে কেন? বাবুটা গেল কোথায়? সত্যিই ওদিক দিয়ে সরে পড়ল নাকি? আচ্ছা জ্বালা যা হোক। সারাদিন কিন্তু তেমন কোন খদ্দের জুটল না শেষকালেরটা গলার কাঁটা হয়ে না দাঁড়ায়। একটু এগিয়ে দেখলে মন্দ হত না। কিন্তু শালা ট্রাফিক পুলিশ রয়েছে শকুনের মত হাঁ করে। ভাগাড় দেখলে আর কথা নেই। ড্রাইভার গাড়িটা মোছে ঝাড়ন বের করে, শঙ্কায় উত্তেজনায় সে দুলতে থাকে।

অবকাশ বুঝে মানদা এসে আবার দাঁড়ায়। চুলের মুঠি ধরে নামায় শয্যা থেকে আবার প্রভাতের একাংকিকার যবনিকা উত্তোলিত হয়।

উঃ ছাড় ছাড় মাইরি—বড্ড লাগে।

কেন নাচ দেখার সময় লাগেনি, মদ খাওয়ার সময়?

আমি আর কিছু করিনি সত্যি বলছি। ত্রিবেদী বেটা চুকলি কেটেছে মিথ্যা-মিথ্যি। মানদা আমি মদও খাইনি। বন্ধু-বান্ধব আর মালিকের পাল্লায় পড়ে। উঃ ছাড় ছাড়...

কি বললি গাড়ির মালিকও ছিল নাকি সেই বুড়ো বেটা? ষোল আনা ভাড়াও নেবে, কুপথেও চালাবে। মানদা চুলের মুঠি ছেড়ে দেয়।

আর সব ড্রাইভাররা দশ টাকা করে চাঁদা দিলে আমি কি করে এড়াই। বল। শেষ পর্যন্ত মোসাহেব সন্তু সিং আর মালিক রইল, আমরা উঠে এলাম কিন্তু নাচ-গানটা খুব জমেছিল—যেন বেহেস্তের পরী। তুই যদি একটুও গান বাজনা জানতিস।

আমরা গেরস্থ ঘরের মেয়ে, আজ না হয় দায় ঠেকে খাতায় নাম লিখিয়েছি কিন্তু ওদের চৌদ্দ পুরুষ বেশ্যা।

হ্যাঁ তা ঠিক। তবু—

নাচ গান ভাল? হায় রে অকৃতজ্ঞ, হায় হায়। সেদিন এই মানদার মত সহনশীল না হলে কে তোমাকে বাঁচাত? নাচ গানে পুরুষকে উতলা করা যায় বটে, কিন্তু মুমূর্ষুকে বাঁচান যে মায়েরই দায়িত্ব। বেশ্যা মানদার মাতৃহৃদয় অভিমানে ফুলে ফুলে ওঠে। সে মুখ ভার করে থাকে।

মান করলি নাকি মানদা? ব্যাগে যা রয়েছে নিয়ে নে। আরে দশ টাকা আছে ভিন্ন একটা খোপে।

মানদা কিছুই নেয় না আর কোন গঞ্জনাও দেয় না। কিন্তু তার নীরবতা ড্রাইভারকে চঞ্চল করে। সে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে সাগ্রহে কয়েকটা চুমা খেয়ে বলে সবতো পেলি আর রাগ রাখিসনে অকারণ।

তবু অর্থের প্রয়োজন। ডাক্তার, ঘর ভাড়া, হাট-বাজার গয়না উদ্ধার··· ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাই সকাল সকালই ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু একি ফ্যাসাদ—বাবুটি ফিরছে না কেন?

ও ঝাড়নটা তুলে রেখে খানিক লক্ষ্য করে মোড়ের দোতালার দিকে।

ওয়াইন এ্যাণ্ড ফুড···

তা একটু দেরী হবে বই কি! চন্দনের ফোঁটা ফুলের মালার ইজ্জত বাড়িয়ে তবে তো তো ফিরবে। বে-থা করেনি, একেবারে যে নবাব পুত্তুর তাও নয়। যদি এদের সত্যি সত্যি পয়সা থাকত, নিশ্চয় খুলে দিত সিনেমা কোম্পানী।

বাপস্ খালি গিলছে ওগুলো!

ড্রাইভার এবং মানদা আইন-মাফিক স্বামী-স্ত্রী না হলেও আছে বেশ—আছে ঝালে নুনে রাগে-রসে কটকটে। নানা ঝঞ্ঝাট, টানাটানি, সামাজিক প্রশ্ন না থাকলে ওরা দেখিয়ে দিত কেমন আদর্শ স্বামী-স্ত্রী।

এত পয়সা থাকতেও বাবুটা বাউণ্ডুলের খাতায় নাম লেখালে কেন?

ড্রাইভারের মনটা নরম হয়ে ওঠে। মদ খেলেও লোকটা একেবারে মন্দ নয়। আর যাই হক কথা বলতে ওস্তাদ। তেমনি একটি মেয়ের সঙ্গে ওর প্রেমের কথা শুনতে ইচ্ছা করে। দু'খানা যেন খাপ খোলা বাঁকা তলোয়ার ঠিক মানদা ও ড্রাইভারের মত।

অমিয় এসে গদিতে দেহ এলিয়ে দিয়ে হুকুম করে, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ।

তারপর আবার কি টালা বলবেন?

বিরক্ত হলে নামিয়ে দাও—দেখি মিটারটা?

জেনো এটা কিন্তু কলোনী নয় যে আর গাড়ি পাব না।

না, না না বাবু—তবে কি জানেন শীতের রাত্তির কিনা? এই ইয়ে তেমন জামা-কাপড় সঙ্গে আনি না।

ঘরে কে আছেন? জামা কাপড়ের কথা কিছু নয়। কোন ড্রাইভারের মুখে আজ পর্যন্ত একথা শুনি নি।

ড্রাইভার হাসতে থাকে। সে হাসির ভিতর কার যেন মুখের দীপ্তি ফুটে ওঠে। অমিয় স্পষ্ট না দেখলেও তা যেন টের পায়।

এক্ষুণি তুমি ছুটি পাবে।

আপনি?

সারারাত আমি ঘুরব।

আমিও সঙ্গে থাকব।

অমিয় হেসে ওঠে উচ্চস্বরে। কোথায় ঘুরবে পাগলের মত? সারা রাত্রির বক্‌শিশ আমি এক্ষুনি তোমায় দিয়ে দেব। কেন তুমি রাত খোয়াবে আমার মত একটা ভবঘুরের সঙ্গে ঘুরে।

ড্রাইভার কৃতজ্ঞতায় অধীর হয়ে পড়ে। তার রীতিমত সংযত হয়ে গাড়ি চালাতে হয়।

আট

কে, অমিয়? বিনয় জিজ্ঞাসা করে, এই বুঝি সাতটা?

কথা রাখতে পারিনি—নানা ঝামেলায় পড়ে গেলাম। শেয়ালদা, নিখিলের কলোনী—প্রায় টালা—টালিগঞ্জ। ট্যাক্সি করে ঘুরেও লেট। কবে এলি? আজ। কেমন আছিস?

পরে বলছি। প্রথমেই লেট-ফাইন বাবদ একখানা সুগন্ধি পান খাওয়া।

এই তোরা কি বলিস ? এদিকে আয় সব্বাই।

বিনয়ের ডাকে আরো কটি বন্ধু-বান্ধব এসে ঘিরে ধরে অমিয়কে। তাদের মধ্যে একজন বলে, ও এই ক'মাস ধরে হ্যাবিচুয়াল লেট ও শুধু পানে হবে না— একপ্লেট ভরে মাংস চাই।

বিনয় বলে, আমি কি করব ব্রাদার—জানই তো আমি প্রায় নিরামিষ। হাউস সমেত যখন একপক্ষে ভোট দিয়েছে, তখন এইটুকুই এ্যামেণ্ডমেণ্ট করতে পারি যে ঐ সঙ্গে এক কাপ চা।

সকলে হেসে ওঠে।

অমিয় বলে তাই হবে। চলো নিকটে কোথায় রেষ্টুরেণ্ট আছে।

রাসবিহারী এ্যাভিন্থর মোড়। ঠিক দক্ষিণ ফুট। অমিয় যেন রানী মক্ষিকা। ওকে ঘিরে মৌমাছির দল এগিয়ে চলে। সন্ধ্যাবেলা শীতটা যেমন একটু চড়া ঠেকেছিল, এখন তা নেই। আকাশে একটা থমথমে ভাব। পেঁজা তুলার মত স্থানে স্থানে মেঘ জমেছে। এই আবহাওয়াটা ওদের কাছে মন্দ লাগে না। বিশেষ করে বিনয়ের কাছে। ওর পরণে ধুতি এবং সুতীর পাঞ্জাবি। তবে ভিতরে সোয়েটার, বাইরে র‍্যাপার রয়েছে।

এ সময়ে ভিড় যতটা পাতলা থাকা উচিত ছিল—তা আজ নয়। কর্মব্যস্ত মানুষ হন্ হন্ করে ছুটছে। শীত কম বলে এতটুকু সময়ও কেউ নষ্ট করতে রাজী নয়।

অমিয় ফুটপাতের এক প্রান্তে এসে একটু দাঁড়ায়। কোট, সার্ট, হাওয়াই, হাফপ্যাণ্ট এবং প্যাণ্টের দলও থামে।

অমিয় পকেটে হাত ঢুকিয়ে খাটো গলায় বলে, একটা সংবাদ মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ডস—ভেরি প্যাথেটিক নিউজ !

রণজিৎ প্রায় বছর তিনেক ধরে বেকার। তেমন মামার জোর নেই, তাই কোন অফিসে স্থান হয়নি।

দু' একটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার দক্ষতার জন্য অমিয়র আণ্ডারে এই ফুটপাথ ক্লাবে চাকরী পেয়েছে। অন্য কেউ আসুক কি না আসুক রণজিতের একটি সন্ধ্যাও কামাই যায় না। ঝড়ে বাদলে গ্রীষ্মে কিংবা শীতে সে ঠিকই উপস্থিত আছে। তাই দু' একদিন তার ভাগ্যে দু' একটা বোনাস জুটে যায়। এই যেমন উদয়শঙ্করের নাচ অথবা সিনেমা স্টারদের স্পেশাল কোনো ফাংশন। সেই সঙ্গে দমভর খানাপিনা। এত গেল উদরের কথা—সে স্বভাব নম্র, মাগনা পেলে, ধেনোতেও আপত্তি নেই। রণজিৎ জিজ্ঞাসা করে,—নিউজটা কি ভাই সাইকলজিক্যাল ?

বিনয় হচ্ছে কথার বেনিয়া—হেনরি ফোর্ডও বলা চলে। সে আপত্তি করে, নো মাই ডিয়ার—নিউজটা একেবারে ফিজিক্যাল।

রণজিৎ বলে, তবে নিশ্চয় ও আজ ঠ্যাঙানি খেয়েছে কোনো জেনানা-ঘঠিত ব্যাপারে। কিন্তু ধুলো কোথায়? দাগ কই?

বিনয় আহাম্মক হয়ে থাকে। এভাবে যে কথাটার মোড় ঘুরবে তা ও বুঝতে পারেনি। কারণ এর পেছনে বছর খানেক পূর্বের একটা মর্মন্তুদ ছায়া রয়েছে বিষাদের। তা হয়ত অমিয় এবং বিনয় ছাড়া এই পরিষদের ভিতর কেউ জানে না। তাই বিনয় বলে না, না, তা নয়রে।

বিতংস অপেরা পার্টির চাপদাড়িওয়ালা ম্যানেজার সময়তে এশিয়ান ইনসিয়োরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট ভণ্ডুল বলে, তুই থামতো বিনয়। আলবৎ দাগ আছে, চেঁচিও না, লোকে শুনবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার দিকে একটু ঘুরে দাঁড়াও তো অমিয়, ললিতা জয়ন্ত কি নার্গিসের মত?

নেশায় চুর অমিয় তেমনি করে দাঁড়ায়।

ভয় কেটে যায় বিনয়ের। হয়ত অমিয় বিগত কাহিনী অনেকটা ভুলে গেছে কিংবা উড়িয়ে দিয়েছে সিগারেটের ধোঁয়ার মত। এখন তার একটু চটুলতায় যোগ না দিলে বিসদৃশ দেখাবে। হয়ত এই ফুটপাথ ক্লাবের হল্লার রুটিন নিত্য চলে এমনি।

অভিভাবকদের সার্থক নামকরণ—ধর্মের ষাঁড় ভোম্বল সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে অমিয়র দিকে। আর বিস্ফারিত চোখে চেয়ে চেয়ে থাকে শিবু সেন। সে নবাগত হলেও প্রায় দু'বছর এসেছে। কিন্তু এখনো স্থায়ী সভ্য বলে গণ্য হয়নি ফুটপাথ ক্লাবে।

বিনয় অমিয় আসার একটু আগে দুঃখ করেছে, তুমি কখনো যে পারমানেন্ট হতে পারবে সে আশা নেই। কত দস্যু এখানে এসে মহর্ষি বনে গেল জেনানা-চরিত শুনে। আজ পর্যন্ত তোমার গোঁফের রেখাই দেখা গেল না।

ভোম্বল সহানুভূতির সঙ্গে বলেছে, ও মাকুন্দ, ওর দোষ কি?

রণজিৎ বলেছে, এ তো ইয়ুনিভার্সিটির ডিগ্রী নয় যে একটু চেপে পড়লেই পাশ করবে। বিনয় অন্ধকে অন্ধ বলে দুঃখ দেওয়া মোটেই উচিত নয় আমাদের।

স্টিল ইট ইজ এ ডিসকোয়ালিফিকেশন। নিরপেক্ষ সমালোচকরা অন্তত তাই বলবে। স্বভাবের দোষেই তো আজকালকার ছেলেছোকরা কেরানীর নাইটি নাইন পারসেন্ট পারমানেন্ট হচ্ছে না।

অর্থাৎ? রণজিৎ প্রশ্ন করে, আমি যে চাকরি পাচ্ছিনে, অফিসে অফিসে হত্যা দিয়েও—

বিনয় জবাব দেয়, এ তোমার স্বভাব। কেন হত্যা দিয়ে যাও? কেন যার হাত ধরতে পার না ধরো গিয়ে পা? কেন বাবা একটু উপযুক্ত পিতার ঔরসে একখানা রুপোর চামচ মুখে করে জন্মাও নি?

অশোক বলে তা বটে। মন্তব্য করে, হিয়ার হিয়ার ফিলসফার! শিবু সেন বলে এবং অত্যন্ত সবিনয়ে বলে তা নয় স্যার, আমি···

তুমি বলতে পারবে না। যখন থেমেছ কি সব মাটি করেছ। বিনয়ই বলে, বক্তৃতা দিতে উঠলে ভুলচুক রিপিটেসন দেখলে চলবে না। আহা, তুমি মুখ দিয়েই তো শুধু বলেছ, প্রতিশ্রুতি পালনের তো বালাই নেই। ও দায়িত্ব জনসাধারনের, মানে আমাদের।

অশোক বলে, বিনয় তুমি থেই হারিয়ে ফেলেছ।

বিনয় বলে, ক্ষমা কর। ওই কথাই বলছি, ও বলতে চাইছে যে, সকাল বিকাল টুইসনি করে, রাত্রে কলেজ—ওর অবকাশ কোথায়? গোঁফকেও তো একটু সময় দিতে হয় গজাবার।

রণজিৎ তর্ক তোলে, কেন রাত্রে?

ওরে মুখখু সারাদিন খেটে এমন কি পুষ্টিকর পদার্থ খায় যে শরীরের ক্ষতি-পুরণ করে গোঁফ গজাবে?

ধর্মের ষাঁড় ভোম্বল মন্তব্য করে, ধন্য বিনয়দা, তুমি পায়ের ধুলো দাও আমাকে। আমার মাথাটা ঝিন ঝিন করছে। ইস্ কি থিওরিটাই আওড়ালে।

নে পায়ের ধুলো। তবু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুই একটা গবেট—এই জন্যই তোর পড়াশুনা হয় নি।

না হোক—তার জন্য আমার দুঃখ নেই। ভোম্বল স্যাণ্ডো স্টাইলে হাতের গুলি পাকিয়ে বলে, জীবনটাই বিফলে গেল। একটা মনের মত হাতের কাজ পেলাম না।

আর একজন বলে, তাও ভাল যে কোনো মেয়ের কথা বলিস নি। আপশোষটা কিন্তু সেই ধরনের হল ভোম্বল।

ভোম্বল আবার গুলি পাকায়, আবার বলে, জীবনটাই বিফলে গেল।

অমিয় ভণ্ডুলের নির্দেশে বারবার ঘুরে দাঁড়ায়, ওকে পরীক্ষা করা হয় কনে দেখার মত।

রণজিৎ বলে, দাগ কোথায় মারের?

এই যে! রঙিন কোটের এখানে ওখানে খানিকটা পাউডার লেগে রয়েছে খোকার মুখের।

ভণ্ডুল বলে, তোর কি চোখ নেই?

ওতো পাউডার।

ভণ্ডুল জবাব দেয় স্ত্রীলোকের মারে ধুলো লাগবে নাকি কুমাণ্ড এই বুঝি বি-এ, পাশ করেছিস? কালিদাসের আমলে ছিল লোধ্ররেণু—রবীন্দ্রনাথের আমলেও কিছু তার রেশ ছিল, কিন্তু কোটি, টাটা-বিড়লা, বেঙ্গল ক্যামিকেলের হাতে পড়ে এখন তা হয়েছে পাউডার। মাস্ স্কেলে প্রোডাকসন। তারই দাগ ওর কোটে। সার্টে চাই কি বুকে। ভণ্ডুল একটু থেমে বলে, হ্যাঁরে অমিয় তোর মুখে কাজলের দাগ লাগল কি করে? কোথায় গিয়েছিলি ভাই, কারা তোকে এমন ধারা জব্বর মার দিলে একা পেয়ে? যদি ভোম্বলটাকেও সম্বল করে যেতিস, ওর তো তেমন কোন চাহিদা নেই।

অন্যদিন হলে অমিয় হয়ত অনর্গল হাসত। কিন্তু আজ চুপ করে থাকে। ওর হৃদয়ে জেগেছে সেই খোকার সুকোমল স্পর্শ, আর অব্যক্ত এক বিগত অনুভূতি। ঈশ্বরের বিভূতি বলে মনে হয় অমিয়র।

দেখেছিস কেমন মারটা খেয়েছে—যেন টলে টলে পড়ছে। এখন বেহুঁশ হওয়ার পালা। শত্রুপক্ষে ক'জন ছিল? কোন জায়গার মারটা বিশেষ অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অমিয়? বলনা, বন্ধুবান্ধবের কাছে অত লজ্জা কিসের?

অমিয় নীরব হয়ে থাকে। একটা সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করে। তার আগেই প্যাকেটটা হাতে হাতে খালি হয়ে যায়।

ভণ্ডুল আবার রেশ টানে। বুকের চোটটাই নিশ্চয় গুরুতর। তুই জীবনভর আর শিখলি নে—কত ঠকলি তবু···

এ কথা যে কত সত্য অমিয় আজ তা মর্মে মর্মে বোঝে। আর বোঝে বিনয়। সে আবার চুপ করে গেছে এ প্রসঙ্গ থেকে।

নিখিল একটা বিয়ে করেছে।

সত্যি? এই দেখ তোকে টেক্কা দিলে।

উঃ, ভণ্ডুলটা কি জ্যোতিষ জানে?

বৌটি কেমন?

অন্যদিন হলে হয়ত নিন্দা করত, আজ অমিয় চুপ করে থাকে।

এখন তোমরা বুঝলে তো আরো অনেক কেলেঙ্কারী হয়েছে। যাক্ ব্রাদার ওসব ভুলে যাও, আমার কাছে বিশল্যকরণী আছে এখন একটু চা-টা খাওয়াও।

পকেট খালি আজকের বিশেষ নিউজ-ই এই!

সকলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ভোম্বল তো রীতিমত ক্ষেপে ওঠে। আমরা বরদাস্ত করব না এসব চালাকি। তার এবার ইচ্ছা করে দু-হাতের জোড়া গুলি দেখাতে।

রণজিৎ বলে তবে মিছামিছি সাতটা থেকে দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন এই হিমে? মাইরি আমার হাত পা টাটাচ্ছে। এতক্ষণ বাদে বিনয় আবার বলে। ওসব মিছে কথা—বল যে টাটাচ্ছে জিভ।

চুপ রাসকেল অত হাভাতে হইনি এখনো। কিন্তু অমিয়র মত কাণ্ডজ্ঞানহীন দেখিনি আজ পর্যন্ত। একেবারে কথার কোন মূল্য নেই।

শিবু সেন স্বভাবসুলভ বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, তবে কি আজ সিনেমাটাও বাদ যাবে অমিয়দা? ফুটপাথ ক্লাবের নাম শুনে মেম্বার হলাম কি মিছে? আমার ভাগ্যে আজ পর্যন্ত ফুল এক কাপ চা-ও জুটল না। অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। তবে চলি আজ। রণজিৎবাবু অনুগ্রহ করে আমার নামটা কেটে দেবেন। নমস্কার অমিয়দা।

শিবু সেনের কলার চেপে ধরে অমিয়। দাঁড়াও—কোথায় যাচ্ছ?

চারদিক থেকে নানাপ্রকার ক্ষোভের কথা তুবড়ি স্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ে। যত অপরাধ যেন অমিয়র। কেন ও এ কথা বলবে? ওদের এমন নিরাশ করবে কোন্ অজুহাতে?

বিনয় রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করে না। সে নিজের ধর্মানুযায়ী শুধু দুটি একটি ফোড়ন কেটে যায়। কারণ বিনয় বেকার নয়—অমিয়রই সহকর্মী। তাছাড়া তার স্বভাবটাও এদিক দিয়ে অনেকটা সংযত। তার লোভ, সে একটু আনন্দ করে বাড়ি ফিরতে চায়। আর এই বাউণ্ডুলে অমিয়? তার জন্য একটা দুর্বলতা আছে ভিতরে ভিতরে।

বড় সংসার। বিয়ে করার সুযোগ হয়নি বিনয়ের। এতদিন কলকাতা হেড অফিসেই ছিল। জলপাইগুড়ি বদলী হয়েছে কোম্পানীর দয়ায়।

নিখিলের চিঠি পেয়ে এসেছে ছুটে। কারণ অমিয়র সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই। প্রায় বছরখানেক পূর্বে এক সঙ্গে চেঞ্জে গিয়েছিল - তারপর এই। একটা জরুরী কথা আছে। কিন্তু তা বলার মত এ আবহাওয়া নয়। তাই হালকা কথায় সময় কাটাতে হচ্ছে।

শিবু বলে, উঃ ছেড়ে দিন অমিয়দা—এতক্ষণ লজ্জার মাথা খেয়ে বলতে পারিনি, এখন লাগছে।

অমিয় ছেড়ে দেয়, নেশার বোঝে বোধহয় একটু জোর ধরা হয়ে গেছে, এতো উচিত হয়নি।

বিনয় বলে কুছ পরওয়া নেই। তুমি অন্তত এক কাপ—Within inverted comma—full, চা পাবে শিবু সেন। অমিয় না দিক আমি খাওয়াব। তুমি হচ্ছ ফুটপাথ ক্লাবের কনিষ্ঠ জহরৎ। বর্তমান বাঙলার নিখুঁত মডেল।

চায়ের পেয়ালায় নাড়া দিতেই একটু একটু ধোঁয়া ওঠে—ক্রমে তা বিলীন হয়ে যায়।

অমিয় বলে চমৎকার প্রপোজাল। বিশেষ করে চমৎকার, যখন আপনাদের তরফ থেকে এল। কাল তাহলে সবাই মিলে ছুটি দরখাস্ত করুন।

বিনয় বলে, Man proposes, Woman disposes—হঠাৎ দেখি জ্যামিতির প্রতিপাদ্য উলটে গেল। আমার ভয় হচ্ছে।

কুমারী মাকড়ী দুটি দুলিয়ে অম্বুভা বলে, কোন ভয় করবেন না বিনয়বাবু। হাওয়া বদলে গেছে, যুগ পাল্টে যাচ্ছে। কি বলিস রেবা?

শিপ্রাও রেবার সঙ্গে মাথা নাড়ে, শুভ্র দাঁতের পংক্তি বেয়ে হাসি ঝরে পড়ে তিনজনার। ওরা ধীরে ধীরে চায়ে ঠোঁট ছোঁয়ায়। একটু একটু করে পেয়ালা অর্ধেক করে আনে।

অমিয়র চা জুড়িয়ে যায়।

ওকি খা। বিনয় বলে, অত ভাবনা কিসের, আজই তো আর চাকরী যাচ্ছে না।

বারে, চাকরী যাওয়া আর না যাওয়ার কথা এখানে ওঠে কি করে? আমি কিনা মনে মনে প্ল্যান করছি কোথায় কিভাবে যাওয়া যায়। কি কি সঙ্গে নেওয়া উচিত। ওদের যাতে এতটুকুও অসুবিধা না হয়…।

কিন্তু নিশ্চয় কিছু ঠিক করতে পারছিস নে—কি বলিস? আদপে ওরা যাবেন-ই না।

কেন? অমিয় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তুই হচ্ছিস এক নম্বর অলক্ষুণে। আগে থেকেই যত কু-ডাক ডাকা। এক কলসী দুধের মধ্যে এক ফোঁটা দই। হাতের নাড়ায় চায়ের পেয়ালাটা কাত হয়ে পড়ে।

সকলে সচকিত হয়ে ওঠে কাপড়-চোপড় সামলায়।

এই বয়, বয়। এধার মে -

বয় মোটেই বয় নয়—একেবারেই উল্টো, বৃদ্ধ টেবিলটা নীরবে পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যায়। আবার ওরা নিবিড় হয়ে বসতে চেষ্টা করে। কিন্তু তা পারে না। অমিয়র যেন ছন্দ হারিয়ে গেছে।

অম্বুভা জিজ্ঞাসা করে, চাকরীর কথা বললেন কেন, কিছু কি শুনেছেন নাকি?

না, না আপনি যা ভাবছেন তা নয়। তবে কিনা এভাবে এক্সকারেসনে বাইরে গেলে চাকরী থাকবেও না।

মুখ যেন শুকিয়ে যায় মেয়ে তিনটির।

ম্যাচ হচ্ছে না—একটি বাড়তি। তিনিই অফিসারদের কান ভাঙবেন। এ হচ্ছে হিউম্যান সাইকোলজি।

অনুভা মন্তব্য করে, আপনি বড় অসভ্য।

পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। হালকা ঠুনকো কাঁচের চুড়ির মত মেয়েরা পরিমিত হাসি হাসে। অমিয়র ভ্রূ দুটো রভসে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। বিনয় স্মিত গম্ভীর।

ছুটোর বেল বাজে। ওরা উঠে পড়ে। টিফিন শেষ হল।

রেস্তোঁরা ছেড়ে আসার মুখে অনুভা একান্তে অমিয়কে বলে, ডাইংক্লিনিংয়ের খরচটা আপনার দেওয়া উচিত—দামী শাড়ীটা নষ্ট করে দিলেন তো?

সেদিন ছুটির অনেক পূর্বেই বিনয়কে অমিয় অস্থির করে তোলে। এখন কলম রাখ। একটা ছুটির দরখাস্তের ড্রাফট কর। পাঁচ কপি টাইপ করিয়ে নেওয়া যাবে।

অনুভা স্টেনো টাইপিস্ট। সে বলে, আমিই টাইপ করে দেবখন কাল First hour-এ এসে।

সকলে অনুমোদন করে, সেই ভাল। পয়সা নষ্ট হবে না।

কিন্তু পরদিন অনুভা আসে না। মুখে মুখে শোনা যায় তার নাকি মাথা ধরেছে। তারপর দেখা যায় শিপ্রার হয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা—রেবার ঘাম বয়েল।

অগত্যা ওরা দু'বন্ধুতেই রওনা দেয়।

চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে বিনয় বলে, অমিয়, ওদের যেন তিনটিকেই দেখলাম কার সঙ্গে ভারতী সিনেমার নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ছেলেটাকে ঠিক চিনলাম না।

তা বলছিস চৌরঙ্গী পৌঁছে।

কি জানি কি দেখলাম—ভুলও তো হতে পারে।

হুঁ ভুল না হাতী!

দুজনে চুপচাপ আর কোন কথা হয় না স্টেশন পর্যন্ত। অমিয় বাইরের দিক চেয়ে কি যে ভাবে বোঝা যায় না। অন্য কোনদিন হলে ট্যাক্সিটাই সরগরম হয়ে উঠত। সামান্য একটা পিকনিক পার্টিতে যা আনন্দ হয়, তার একটা অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও অনুভব করতে পারছে না এই অসামান্য প্রবাস যাত্রায়। নিতান্ত জেদের মাথায় অমিয় বেরিয়ে পড়েছে। কারণ ওরা যেন ইচ্ছা করেই অপমানের তপ্ত তেলে ওদের—বিশেষ করে অমিয়কে ভেজে ছেড়ে দিয়েছে।

অমিয় প্রতিজ্ঞা করে এসেছে মনে মনে—দেখা যাক্ কে ওদের আমোদ, আহ্লাদ-হৈ চৈতে বাধা দিতে পারে? ও একাই তো শ'। সঙ্গে আবার

বিনয়টা যাচ্ছে। এ তো মনিকাঞ্চন যোগ। ওদের ভাবনা কি? এবার অভাবনীয় কাণ্ড সব করবে। ফিরে এসে অফিসশুদ্ধ সবাইকে দেবে চমকে। ফটো তুলবে কত রকম। ঝরণা পাহাড় সূর্যাস্তের রঙ ছোপান বনকান্তারের ওরা সংগ্রহ করে আনবে নানা উপঢৌকন। নানা দেশী কারুশিল্প। ওদের আশেপাশের টেবিলের সবাইকে দেবে—সেই বেঁটে লাজুক ছেলেটিকে পর্যন্ত।

তখন কেমন জলুনিটা হয় তাই দেখবে অমিয়। সে প্রতিশোধ নেবে চূড়ান্ত। যে কড়াইতে তাকে ভাজা করা হয়েছে—তার চেয়েও অনেক তপ্ত কড়াইতে সে নির্বিকার রাঁধুনীর মত খুন্তি দিয়ে চেপে চেপে ধরবে। একটু নড়তেও অবকাশ দেবে না। জীয়ন্ত কৈমাছ-গুলোকে। অমিয় মনে মনে আবার প্রতিজ্ঞা করে, সে প্রতিশোধ নেবে চূড়ান্ত।

কিন্তু আনন্দ কোথায়? প্রগাঢ় শান্তি? ওরা দু'বন্ধুতে তো মন খুলে কথা বলতে পারছে না। অথচ ওরা কেউ কারুর প্রতিপক্ষ নয়।

তবে কি হিংসা দিয়ে হিংসাকে শুধু জয়ই করা চলে—বহুদূরে একান্তে পড়ে থাকে বুক ভরা তৃপ্তি? মানুষের শান্তি কোথায়? কে হরণ করে নিচ্ছে তার মনের গোলার স্বর্ণ ফসল?

হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সি থামে।

ক'জন হকার এগিয়ে আসে।

বিনয় বলে দেখেছিস চারদিকে কেবল প্ল্যাস্টিক। চুড়ি, খেলনা, পুতুল, ব্যাগ, চিরুনী—এর ভিতর রক্ত মাংসের মানুষ আশা করা বৃথা। এক এক সময় আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

অমিয় শুধু বলে, হুঁ।

ওরা যেন যান্ত্রিক অভ্যাসে জিনিসপত্র কুলীর মাথায় তুলে দেয়।

দশ

রিক্সাগুলো একেবারে বাংলোর নিকটে এসে থামে। পেট্রোম্যাক্স-এর উজ্জল আলোতে মনে হয় এক ঝাঁক রাজহংসী নামছে।

সত্য সত্যই অমিয় বারান্দা ছেড়ে ঘরের ভিতর চলে যায়। বিনয়ও বন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ঘরের আলোটা কমানো ছিল, তা বাড়িয়ে দেয় বিনয়। চেয়ারখানা বেতের চেয়ার—একটা বেতেরই টেবিল মাঝখানে। কোন সৌখিন ঢাকনি নেই। কতগুলো ময়লা কাগজপত্র রয়েছে টেবিলের একধারে। সঙ্গের হোল্ড-অল খোলা। বিছানা বালিশ এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত,

প্রয়োজনের তাগিদে টুথ-ব্রাস চিরুনী আয়না সুটকেশ থেকে নেমেছে, কিন্তু গুছিয়ে রাখা হয়নি তাকে। এত সাধের দামী ক্যামেরাটা গড়াগড়ি যাচ্ছে অযত্নে।

বলার মত কোন কথা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিনয় বিরক্ত হয়ে ওঠে। কতকগুলো বইপত্র টেনে নামায় সুটকেশ খুলে।

দেখছিস অতসীটার বুদ্ধি? কতকগুলো মাসিক দিতে বলেছি, দিয়েছে ওষুধের ক্যাটালগ। কোন কথা কান দিয়ে শুনবে না। সব দিকে কি সব সময় নজর রাখা যায়।

তোর বোনটিরও বোধহয় গাম বয়েল। ব্যথায় বেদনায়, তাড়া-হুড়ায় দিশা রাখতে পারেনি। আমাকে ক্ষমা করিস ভাই, সকলেরই এক দশা— দুনিয়া শুদ্ধ সব্বাইর। অতসীর বয়স কত হল?

এই বাইশ তেইশ।

কি করছে?

সেকেণ্ড ইয়ার।

তারপর?

গ্রাজুয়েট।

তারপর।

হয় বেকার, নয় আশি টাকার মিসস্ট্রেস-এর বেশি কি আশা করা যেতে পারে?

কিছু নয়। এই কিছু নয়-এর সূচনাই চচ্ছে গাম বয়েল। রেবার ওপর অমিয় চটা থাকলেও মনে মনে ওকে অভিনন্দন জানায় এই পুরানো রোগটার নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করার জন্য।

বিনয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। পেট্রোম্যাক্সের আলো গেল কোথায়? এখন আর তো কথাবার্ত্তাও শোনা যাচ্ছে না বাইরে। সে পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে নাচাতে থাকে। ক্রমে তা বেড়ে চলে। এখন টেবিলটা উলটে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কি বিশ্রী শব্দ হচ্ছে মেজের তক্তাগুলোতে।

ওকিরে টেলিপ্রিণ্টার চালাচ্ছিস নাকি? কে জবাব দেবে? আসলে ঠিকানাই নেই। ঘুরে এসে জমা হবে ডেড-লেটার অফিসে। এখন পা দুটো একটু থামা দেখি। জিনিসপত্তরগুলো একটু গুছিয়ে রাখ। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। আজ একটা মাংসের রোস্ট হলে ভাল হত নাকি?

বিনয় কোন কথার উত্তর দেয় না। শুধু পা দু'খানার নাচুনি একটু কমায়।

অমিয় উঠে দাঁড়ায় চেয়ারটা একটু সরিয়ে। এবার ঘরটার এ মাথা ও-

মাথা ঘুরে আসে। সুমুখের বড় একটা জানালা খুলে দেয়। হুহু করে হাওয়া ঢোকে। হ্যারিকেনের আলোটা নেচে ওঠে।

কেন নাচছ ধন? নিবিয়ে দিচ্ছি। মরতে চাইছ! তোমাকে আর কষ্ট দেব না তিলে তিলে জালিয়ে রেখে। আমি পুরুষ হলেও পাষণ্ড নই। অন্তত তুমি তা জেনে রেখো।

অমিয় এগিয়ে গিয়ে আলোর কলটা একটু টিপে দেয়। কি আশ্চর্য তুমি দেখি মরতে চাইছ না। ভয় পেয়েছ বুঝি? তুমি আশ্রয় চাইছ নাকি সেলটার? তুমি যে আগুন। তোমাকে যে বিশ্বাস করতে পারছিনে।

কি বলছ, বিশ্বাস করতে হবে? অমিয় যেন উত্তরের আশায় কান পেতে থাকে।

কেন বিশ্বাস করতে হবে বল তো ভাই আগুন?

বিনয়ের পা দুটো থেমেছে।

অমিয়র এ অদ্ভুত অভিনয় তাকে আকৃষ্ট করেছে। বেশতো একা একা পাঠ বলে যাচ্ছে। এবার অমিয় প্রশ্ন করা মাত্র বিনয় জবাব দেবে বলে সংকল্প করে। সে আগুনের ভূমিকা নেবে বলে স্থির হয়ে বসে।

পর মুহূর্তেই অমিয় আবার প্রশ্ন করে তোমাকে বিশ্বাস করব কেন বলত ভাই আগুন। তোমার এমন কি গুণ আছে?

বিনয় বলে, আমি নইলে জগৎ বৃথা। যেমন রাত্রি নইলে দিন যেমন, পুরুষ নইলে নারী—যেমন গন্ধ নইলে ধূপ।

কিন্তু আর তো আগুন নিয়ে খেলতে সাহস হয় না।

কেন হয়না বন্ধু? আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি।

সহসা উত্তর দিতে পারে না অমিয়। সে একটু ইতস্তত করতে থাকে। বিনয় একটু অপেক্ষা করে। তারপর সে বলে যায় যত ভয়ই কর না কেন, এই আগুন নিয়েই সংসারের খেলা। এমনি চিরদিন চলে এসেছে, ভবিষ্যতেও চলবে। আমি মাঝে মাঝে ঘর পোড়াই, দগ্ধে পুড়িয়ে দিই রাজ্য, এই ভয়, হো হো করে হেসে ওঠে বিনয়।

এমন চমৎকার কো-এ্যাক্টিং! অমিয় ভাবে সত্যি সত্যি যেন জবাব দিচ্ছে প্রগলভা ঐ হ্যারিকেন শিখা। বিনয়কে আর লক্ষ করে না অমিয়। সে কথা বলে এক শাশ্বতী আলোর সঙ্গে। সুমুখের আলোটাই যেন তার প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ায়।—সে জবাব দেয়, না, না সেকথা নয় – সে কথা বন্ধু—

বিনয় জোর দিয়েই বলে, সেই কথাই তুমি ভাবছ। এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। তুমি মিছেমিছি ইতস্তত করছ।

এমন আর করব না।—অমিয় বলে, সত্যই তো তুমি ঘর জ্বালাও। আসার সময় ট্রেনের দু'পাশে দেখে এসেছি, কত কৃষান-জনপদ যে তুমি ধ্বংস করেছ! মানুষ নেই, গৃহপালিত একটি প্রাণীও নেই—না আছে কোন বেল তেঁতুলের গাছ। যেন পড়ে রয়েছে মহাশ্মশান।

কিন্তু সমস্ত মানুষ প্রাণী মরেনি। তারা আবার আমাকে চায়। নিত্যকার প্রয়োজনে আমি জ্বালাই দীপ, আমি যোগাই উত্তাপ। আমি নইলে ওরা বাঁচে না। তুমি কার্যকরণ দেখনা। তোমার সব জড়িয়ে বিচার করার ধৈর্য নেই।

বুঝলাম না।

বুঝিয়ে দিলেও মনে থাকবে না। আবার ভুলে যাবে, আবার করবে দোষারোপ। আমি সর্বনাশী নই। আমি কল্যাণী—আমি ধ্বংস নই, মঙ্গলময়ী—আমি চিরন্তনী শুভ। আমি আগুন নিয়ে কেবল খেলাই নয় গো। যারা ভাল খেলতে জানেনা তারা হয়ত সময় সময় পোড়ে। কার্যকারণ অনেক সময় আমার হাতেও থাকেনা। আমার ওপর রাগ না হয়ে, আমাকে এবার বাঁচাও। জানলাটা বন্ধ করে দাও। আমি আগুন হলেও লতা, তোমাকে আশ্রয় করে বাঁচতে চাই।

ভৃত্য চা নিয়ে এল। অভিনয় আর জমল না।

এত সিরিয়াস তুই হলি কি করে বিনয়? অমিয় হেসে ভেঙে পড়ে।

তোকে যে আমার বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছিল।

তা হলেই আগুন নিয়ে খেলা বেরিয়ে যেত।

তাই নাকি মাইরি? অতঃপর অমিয় যা করে এখানে উহ্য থাকাই শ্রেয়।

তুমি একটি রাসকেল। বিনয় পেয়ালা ফেলে রুমাল খোঁজে। সমস্ত মুখটা ভাল করে মুছে চা খেতে সুরু করে। বাঃ চা-টা তো চমৎকার হয়েছে।

অমিয় বলে লোকটা উপযুক্ত—সত্যই তুই যখন এর চেহারা দেখে ঠিক ঠাহর পেয়েছিলি, তোর চোখ আছে।

ছোটবেলা অনেক অভিনয় করেছি। সখের যাত্রা থিয়েটারের নাম শুনলে আমি হতেম পাগল। প্রথম দিনের পার্ট বলার করুণ অভিজ্ঞতার কথা শোন। বিনয় পেয়ালাটায় মুখ ডুবায়। মুখ তুলে দেখে অমিয় অন্যমনস্ক।

দেখছিল কাঁচের জানালাটা দিয়ে বাইরের দৃশ্যটা কেমন অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। চাঁদ উঠেছে কাল মেঘের অবগুণ্ঠন ঠেলে। স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কি যেন কি গাছের চূড়ায়। দেখ বিনয়, এমন দৃশ্য কতদিন যে দেখা হয়নি! আবার হাওয়া বইছে ভিজা ভিজা। চল একটু বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসি।

এই গরম কোটটা গায়ে দিয়ে নে।

দু'জনে বাইরে এসে বসে।

একটা পাখি শিষ টানে। পাহাড়ী পাখি। ওরা নাম জানে না। কিন্তু সচকিত হয়ে তাকায়। ঝাউগাছের ডালগুলো স্পষ্ট দেখা যায় রয়েছে ছড়িয়ে। যেমন থাকা উচিত। পাখিটা দেখা যাচ্ছে না।

আবার শিষ টানে বন্য পাখিটা।

প্রথম অভিনয় রজনীর বেদনাবিদ্ধ ইতিহাস বলতে ভুলে যায় বিনয়। সে-ও আনমনা হয়ে পড়ে।

কিছু সময় এমনি কেটে যায়। চাঁদ আরও একটু ওপরে ওঠে। কাল মেঘ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এবার জ্যোৎস্নায় শুভ্রতা আরও ঝরে একটু। মুঠো মুঠো ছড়িয়ে পড়ে স্বপ্নলীন দূর পাহাড়ের উঁচু শিখরের গায়ে ও ঝর্নার জলে।

কিন্তু এ দৃশ্যও অনেকক্ষণ ভাল লাগে না। যেমন ভাল লাগে না অতি তৃষ্ণার্তের কাছে সমুদ্রের অফুরন্ত জলরাশি।

এক সময় অমিয় জিজ্ঞাসা করে অতগুলো মেয়ে গেল কোথায়? আমাদের বাংলোটাতো খালি ছিল। ওরা যদি কোত্থেকে বেড়াতে এসে থাকে ভাড়া লাগত না এখানে উঠলে। বিনয় যেন নিজের মনেই নিজে ডুবে ছিল। হয়ত কোন বিগত বিস্মৃত স্মৃতি তাকে পীড়া দিচ্ছিল কিনা কে জানে, কিন্তু অমিয়, তা সঠিক বুঝতে পারে না। তবে সাধারণত বিনয় এমন চুপ করে বসে থাকার মত ছেলে নয়।

তুই কি কাউকে কোনদিন ভালবেসেছিস বিনয়।

ছোটবেলা আমাদের বড়রা যখন রিহার্সেল দিত আমি মুগ্ধ হয়ে তা শুনতাম।

নিশ্চয় রাজকন্যাকে তোর ভাল লাগত—অল্পবয়সী রাজকন্যা? কি কোন ব্যর্থ প্রেমিকার প্রেম নিবেদন? ট্র্যাজেডির ওপর মানুষের বোধহয় স্বাভাবিক একটা ঝোঁক আছে। নইলে মহাকাব্যগুলো এত মানুষকে মুগ্ধ করবে কেন।

বিনয় বলে, হবে হয়ত। তারপর আবার সে বাইরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বসে থাকে। বিফলে চাঁদ জ্যোৎস্না ছড়ায়। বিফলে যেন গন্ধ পাঠায় কুণ্ঠিতা রজনীগন্ধা। যাকে বিনয় কোন একদিন ভালবেসেছিল, তার কথা অমিয়কে শোনায় না। এমন একটি মধুর পরিবেশ একটি প্রেমের গল্প ব্যতীত যেন বিস্বাদ হয়ে ওঠে। রক্ত মাংসে বিনয়ের প্রেমিকা এখানে না আসুক—অন্তত আলাপ—আলোচনা কল্পনার মাধ্যমে তো জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত।

তবে তুইও ভালবেসেছিলি একদিন, কি বলিস বিনয়? মেয়েটির সঙ্গে

বোধহয় থিয়েটারের আসরে প্রথম সাক্ষাৎ? তোরা দুজনে কি এক সঙ্গে পার্ট বলে ছিলি? মেয়েটি কি সেজেছিল? নিশ্চয় তোকে মুগ্ধ করে রেখেছিল তার সাজ-সজ্জা বলার ভঙ্গিতে? অনেক সময় অনেকে নিজের পাঠ ভুলে যায়— তুইত তেমন ছেলে নস, ফিরে জবাব দে? সত্যিই তো সেদিন সব কিছু গুলিয়ে ফেলিসনি শ্রীমুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে?

একটা দমকা হাওয়া ঢেউ খেলে যায়?

সেদিনও বুঝি এমনি ভিজে হাওয়া ছিল, ছিল চাঁদের আলো—তাই বুঝি মনটা খারাপ হয়ে গেছে তোর? জীবনের প্রথম দিনটির অর্ঘ্য নিবেদন, প্রথম প্রেমের স্মৃতি কি ভোলা যায় কখনও? অমিয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে একটা। সে অবকাশ সৃষ্টি করে দেয় বিনয়কে সুখ স্মৃতি রোমন্থন করতে। আহা ও একটু একান্ত করে ভাবুক না। স্মরণ করে দেখুক না সেই আধ ফোটা কুঁড়ির মত মুখটি।

এমন বাচাল লোকটাও ভালবাসতে জানে! অথচ কোনদিন তা কারুর কাছে প্রকাশ করেনি। এমন যে অমিয়, সেও জানত না। আজ হঠাৎ কথায় কথায় বেরিয়ে পড়েছে, মেয়েরাতো বিনয়কে ভাই কিম্বা অমনি কোন আত্মীয় অভিভাবক ছাড়া মনেই করে না। একটা দুর্দান্ত রহস্যই বটে।

মেয়েটির কি নাম ছিলরে? অশোকলতা, না কিংশুকা সেন, না কাঠমল্লিকা দেবী? আধুনিকা যখন তখন বিনোদিনী সুবদনী নিশ্চয়ই নয়?

না। বিনয় একটু ঘুরে বসে বলে, তখন সবে স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। নাম শুনলাম মুকুন্দ গুপ্ত আর বিভারাণী। রিহার্সেল দিচ্ছে। একজন রিজিয়া আর একজন বীরেন্দ্র সিংহ। বড় মুগ্ধ হলাম। একটা পার্ট ভিক্ষা করলাম মুকুন্দদা···

তেড়ে এলেন বীরেন্দ্র সিংহ। তুই কি কক্ষনো স্টেজে উঠেছিস?

অমিয় বাধা দেয়, তা শুনতে চাইনে। দিল্লীশ্বরী কি বললেন? তার ওপর তো কারুর কথা চলবে না।

বললেন, মুকুন্দদা তুমি যখন ভাল বলতে পারছ না···

মধ্য থেকে অমিয় আবার বাধা দেয়; বলে, একটু দাঁড়া, আগে বল দিল্লীশ্বরী তোর দিকে কি ভাবে তাকালেন?

হুতুম পেঁচার মত—ফায়ার স্টোন টায়ারের মত, এখন হয়েছে? আর বিরক্ত করবি কক্ষনো? তোর সারা জীবনের ট্র্যাজেডি আমি শুনে যাচ্ছি, আর তোর ধৈর্য হল না আমার জীবনের একটা ট্র্যাজেডি শুনতে! ও মাই গুড গড!

না, বল মাইরি, এবার আমায় ক্ষমা কর—আমি আর বিরক্ত করব না।

এই কান মলা খাচ্ছি তোর সামনে।

দিল্লীশ্বরী আমার দিকে তাকালেন। কি নজরে চাইলেন তা আজ মনে নেই। এসব চুলচেরা বিচার করে দেখবার বয়সও তখন আমার নয়। কিন্তু বড় ভাল লাগল তার কথাগুলো।

মুকুন্দদা তুমি যখন ভাল করে বলতে পারছ না ওকে একবার ট্রায়েল দিয়ে দেখনা বীরেন্দ্র সিংহের পার্টটা।

মুকুন্দদা বললেন এদিকে এগিয়ে আয়।

আমি বুকটা চেপে এগিয়ে গেলাম। বড্ড ঢিব্ ঢিব্ করছিল কিনা! মুকুন্দদা আবডালে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং একটা চড় কসিয়ে দিলেন ঠাশ করে আমার গালে।

অমিয় ঝর্ ঝর্ করে বলে যেতে থাকে, নিশ্চয় তক্ষুণি দিল্লীর প্রাসাদ থেকে একটা দুটো করে মিনার খসে পড়তে লাগল। উল্টে গেল মাঝখানের গম্বুজটা। দিল্লীশ্বরীর হাঁকডাকে সাজল পদাতিক, ঘোড় সওয়ার···

আবার অমিয়?

না এই চুপ করলাম।

মুকুন্দদা বললেন, এসেছিস বীরেন্দ্র সিংহের পার্ট বলতে কিন্তু সামান্য একটা চড় খেয়ে ভিরমি দিয়ে পড়লি। ছে, তোকে দিয়ে কিছু হবে না।

তবে অন্য একটা পার্ট দিন। আমি চোখ মুছে বললাম, ওপার্ট আমার সইবে না।

এসব তোর মিছে কথা। নিশ্চয় অনেক কিছু লুকোচ্ছিস। রিজিয়া কিছুতেই চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। ঐতিহাসিক নাট্টকায় অন্তত তা বলে না। আমি আর কিছু শুনতে চাইনে।

অমিয় একটা সিগারেট ধরায়। একটু বিরক্ত হলেও কিশোর বিনয়কে নিয়ে এক স্বপ্ন সৌধের কল্পলোক তৈরী করে। সেখানে আর কেউ নেই— শুধু রিজিয়া ও বিনয়। সেদিনের বীরেন্দ্র সিংহ ও বিভারানী।

চাঁদ এগিয়ে চলে দূরাকাশে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে।

এগার

চাকর এসে খবর দেয় যে রান্না হয়েছে এখন না খেলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ওঠ, ওঠ চল বিনয়। বসে থাকলে আর দিল্লীশ্বরী অভিসারে আসবেন না। ওদিকে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তোর যত বাজে কথা। সব না জেনে একটা ধারনা!

দুজনে একটা টেবিলে মুখোমুখি খেতে বসে। আচ্ছাদনের অভাবে খবরের কাগজ হয়েছে টেবিল ক্লথ। সেই মাংসের রোস্টই চিবুচ্ছে অমিয়, কিন্তু কেমন আস্বাদ হয়েছে সে খেয়াল নেই।

আর রুটি লাগবে বাবু? একটু বেশী করে কি ঘি মাখিয়ে দেব?

তুইত সুন্দর বাংলা জানিস বেটা। এ' শিখলি কোথায়। অমিয় প্রশ্ন করে।

আমি বাঙালীরই ছেলে বাবু। আমার বাড়ি পূর্বস্থলী।

সত্যি! একেবারে দেখি দেহাতি বনে গেছিস। তা এদেশে কেন? বাঙলা দেশে কি একটা চাকুরি মিলত না?

চাকরটা অমিয়র মুখের দিকে তাকায়। একটা কি যেন জবাব তার জিভ পর্যন্ত এসেছিল অতিকষ্টে সে তা সামলিয়ে নেয়। হাতাটা দিয়ে একটু তরকারিগুলো নাড়ে।

কি রে? ভয় নেই—যা বলার তা ইতস্তত না করে বলে ফেল। আমরা রাগ করার মতো মানুষ না।

আবার সে দুজনার মুখের দিকে তাকায়। তারপর বলে, আপনারাও তো দার্জিলিং কালিম্পং না গিয়ে এখানে এসেছেন। সে একটু একটু হাসতে থাকে মুখ মচ্‌কে।

একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে অমিয়। জবাব না দিলে লজ্জার কথা হয়ে দাঁড়াবে-তাই সে বলে, আমরা'ত এসেছি স্বভাবে। উত্তরটা তার কানেই যেন কেমন বেখাপ্পা ঠেকে।

আর আমরা এসেছি বাবু অভাবে। যখন যেখানে থাকতে হয়, সেই দেশী হাব-ভাব চাল-চলন রপ্ত করে নিতে হয় নইলে ভাত মেলে না। এদেশে যারা বেড়াতে আসে তারা সহজে বাঙালী চাকর রাখতে চায় না। বাঙালী নাকি বাবু, আলসে।

তোকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।

যদি হাফ-সার্ট আর টেরি বাগানো দেখতেন, তবে হয়ত আপনারাও কিন্তু কিন্তু করতেন। দিন কাল যে কি পড়েছে!

ভারী তো পনের দিনের নক্‌রি।

বিনয়কে একটু ডাল ও চাটনি দিয়ে চাকর বলে, একদিনের কাজ মিলাতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয় পাড়াগাঁয়ে এত একসাথে পনরদিন। আপনাদের খেয়াল হলে কোন্ না ছ'মাস রয়ে গেলেন।

পাগল। আমরাও ত পরের গোলাম। আর বেশি কিছু অমিয় বলে না। বলতে তার আভিজাত্যে বাধে। কিন্তু মনে মনে একটা কেমন যেন অসহ্য সংঘাত অনুভব করে। ওদের চাকুরিতেও তো বোনাস নেই, পেন্সন নেই— প্রায় ওরই চাকরির সামিল। তবে একটু ধোপ দোরস্ত ফিটফাট এই যা তফাৎ। আর গাল ভরা খেতাবী—ম্যানেজার, স্টোর কিপার, ক্যাশিয়ার, সুপার ভাইজার ইত্যাদি। অমিয় একটু খাটো মনে করে নিজেকে। এতক্ষণ ওকে যেমন তুচ্ছ করেছিল, এখন আর তা করতে সাহস হয় না। মনটাই যেন সায় দেয় না।

তোমার নাম কি?

সুশীল বর্ধন।

একটু কি পড়াশুনা করেছিলে?

কিছু করেছি বইকি? আমি ভাল ইংরাজি বাঙলা লিখতে পারি। তবে কখনো স্কুলে পড়িনি। আমাকে কি একটা সুবিধা করে দিতে পারেন?

অস্বীকার করলে ছাড়বে না। তাই অমিয় বলে দেখব।

বিনয় কোন উচ্চবাচ্য করে না। সে উঠে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আসে। মন বোঝাই যেন তার চিন্তার নিবিড় মেঘ। একটা সিগারেট দে তো?

কি বললি, তুই সিগারেট চাইলি নাকি? আশ্চর্য! কোনোদিন যা না খাস তা আজ আমার সামনে কেমন করে ধরবি বলতো? এ বিদেশ বিভূঁয়ে এখন আমিই তোর লেজিটিমেট গার্ডিয়ান। নাও খাও। কিন্তু মনে রেখো দিল্লীশ্বরীই তোমাকে ডোবাচ্ছে। আমার কোন হাত নেই।

দু'জনে বসে বসে সিগারেট টানে। একজন অভ্যস্ত—আর একজন অনভ্যস্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলী আংটির মতো বৃত্তাকারে ওদের চারদিকে মেঘলোক সৃষ্টি করে। নিকোটিনের পিপাসা অমিয়র যতটা, বিনয়ের ততটা নয়। তবু যেন তার ভাল লাগে। সিগারেটের সৌগন্ধও তাকে কম মশগুল করে না।

অমিয় ভেবেছিল, সুশীল যখন চালাক চতুর, আর এখানের সব হাবভাব জানে, তখন ওর কাছে জিজ্ঞাসা করবে ঐ মেয়েদের কথা। কোন্ দিক দিয়ে এল, কোন্ দিক দিয়েই বা চলে গেল। কিছুই তো বোঝা গেল না। একদল স্কুলের মেয়েও হতে পারে—হতে পারে টুরিস্ট কিম্বা ভ্রাম্যমান অভিনেত্রী। অভিনেত্রী হলে সঙ্গে তো পুরুষ থাকবে। তা আদৌ ছিল কিনা তা তো ধৈয ধরে দেখা হয় নি। এবার বিনয়টারও তেমন উৎসাহ নেই। অথচ ওর তা থাকা উচিত ছিল এমনি একটা অপ্রতিশ্রুত প্রতিশ্রুতি নিয়েই এখানে আসা। কলকাতা বসেই সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা, গায় বয়েল যেন অদৃশ্য হাতে সুতো টানছে।

হারিয়ে দিতে চাইছে প্রতিযোগিতায়। ধিক্ ধিক্ শত ধিক্! ওদের পৌরুষ ও বীর্যের স্তম্ভ যেন ধূলায় লুটিয়ে পড়তে চায়। এরপর নিশ্চয় দেখতে হবে মাথাধরা—গাম বয়েল ইনফ্লুয়েঞ্জা এক সঙ্গেই হাসছে—কারণ ওরা উইন করেছে সুবর্ন ট্রফি, ফার্স্ট প্রাইজ!

বিনয়ের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অমিয় সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অর্ধ-দগ্ধ সিগারেটটা কাঠের মেঝের ওপর জ্বলতে থাকে।

সুশীল লেখাপড়া জানে না। ওর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা না করে ভালই করেছে।

বিনয় আমি শুতে চললাম। রাত প্রায় সাড়ে এগারটা। তোর ঘুম না ধরলে এখানে বসেই রাত জাগ। এইনে আর একটা সিগারেট। চেঞ্জে এসে আমি আরও দু' পাউণ্ড হালকা হয়ে যেতে রাজী নই। এখানে বসে থাকলে বিভারানী আজ আর শুতে ডাকবে না।

বীরেন্দ্র সিংহ কিছু বলে না।

অমিয় বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়তে কসরৎ করে। সকালবেলায় উঠতে হবে। বন্ধু-বান্ধব অফিস সিনেমা না থাকলেও অনেক তার করনীয় কাজ আছে। আলস্য কি অবহেলা করে মূল্যবান ছুটিটা সে নষ্ট করতে পারে না। এখানে দর্শনীয় কি কি আছে তা খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে। ফটো তুলতে হবে চমকপ্রদ কোনোকিছুর। অনেক মানুষ এসেছে এবং গেছে। তাদেরগুলো এড়িয়ে করতে হবে নূতন কিছু। নইলে কেউ গ্রাহ্যই করবে না—সম্মানও দেবে না। লক্ষ্যহীন এ্যাডভেঞ্চারের জন্য তার মন অধীর আবেগে কাঁপতে থাকে।

কিন্তু অলক্ষে বসে গামবয়েল ইনফ্লুয়েঞ্জা সুতো টানতে থাকে।

ঘুম আসেনা।

নৈশ স্তব্ধতার অভাব নেই—পৃথিবী প্রান্তর ও পর্বত এখন স্নিগ্ধ। মৃত্তিকা সরস। বেশ একটু শীতও রয়েছে। গাছের পাতায় এখনও জড়িয়ে রয়েছে বর্ষার জল। তবু ঘুম আসে না। একটু যেন পিপাসা বোধ হচ্ছে। জল খেলে কি এ তৃষ্ণা মিটবে? দেখাই যাক্ না খেয়ে! কিন্তু উঠতে যে ইচ্ছা করছে না। একটা সিগারেট ধরালে কেমন হয়?

তা-ও যেন ভাল লাগে না।

সর্বাঙ্গ যেন ধিকিধিকি জ্বলছে। এ জ্বলুনি আর কিছুর নয়—ওদের জব্দ করার স্পৃহা যতবার চুম্বকের কাঁটার মতো ঘুরিয়ে দিচ্ছে, এঠিক এসে আবার দাঁড়াচ্ছে উত্তর দক্ষিণে। কাঁটাটার মানুষের মতো যেন প্রাণ আছে।

শুধু তাই নয়, রয়েছে যেন জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা। অসূয়া ভাল নয়। কিন্তু ঠকে চুপ করে মুখ বুজে থাকাটাই কি ভাল?

লক্ষ্যহীন এ্যাডভেঞ্চার এবার সুতীক্ষ্ম নায়কের মতো সোজা পথে এসে দাঁড়ায়। অনুভা শিপ্রা রেবাই হচ্ছে অমিয় সুপরিকল্পিত লক্ষ্য। ওদের বক্ষ বিদীর্ণ করে যেতে হবে। এর জন্য তিনটিকে না পেলেও অন্তত দুটি মেয়ের প্রয়োজন। প্রবাসে নিতান্ত অপরিচিত স্থানে তা জুটবে কি করে? এবং জুটলেইত হবে না। সুন্দরী সুরুচিসম্পন্না তো হওয়া চাই। চলা ফেরায় থাকবে সপ্রতিভ ভঙ্গিমা। নাচতে গাইতে জানলে অমিয় স্বর্গ হাতে পায়, সে এক্সপোজার নেবে নানারকম। কিন্তু একটি সুন্দর মুদ্রারও তো সে নাম জানে না। জিজ্ঞাসা করলে সে কি উত্তর দেবে? তবে ফটো তুলেছে কি বুঝে?

অনুভা হাসবে, হিঃ হিঃ হিঃ।

রেবা চাপা গলায় মন্তব্য করবে, ওঁর টেস্ট অমনি জোলো, আমার সব জানা আছে, আর বলিস নে!

কি জানা আছে? একদিনও কি ও একা একা সঙ্গ দিয়েছে? প্রকাশ করেছে কোন সুগভীর কথা? শুধু হালকা হাসি, আলতো আসা। এর অতিরিক্ত ওরা হয়ত জানেও না। তবু ওদের জন্য এক দুর্দমনীয় দুর্বলতা।

ঘুম আসে না।

আলো জলছে কেন?...

সুশীল কি করছে? না'বিনয় জেগে?

অমিয় শয্যা ছেড়ে ওঠে। বীরেন্দ্র সিংহ নাক ডাকছে। তবে সুশীল-ই জেগে রয়েছে। অমিয় জল খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়। তার পায়ের শব্দ পেয়ে, আপনা থেকে আলোটা যেন কমে যায়। ওর মতলবটা কি? অনেক আধ্যাত্মিক কথা বলেছে। কিন্তু বিশ্বাস নেই। টাকা পয়সা যা কিছু সব ট্রাঙ্কে। সুটকেশে। এমন অপরিচিত স্থানে উলঙ্গ করে না ছেড়ে দেয়।

একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলতে হবে। অমিয় আবার চুপ করে শুয়ে পড়ে। জল একটু পরেই না হয় খাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত অমিয় এক রকম নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকে।

কোনো শব্দ নেই সাড়া নেই। বাইরে কেবল পোকা মাকড়ের ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে ডাক! বেশ একটা সুর আছে ঐক্যবদ্ধ। ছন্দ আছে প্রাকৃতিক। অমিয় কান পেতে থাকে।

সুশীল ফিকে হয়ে আসে।

যদি একটি মেয়ে গান গায় আর তখন তুলে নেওয়া যায় স্ন্যাপ ? চমৎকার হয়। কিন্তু সঙ্গীত সংগত ও গায়িকার একটি চরম সন্ধি মুহূর্ত হওয়া চাই। কিন্তু সে মুহূর্তটির সঙ্গে তো অমিয়র পরিচয় নেই। সে-ও তো অগভীর। শিপ্রা রেবা অম্বুভাকে আর মিছামিছি দোষারোপ করে লাভ কি ? অমিয় গ্র্যাজুয়েট। বিশ্ব-বিদ্যালয় ডিগ্রী দিয়েছে একটা মোটা। কিন্তু মানদণ্ডে তোলামাত্র দেখা যাচ্ছে সেও ফাঁপা। জানার মতো সে কি জানে ? অহঙ্কার করার মতো আর কি আছে ? সে-ও যুগধর্ম এড়াতে পারেনি। গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে। আর ওদের শুধু শুধু হেসে লাভ কি ?

আলোটা আবার একটু বাড়ল কেন ?

অমিয় নড়ে ওঠে।

আলস্য কাটিয়ে এই বুঝি সুশীল দিতে চলেছে দক্ষতার পরিচয়।

আবার আলোটা কমে যায় চট করে। মনে পড়ে আজকের রাতটার প্রথমদিকের কথা। তখন তাদের উচিত ছিল ঐ মেয়ে ক'টির খোঁজ নেওয়া। ডিটিকটিভ সাহেবের মত ওদের ফলো করলেই একটা হদিস পাওয়া অসম্ভব হত না।

কাঁটা নইলে কি কাঁটা তোলা যায় ?

কি অসুবিধা হচ্ছে বাবু ? একটু জল খাবেন ?

না, তুমি যে এত রাত্রি পর্যন্ত সজাগ ? রাগের চোটে অমিয় তৃষ্ণার কথা বলতে পারে না। কি করছিলে ?

কিচ্ছু না। তারপর সে কুণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, একটু কি পা টিপে দেব ?

না।

তবু সুশীল স্থান ত্যাগ করে না। সে অনুমানের উপর নির্ভর করে ঠিকই বুঝেছে যে বাবুর আকণ্ঠ পিপাসা। জল না পাওয়া পর্যন্ত এ তৃষ্ণা নিবারণ হচ্ছে না। মানুষের সেবা করে করে সুশীলের জন্মেছে এক অদ্ভুত মমতা। তাই আর্ত অমিয়র শিয়র সে ছেড়ে যেতে পারে না।

বাবু…

আঃ! তুমি কি ঘুমাতে দেবে না ?

একটু জল খেয়ে চোখে মুখে ঝাপটা দিয়ে শুয়ে পড়ুন -দেখবেন টুক্ করে ঘুমিয়ে পড়বেন। শরীরে শান্তি হবে।

তা হলেই তোমার পুরাদস্তুর সুবিধা নয়, কি বল ? আচ্ছা, তবে জল নিয়ে এস এক গ্লাস।

সুশীল একটু বিস্মিত হয়। কিন্তু কোন বাদ অনুবাদ বা প্রশ্ন করে না। সে জল নিয়ে আসে।

—এই নিন।

অমিয় গ্লাসটা একেবারে শূন্য করে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু ঘুম আসে না।

অমিয় রাত্রে তার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার স্থির করে, সকালবেলায় সুশীলকে বিদায় করে দিতে হবে। সাপ নিয়ে ঘর করা চলে না। এভাবে কি রোজ রাত-জাগা সম্ভব? ভোজবাজীর চাইতেও চমকপ্রদ মানুষের চরিত্র। কি ভাবা গিয়েছিল, কিন্তু কি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বারো

খুব সকালে আর ওঠা হয় না অমিয়র। পুঞ্জীভূত কাজের চাপেও তার ভোরবেলার তন্দ্রাটুকু ভাঙে না। ও ধড়মড় করে উঠে বসে যখন রোদ এসে পড়ে ওর মশারীর গায়। অন্যদিনের তুলনায় তীক্ষ্ণতা একটু কম তবু পশ্চিম অঞ্চলের আভাস পাওয়া যায়। বেলা বেড়ে গেলে আর তো কোনো কাজ করা যাবে না।

সুশীল চা?

এই যে নিন।

গরম আছে তো?

ধোঁয়া উড়ছে। সুশীল কিছু বলে না। 'পুরাতন ভৃত্যের' মত দাঁড়িয়ে থাকে।

তোয়ালে পেস্ট টুথব্রাস?

সুশীল স্যাণ্ডেল জোড়া এগিয়ে দেয়। সুমুখের টিপয়ের ওপর রাখে দেশলাই ও সিগারেটের টিনটা গুছিয়ে। তারপর মশারীটা তোলে ধীরে ধীরে।

বিনয়টা কোথায়?

তিনি তো ঘণ্টা খানেক আগে বেরিয়েছেন।

বলিস কি! একা একা—ফাঁকি দিয়ে? অমিয়র মনে জাহাজের হেড লাইটের মত সোজা বাঁকা তেরছা হয়ে পড়ে।

না তিনি অনেক অপেক্ষা করেছেন জামাকাপড় পরে। আমিই ডাকতে নিষেধ করেছি আপনাকে। রাতটা তো আপনার ভাল কাটেনি।

কে বলল? দুদিন তোমার কাটল না এখানে, হাড়িতে কালি পড়ল

না—এর মধ্যেই এত স্বাধীনতা !

প্রত্যক্ষ সত্য—তাকে যদি কেউ এভাবে অস্বীকার করে, তবে তার বিরুদ্ধে কিবা বলা চলে ? সুশীল মাথা নত করে থাকে।

এর মজা তোমাকে আমি এক্ষুনি দেখাতাম—বিনয়টা নেই কি বলি ? তোমার একটা বিহিত করার জন্যই বিনয়কে দরকার ছিল—বুঝলে ?

আমাকে কি তুলে দেবেন ?

না—মাথায় করে পূজা করব। দেখি তোয়ালে পেস্ট।

সব গোছান রয়েছে বাথরুমে।

ঠাট্টা করছ নাকি ? অমিয় বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়।

দেশলাই সিগারেট নিলেন না ? এই যে।

যখন এখানে এসে এই বাংলোটায় দুই বন্ধুতে ঢুকেছে, তখন ডাস্টবিনের মত ছিল বাথরুমটা। একদিন বাদে আসে সুশীল। গত রাত্রে সে সমস্ত জঞ্জাল হটিয়েছে। দুটো টব ভর্তি কাকচক্ষু জল। এতটুকুও কোথাও ময়লার চিহ্ন নেই। সাবান, তোয়ালে, তেলের শিশি যেখানে যা রাখা উচিত—সব পরিপাটি করে গোছান।

এ অঞ্চলে এখন রাত্রে একটু শীত পড়লেও, দিনে প্রচণ্ড রোদ্দুর। গেরুয়া ধুলোর লু ওড়ে মাঝে মাঝে। বসন্তকালে এখানে দেখা যায় বৈশাখের খর রুদ্ররূপ। টসটসিয়ে ঘাম ঝরে না—কিন্তু চামড়া ঝল্‌সে যেতে চায়।

স্নান সেরে অমিয় ঘরে ঢুকে গম্ভীরভাবে চারিদিকে তাকায়। একটি জিনিসও এদিক ওদিক পড়ে নেই। সব গোছগাছ পরিপাটি। অ্যাসট্রেটা যথাস্থানে রক্ষিত। বহুকাল আগে কোন ভাড়াটে যেন একখানা ক্যালেণ্ডার ফেলে গেছে। ছবিটি দিগন্তবিসারী সমুদ্রের। সেখানাকে দৃষ্টিপথে এনে সুশীল টাঙিয়ে তার সুরুচিরই পরিচয় দিয়েছে। অমিয় ইতস্তত করতে থাকে কোথায় রাখবে তার হাতের জিনিসগুলো। আবার বেখাপ্পা না দেখায়।

অমিয় সারাজীবনে এমন শৃঙ্খলার সঙ্গে কখনও মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি। তাই সে বেশ কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে। লজ্জা হয় সুশীলের মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে।

অমিয়র হাত থেকে জিনিসগুলো নিয়ে সুশীল জায়গা মত রাখে। সার্ট প্যাণ্ট জুতা-মোজা প্রয়োজন মত এনে দেয়। একখানা ট্রেতে করে নিয়ে আসে সকালের খাবার।

এত !

বেশী হবে না। পাহাড়ী দেশ দু'কদম চক্কোর দিয়ে এলেই দাউ দাউ

করে জলে যাবে।

একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্বকরে অমিয় যায়। হয়তো অন্য কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করে খানিক। বিনয় না হলেও অনেকটা ডানাভাঙা পাখির সামিল। সুশীল আদেশের জন্য অপেক্ষা করে। রিস্টওয়াচটা পরে, ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে বেরিয়ে যায়। গেটের কাছে গিয়ে আবার ফিরে আসে। সুশীল, সুশীল।

সুমুখের দরজাটা বন্ধ করেছিল সুশীল। সে ডাক শুনে দোর খুলে নিকটে আসে কি বলছেন?

বলতে পার বিনয়টা গেছে কোন্ পথে?

এই পাশের গলিটা ধরে।

তাই নাকি? অমিয় মনে মনে বলে সর্বনাশ! সে ছুটে ঢালু পথ ধরে নিচে নামে। গতরাত্রে এই পথটাই না উজ্জ্বল হয়েছিল হাস্তে-লাস্তে এই পথেই না ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয়েছে পেট্রোম্যাক্সের আলো?

তুমি ঘরে থেকে আমারা না ফেরা পর্যন্ত।

সুশীল চেঁচিয়ে জবাব দেয়, আচ্ছা—একটু সাবধান হয়ে চলবেন। জুতা হড়কে যেতে পারে। তারপর সে শংকিতচিত্তে চেয়ে থাকে। বুঝতেই পারে না এত তাড়াহুড়ার প্রয়োজন কি?

গলিটা ক্রমে চওড়া হয়ে গেছে। এক নিশ্বাসে খানিকটা নেমে এসে অমিয় একটা সমতল জায়গায় এসে দাঁড়ায়। দু'দিকে কয়েকটা কালো পাথর যেন পিরামিডের খেলনা সংস্করণ। আশে-পাশে তেমন গাছপালা নেই। মাত্র দু'চারটা জংলা ঝাড়। দু'চারটি পাহাড়ী তৃণগুল্ম। এর মধ্যেই যেন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। দূরে দূরে এক আধখানা অসমতল শস্যক্ষেত্র। বোঝা যায় না কি ফসল বোনা হয়েছে।

বাঙলা দেশের মত ঠাশ-বুননি বসতি নেই, যদিও এটা শহর।

অমিয় চারিদিকে তাকায় আর ফুঁসে ফুঁসে ওঠে।

এখন কে গাইডের কাজ করে? রেল তাড়া দিয়ে তবে কেন নিয়ে এসেছিল বিনয়কে সঙ্গে? একটা ফ্রেণ্ড, বেইমান।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্বললে আর কাজের কাজ কিছু হবে না—অগত্যা অমিয় এগিয়ে চলে। আবার ঢালুপথ। অনেকটা নামতে হয় গেরিলা সৈন্যের মত ক্যামেরাটা নিয়ে। এবার একটা ছোট রেস্তোরাঁ দেখা যায় একটা গাছের নিচে। ভাঙা ময়লা কাপ—ডিসগুলো হাঁ করে রয়েছে।

দাঁড়া বেটা বীরেন্দ্রসিংহ। তুই ভেবেছিস অমিয় বুঝি অক্ষম? পরের মুখে ছাড়া সে বুঝি ঝাল খেতে জানে না? একটা গাইড জোগাড় হোক আগে

একেবারে ছাল ছাড়িয়ে নেবো সরেজমিনে ধরতে পারলে।

নাট্যকার দেখিয়েছেন কি অপূর্ব সংযম—আহা গর্ব করতে ইচ্ছা করে—আর বিনয়টা দেখাচ্ছে কি, ছি ছি! শিক্ষিত মানুষের কেন থাকবে এত হ্যাংলামি?

অমিয়কে দেখে তার চারপাশে কয়েকটি উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে এসে দাঁড়ায়। হয়ত রেস্তোরাঁর কর্তা কিংবা অধিকর্তার প্রডাক্সন্। অমিয় মুখ বাঁকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে একটা ইঞ্জিনের মত।

ওরা গ্রাহ্য না করে হাতে তালি দিয়ে হাসে। এমন ভাষায় এমন সব কথা বলাবলি করে যে অমিয় বোকা বনে থাকে। কিন্তু একেবারে মূর্খ বনে থাকাইবা কি রকম? ও আবার হাসে নিরর্থক হাসি।

অমনি ছেলে মেয়েরা হাততালি দেয় পূর্বের মত।

আচমকা একটিতে পয়সা চায় হাত বাড়িয়ে। অমিয় খুচরা বার করে। উজ্জ্বল আলোতে চক্‌চক্ করে ওঠে সিকি দু'আনা গুলো। আর কি রেহাই আছে! অনেকগুলো কচি হাত এগিয়ে আসে সুমুখে। অমিয় সকলেরই চাহিদা পূর্ণ করে।

একখানা মোটা লাঠি নিয়ে ছুটে আসে রেস্তোরাঁর মালিক। মাথায় একটা বড় পাগড়ি। মনে হয় মুরেঠা সর্বস্ব জীব। ওরা চতুর পঙ্গপালের মত অদৃশ্য হয়ে যায়। শালা লোকখদ্দের ভাগাচ্ছে।

তবে ও-ও কি ওৎপেতে ছিল খদ্দেরের আশায়।

অমিয় একটু ভাবে—তারপর স্বেচ্ছারই পা বাড়িয়ে দেয় সুমুখে। দেখা যাক্ কে বড় ওস্তাদ!

অমিয় আপটু-ডেট আর ও মান্ধাতার আমলের শিকারী।

আইয়ে হুজুর। চা, সিগ্রেট, বেলাক্—কেট্‌কা টিন সব আছে।

চৌকাঠে ঠোক্কর খেতে খেতে কোন প্রকারে মাথাটাকে বাঁচিয়ে নেয় অমিয়। প্রথমই তো সে ঘায়েল হয়ে যাচ্ছিল! সে আর ভিতরে ঢোকে না। বাইরে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষাকরাই শ্রেয় মনে করে।

রেস্তোরাঁর মালিকের একখানা হাত পঙ্গু। ভালখানা দিয়ে সে পাগড়িটাকে সামলায়। পরিষ্কার করতে থাকে কাপ ডিসগুলো ঐ অংগুলি খৈনি টেপা হাতে। মুখে ছোটে কথার ইলেকট্রিক ইঞ্জিন। ভ্রাম্যমান যত লাট বেলাট এ পথ ধরে যায়, কেউই অগ্রাহ্য করতে পারে না এই দিলরুবা কেবিনকে। চা-কি টোস্ট না খেলেও সিগারেট কিনতে হবে এখান থেকে। এ অঞ্চলের পয়লা নম্বর বেলাককেটেরও নাকি সোল এজেন্ট। না, না হামি নই হুজুর—সোল এজেন্ট

মেরি দিলরুবা কেবিন।

একখানি চেয়ার এনে বাইরে বসতে দেয় অমিয়কে। একটু হাওয়ামে খোস মেজাজে বৈঠিয়ে হুজুর। চা আউর টোস্ট? ডব্বল কাপ না হাফ? চা-তে দেখে লিবেন বাগানকা তাজা পাত্তিকা খোসবু।

অমিয় চুপ করে ওর কথা শোনে।

একটা কাক এসে বসে মগডালে। ঠিক অমিয়র মাথার ওপর। কেবিনের মালিক হাঁক ছাড়ে। অমনি সেই পঙ্গপাল সিপাহীরা দল এসে হাজির হয় এ কাক তো ছার,স্বয়ং ভূগণ্ডীকেও উড়ে পালাতে হত-এমনিই ঢিলের বুলেট চলে।

হামি কে? দিলরুবা কো নোকার—মেরি দিলরুবা আপনাকে জরা চা খিলাতে চাচ্ছে। আউর তুটি টোস্ট। হুকুম করুন সরকার।

কি অদ্ভুত ভঙ্গি! লোকটা সত্যি কথার যাদুকর।

তোমার নাম কি?

গোলামের এমন একটা কি নাম থাকতে পারে!

তবু,—বলোনা, শুনতে ইচ্ছা করছে।

বিজেন্দ্র প্রসাদ। ওরফে মহু মাহাতো।

ঘর?

মুঙ্গের।

কতদিন ধরে দেশ ছাড়া?

প্রায় বিশ বছর। ঐ গৌরী কা উমের।

দু'খানি সুডৌল হাত চা তৈরী করতে ব্যস্ত। কেবিনের অন্তরালে মুখখানি ঢাকা পড়েছে। তবু বর্ন ও নৈপুণ্য স্পষ্ট দেখা যায় হাত দু'খানার স্বাস্থ্যসম্মত যা কিছু করার তাতে ক্রটি করেনা।

একখানা এবড়ো-খেবড়ো টুল আসে। কিন্তু তার ওপর শালপাতার নক্সি ঢাকনি। চা ও টোস্ট একটি ছেলের হাত ধুইয়ে পাঠিয়ে দেয় গৌরী, সে অন্তরালে বসেই তত্ত্বধান করে। পাঠিয়ে দেয় ব্ল্যাক-ক্যাট সিগারেট।

রূপ, দক্ষতা, স্বাস্থ্য সহিষ্ণুতা সবই এদের আছে; শুধু নেই দিলরুবা কেবিনের আব্রু। দু'খানা ভাল ত্রিপল ও জোটেনা। ভাবতে ভাবতে অমিয় চায়ের পেয়ালাটা মুখের কাছে তোলে।

অনেকগুলি কচি চোখ লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

ভাগ ভাগ শালালোক ইধার সে।

না, না ওরা থাকুক। আরো সাত কাপ-চাও সাতটা ডবল টোস্ট দাও। ওরা অনেক কৌয়া ভাগিয়েছে।

তারপর অনেক কথাবার্তা হয়। বেলা হয় অনেকটা। বক্‌শিসের লোভে গৌরীকেই গাইড করে দিতে চায় মাহাতো। কিন্তু এখন তো কোথাও যাওয়া সম্ভব না। তাই এবেলার জন্য স্থগিত এমন অভিযানটা—

ওতো আমাদের বাড়ির মেয়েদের মত চালাক, কি বল মাহাতো?

জী হুজুর, ওর জনম কাটল এখানে। মাহাতো সগর্বে মেয়ের দিকে তাকায় সেলাম হুজুর।

পঙ্গপালের দলও হাত তোলে বিজেন্দ্র প্রসাদকে অনুকরণ করে।

তের

বিভারানীর সঙ্গে বিনয়ের কোন ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। অমিয়র অনুমান মিথ্যা। সেদিনের রিজিয়াকে কাল বিনয়ের মনে পড়েছিল এক আকস্মিক স্মৃতির ছায়াপাত হবে বলে। বহুদিন ধরে বিনয় ভুলেছিল—ঠেলে রেখেছিল অনেক দূরে সে বেদনা ঘন মর্মান্তিক ইতিকথা।

রিজিয়া নয়—এক পূর্ণ যুবতী চণ্ডালিনীর সে স্পর্শ করেছিল ওষ্ঠ।

তখন পর্যন্ত বিনয়ের বাবা বিশ্বনাথ পেন্সন পাননি। পশ্চিমের কোন এক শহরে যেন চাকরি করতেন। কলকাতার মেসে থেকে পড়ত বিনয় আই এ। বিনয় ছুটিতে বাবার কাছে চলেছে। অল্প বয়স চেহারাটা একেবারে ঢল ঢল করছে। যাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে শুনছে ওর কথা। এমন সময় মাঝখানে এক স্টেশনে ইঞ্জিন আর চলেনা। লাইন ক্লিয়ার নেই সে এক বিভ্রাট!

মনে কত আনন্দ—ভাই বোনদের জন্য বেলুন, লুডো, থেকে ফক্স টেইল শাড়ি পর্যন্ত কিনে নিয়েছে। দেখাচ্ছে দু'চারজন তরুন তরুনী যাত্রীকে। দেখুন কেমন হল?

একটি মেয়ে চাপা গলায় জবাব দিল, ভেরি আর্টিস্টিক, ঐটেই একেবারে আপটুডেট ফ্যাসান। আই এ্যাডমায়ার ইউ। আপনার বোনের জন্য কিনেছেন তো?

হ্যাঁ।

ঠিক সেই সময় ব্রেক কষল গাড়ী। চলতি মুখে যা হোক এক রকম ছিল, এখন যেন গুমোট গরম মোচর দিয়ে উঠেছে বগিগুলোর ভিতর দিয়ে। কোম্পানীর ফ্যানে বরঞ্চ তাপমান বাড়াচ্ছে।

অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে যাত্রীরা। যে যার কামরা ছেড়ে নেমে পড়তে চায়। কিন্তু সকলের পক্ষে নামা অসম্ভব। যেমন বয়স এবং স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রশ্ন

আছে, তেমনি প্রশ্ন আছে সঙ্গের জিনিসপত্রের। ওদিকে আবার সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আগুন গোলান একটা ভাব দেখা যাচ্ছে পশ্চিমা-সূর্যের। ওর পিছনে হয়ত লুকিয়ে আছে ধূলি ঝঞ্ঝার শঙ্কা।

তবু যুবকেরা বেরিয়ে পড়ে। বিনয় ও তাদের সঙ্গী হয়। ফক্সটেইল-শাড়ি এবং সঙ্গের বাকি জিনিসগুলো জিম্মা করে দিয়ে যায় সেই মন্তব্য-কারিনী মেয়েটির মার কাছে। এইগুলো একটু দেখবেন। আমি জেনে আসি ব্যাপারটা কি হল?

আচ্ছা যাও বাবা। এই ঘটিটা নিয়ে যাবে? আসার সময় একঘটি জল নিয়ে এসো। ওর বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

মেয়েটি মাকে একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করে-ধেৎ।

বিনয় দেখে ফেলে। তা হয়েছে কি, এনে দিচ্ছি জল।

ট্রেন থেকে নেমে একটু এগিয়ে গিয়ে বিনয় যা শোনে তাতে চক্ষুস্থির। গাড়ি নাকি পাঁচ ছয় ঘণ্টা লেট হবে। একটা পুলের নাকি থাম বিগড়ে গেছে। ওপরে স্পেশাল গাড়ী আসবে, এপারের মেইল ট্রেন এগুবে, তারপর যাত্রীদের পারাপার তারপর আবার গাড়ী ছাড়ার বন্দোবস্ত। প্রায় রাতটাই এখানে নাকি কেটে যাবে।

সত্যি গার্ডসাহেব?

সিগনালের আলোটা নামিয়ে রেখে গার্ডসাহেব একটা বর্মক চুরুট ধরায় আর আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে কি লাভ? আমি তো সাহেব নই গোলাম। শ্বেত প্রভুরা যাওয়ার আগে এমন বিদ্যা কালা কর্তাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন যে আমরা জ্বলে পুড়ে মরলাম।

অর্থাৎ? আপনার জব্বি উর্দ্দি, জব্বি-ফ্লাগ, লাইট ও হুইসেল দেখে তো তা মনে হয় না।

খুলে দিচ্ছি, একবার আজকের রাতটা পরুন—ঝক্কি ঝামেলা সামলান, তখন বুঝবেন।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলে, কয়েকটা দিন আগের কথা ভাবুন-রাজা ছিলেন চোর, তার কোম্পানীর কি হবে সাধু? পায়রার ডিমে রাজ হাঁস? এ হয় না।

একটু ব্যাখ্যা করে বলুন মশাই। বললেনই যখন চোরের কথা মেড-ইজি করে বলবেন না। আমরা একালের ছাত্তর নই।

ভিড়ের মধ্যে থেকেই উত্তর হয়। এত যখন আপনাদের শোনার ও শেখার ইচ্ছা, তা হলে অংকের মত বোঝাচ্ছি। মনে করুন সামনে ব্ল্যাকবোর্ড

রয়েছে। এখন লিখুন কোম্পানীর মোটা মাইনের অফিসার চোর, কারণ সে চোরের সঙ্গে ঘর করে কনট্রাক্ট দিচ্ছে তারপর ধাপে ধাপে কুলি মজদুরের সর্দার পর্যন্ত চুরি নেবে আসছে। সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগা মানে একটার সঙ্গে আর একটার প্লাস। এই চেইন বাঁধা প্লাসের রেজাল্ট দেখুন—দাঁড়াও একটু টোটাল দিয়ে দেখাই। রেজাল্ট দাঁড়াচ্ছে একেবারে মাইনাস। তাই ইঁট কংক্রিটের গাঁথা নতুন থাম আজ নড়বড়ে—ঐ যে বললাম এ্যাকটিভ রেজাল্ট জিরো।

এ্যালজাব্রা তো সে কথা বলে না। কি বলেন মশাই?

আপনারা কি আজো রইতে চাচ্ছেন মান্ধাতার আমলের নীতি আগলে?

আপনাদের জন্য দুঃখ হয়-সহানুভূতিও হয় খুবই। একটু চোখ মেলে দেখুন সবই গেছে উল্টে। কয়লাওয়ালা ওজন দেব না, রেশন ওয়ালা মাপে দেবে কম। ছেলে কমিশন চার্জ করছে বাজারের, ডাক্তার প্রায় মোক্তার কে হার মানাতে বসেছে মিথ্যা কথার দৌড়ে। মাস্টার পড়াবে না, ছাত্তর শিখবে না—স্কুল কলেজ হয়ে দাঁড়িয়েছে স্রেফ মুনাফা লোটা ফ্যাক্টরী। এমন কি আর বুড়ো অ্যালজাব্রাও লোভ সামলে চুপচাপ থাকতে পারে? স্বধর্ম ছেড়ে সেও প্লাসের ঘরেই করছে দিনে রাহাজানী—বিলকুল মাইনাস, দিল্লী, ঢাকা করাচী।

যারা তির্যক অর্থটা বোঝে তারা হাসে—যারা বোঝেনা তারা বুঝতে প্রয়াস পায়। বিনয় চলে আসে। একটা নেড়া স্টেশন প্ল্যাটফর্মের ওপর টাকের মত দেখাচ্ছে ছোট্ট সাদা সেডটা চারিদিকে তৃণ-গুল্ম বর্জিত ধূসর প্রান্তর। অন্ধকারে এখনো যেন ভরাট হয়নি ফাঁকা।

স্টেশন সেড কোথায়? বিনয় খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে চলে কিছুটা এগিয়ে আসতেই তার কানে বাজনার ঐক্যতান প্রবেশ করে। বেশ মধুর তো। রুক্ষ দগ্ধ প্রান্তরে একি অপূর্ব আস্বাদ! স্থানীয় খঞ্জনী ঢোলকের বাদ্য-নয়। হারমনিয়ম ও বাঁশীর শব্দ। বাজাচ্ছে একটা বাঙলা গানের গৎ।

সংগত চলছে বোধহয় কোনো সৌখিন অভিনয়ের।

যাক্ রাতটা কাটাবার একটা রাস্তা হল।

কিন্তু একি অসহ্য গরম? ঘাম নেই, কেবল প্রদাহ। আকাশে কি মেঘ করেছে?

পোড়া কয়লার একটা সরু সুরঙ্গ পথ। দক্ষিণে বাঁক ঘুরে গেছে। সেই পথ ধরেই সকর্মা নিষ্কর্মা যাত্রীরা এগিয়ে চলেছে এই গ্রীষ্মের ভিতর। সকলের আকর্ষণ ঐ. সঙ্গত পথের বাঁকে। বেশ যথেষ্ট চাপ। একটু ঠেলাঠেলি

করেই এগুতে হয় বিনয়কে। অথচ হুসিয়ার ও থাকতে হয়—কারণ এটা সিনেমা শোর কাউণ্টার নয়। মেঘের কথা সে ভুলে যায়।

বিনয় বাঁক ঘোরে।

উজ্জ্বল ডেলাইটের আলোতে দূর থেকে ছবির মত দেখাচ্ছে একখানা লাল শালু। সাদা তুলায় লেখা, চণ্ডালিনী গীতি নাট্য। প্রযোজনায়, কিশলয় কোম্পানী।

একেবারে দেখি সিনেমার বিজ্ঞপ্তি। এরপর এগিয়ে গিয়ে ফুল হাউস না দেখতে হয়! উৎসুক মানুষের অভাব হয়নি এহেন দগ্ধ তামাটে রাজ্যেও।

আর একটু এগিয়ে যায় বিনয়। না-ফুল হাউস নয়। কিন্তু একটা মাঠ ভরে গেছে মাথায় মাথায়। সিংভূম কি মানভূম জেলার অন্তর্গত এ স্থানটা। একটা ফুল সাইজ ক্যামেরা নেই। থাকলে, তিন কপি ফটো তুলে পাঠিয়ে দেওয়া যেত। দিল্লী বাংলা ও বিহারের লোক সভায়।

একি রবীন্দ্রনাথের রচনা? ঠিক স্মরণ করতে পারে না বিনয়। তবু যত্ন করে মগজ টাকে খাটায় অদ্ভুত রকম। মনে পড়ে না কিছুই। কিন্তু সেতো অন্ধ নয়। তার অনেক আগেই দেখা উচিত ছিল, নানা স্থানে লিখে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে—নাট্যকার অধ্যাপক আনন্দ পাকড়াশী।

এক এক সময় কনসার্ট এমন হয়ে ওঠে যে এই বুঝি পর্দা উঠবে কিন্তু যবনিকা ওঠে না। দর্শকরা অসহিষ্ণু হয়ে গোলমাল আরম্ভ করে। বিনয় ঘটি হাতে সুমখে এগিয়ে যেতে চায়। সে ভুলে গেছে তৃষ্ণার্ত মেয়েটির কথা চণ্ডালিনীই এখন তার প্রধান আকর্ষণ।

আবার একটা হৈ চৈ হট্টগোল সুরু হয় কিছু সময় বাদে। শুধু মুখে নয়, ছুটো একটা লোষ্ট্রের আকারে। অমনি দশটা চোঙা মুখে কিশলয় কোম্পানী গর্জে ওঠে, শুনুন মশাইরা এটা কিন্তু বাঙলা দেশ নয়, এখনো বিদেশ যাকে বলে প্রবাস। একটু ভব্য-সভ্য হয়ে চলুন।

প্যাসেঞ্জাররা ক্ষেপে ওঠে, কাকে কটাক্ষ করছেন আপনারা? জিজ্ঞেস করি কাদের কে?

যাঁরা কুলবধূ, সবে শ্বশুর বাড়ি এসেছেন। বাপের বাড়ী ফিরে গিয়ে না হয় গায়ের আঁচল ফেলে যতদূর ইচ্ছা হট্টগোল করবেন। এখন বসে পড়ুন চণ্ডালিনী আসছেন।

যাত্রীদের তরফ থেকে গুরুতর আক্ষেপ ফেটে পড়ত—কিন্তু অকস্মাৎ লাইটটা নিবে গেল। শোনা গেল হারমনিয়ম যে বাজায় সে নাকি মূর্চ্ছা গেছে। তার নাকি ফিটের ব্যামো আছে।

সবে চণ্ডালিনীর একটু একটু নূপুর ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল—এমন সময় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।

এবার দশটা চোঙা যেন কেঁদে ওঠে, বন্ধুগণ আপনারা আমাদের ভাষা আন্দোলনে তেমন সাহায্য করতে পারেন নি, দুঃখ নেই। টুসুর গানের সময়ও যে প্রায় চুপচাপ ছিলেন তার জন্য জেদ করছিনে। আজ সখেদে অনুরোধ করছি যে এই চণ্ডালিনী গীতিনাট্যে এসে যোগ দিন।

বিনয় ভাবে, কিভাবে যোগ দেবে? মেইলের যাত্রীরা কি আসরে উঠে নাচবে? সে ঘটিটা নিয়েই এগিয়ে চলে ভিড় সরিয়ে। অন্ধকারে কি এগুনো যায়! তবু কি যেন দুর্জ্ঞেয় টানে সে ঠেলে সুমুখে এগিয়ে চলে।

হয়ত কোম্পানীর জেনারেল আর কোনো নির্দেশ দিচ্ছিল না, তাই থেমে ছিল চোঙাগুলো আবার পূর্বের সুরে আরম্ভ করে, যদি কেউ বঙ্কিমের, রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকেন, তবে আজ প্রবাসী ভাইদের মুখ রক্ষা করুন। যে কেউ খুশি এসে একটু হারমনিয়মটা ধরুন। পূর্ব পুরুষ পরিশ্রমে মূর্চ্ছিত।

বিনয় অনুমানের ওপর নির্ভর করে আসরের দিকে হেঁটে চলে। কোনো-খানে একটু হাওয়া নেই। মানুষগুলো যেন অস্থির হয়ে পড়েছে। তবু ভিড় ভাঙার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

আবার চোঙা দশটা করুণ স্বরে মিনতি জানায়, একোনো ভাষাভুক্তির আন্দোলন নয়, পুলিশ আপনাদের নাজেহাল করবে না। এ নিতান্তই আর্ট ফর আর্টস সেক দরদী শিল্পী কেউ থাকলে এগিয়ে আসুন।

একটা লোকও সাড়া দিচ্ছে না—বিনয় বিস্মিত হয়ে যায় এ অমানুষিক ব্যবহারে। সে ভাল বাজাতে জানে না। তবু সে সহানুভূতিতে অধীর হয়ে ওঠে।

চোঙা শিল্পীরা এবার একটু নরমে গরমে মিসিয়ে সুর ধরে, এরপর আপনারা কেউ যদি হাত বাড়িয়ে না দেন, তবে জানবেন এক মাঘে শীত যায় না। আমরা কেউ আর বাংলা বই ধরব না—উড়িয়া নাটক রিহারসেল দেব। ফলে আমরা বাধ্য হয়ে দেশের কালচার ভুলে যাব। যদি বধূ আসে বাঙালী, তার সঙ্গেও প্রেমগুঞ্জন চলবে উড়িয়াতেই। স্মরণ রাখবেন আপনারা উদ্বাস্তু। মেয়ে দিতে হবে যাদের ঘরদুয়ার পোক্ত—হোক না তারা প্রবাসী।

যে এই ঘোষনার নির্দেশ দিচ্ছে সে নিশ্চয়ই ঝানু লোক। হয়ত অধ্যাপক পাকড়াশী স্বয়ং। বিনয় আসরে ঢুকে পড়ে। কই হারমনিয়ামটা দিন তো।

এবার একটা তুমুল আনন্দ সংবাদ ঘোষণা হয় চোঙা শিল্প মারফৎ—

পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে, সার্থক হয়েছে আমাদের আবেদন। লাইট জ্বলল বলে আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন।

কৃষ্টির ধারক ও বাহক মানুষেরা আর আলো ধরতে পারে না। মেঘের মিনারে একটা প্রচণ্ড ডে-লাইট যেন জ্বলে উঠে ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হুহু হাওয়া জীর্ণ বস্ত্রের মত উড়ে যায়, টুকরো টুকরো অধ্যাপক পাকড়াশী, তারপর চণ্ডালিনী গীতি নাট্যের রাঙা শালু।

কেবা স্টেজ সামলায়, কেবা—সিনসিনারি সব ছিঁড়েখুড়ে ঠেলে নিয়ে চলে মত্ত ঘুর্ণি। লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় আসরের সতরঞ্চি ওপরের সামিয়ানা। চতুর্দিক ধুলো জঞ্জালে অন্ধকার।

চিৎকার ওঠে, আঁধি আঁধি।

আঁধি কিম্বা ঘুর্ণি হাওয়া না হলেও অমনি একটা ঝড়ো বাতাস।

মানুষ দাঁড়ায় না। কোথায় বা মা হারিয়ে ফেলে ছেলেকে ছেলে খুঁজে পায় না মাকে। স্বামী স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করে না, স্ত্রী ডেকে পায় না স্বামীকে। দেখতে না দেখতে উলটে পড়ে একটা বড় অশ্বত্থ কি বট গাছ। টেলিগ্রাফের থামগুলো থর থর করে কাঁপছে।

বিনয় আর তিষ্টায় না।

বিদ্যুতে লোকে দেখে যে স্টেজের পিছনে একটা কুঠুরী।

ইটের গাঁথুনি—ছোট্ট, বেশ শক্ত পোক্ত। সে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নেবে ভাবে। কিন্তু চলতে পারছে না। কে যেন তাকে পিছন থেকে টেনে ধরে। তবু সে জোর জবরদস্তি করে এগিয়ে চলে। হুড়মুড় করে ভিতরে ঢোকে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরো একজন প্রবেশ করে। বিনয় খিল এঁটে দেয়।

কে?

কোন জবাব শোনা যায় না।

কড় কড় করে মেঘ ডেকে মুষল ধারে বৃষ্টি নামে।

বিদ্যুৎ চমকায় আগুনের আঁকা-বাঁকা জ্বলন্ত তারের মত।

কে?

আমি চণ্ডালিনী।

শুধু তাই নয় বিনয়ের কাছে মনে হয় অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু বড় ভয় পেয়েছে যেন। গলার স্বর অত্যন্ত শুকনো।

এমনি এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষণ মুহূর্তে দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে জগৎ সিংহের সাক্ষাৎ করিয়ে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আর বিধাতা করাল চণ্ডালিনীর সাক্ষাৎ। একই নাটকীয় পরিস্থিতি। কিন্তু পরিণতি কি দাঁড়াবে কে জানে?

কারণ এখনো ঝড় চলেছে প্রচণ্ড বেগে।

আমার বড্ড ভয় করছে।

ভয় পাবেন না, আমি রয়েছি।

বিনয়ের হাতে এক আঁটি বিচালি ঠেকে। পরিত্যক্ত কুঠরী। হয়ত কেউ গরুর খাদ্য এখানে রেখেছে। সে বলে একটু দাঁড়ালে এগুলি বিছিয়ে দি তারপর আরাম করে বসুন। ভালই হল এখানে আশ্রয় নিয়ে।

বিনয় পরিপাটি করে বিচালি বিছিয়ে দেয়। মেয়েটি জড়োসড়ো হয়ে এক কোণায় বসে। কুঠরীটার মাত্র হাত পাঁচ ছয় পরিধি। অতএব মেয়েটির অনিচ্ছায়ই ওড়না-শাড়ি বিনয়ের গায়ে এসে লাগে। গন্ধ আসে মালা চন্দনের। এদিনের বিনয় বাংলোতে বসে সেদিনের কুঠরীর কথা ভেবে কেমন যেন উন্মনা হয়ে থাকে। এ স্মৃতি বিভারাণী ও বীরেন্দ্র সিংহের নয়।

চৌদ্দ

অল্প কয়েকটা চক্কোর দিয়ে বিনয় সেদিন বাংলোতে ফিরে এসেছিল এসে দেখে যে অমিয় নেই, এই কিছু সময় হয় সে নাকি একাই রাগ করে বেরিয়েছে। অন্তত সুশীলের রিপোর্টে তাই পাওয়া যায়।

ঘুম ভেঙে অমিয়ই উঠেছে দেরীতে, আবার সেই রাগ করেছে—ভাল বিনয় আর কোথাও বার না হয়ে চুপচাপ বসে থাকবে স্থির করে।

কিন্তু চণ্ডালিনী ওকে ছাড়ে না। সেই অনেক দূরে চলে যাওয়া ঝড়ের পটভূমি বিনয়ের সুমুখে এসে উপস্থিত হয়। দিনের আলো নিবে যায় বাংলো থেকে। ও যেন আশ্রয় নিয়েছে কুঠরিতে। ওর পাশে একটি ভয়ে জড়োসড়ো বেশ ডাগর মেয়ে।

বিনয় এখন বুঝতে পারে, নিশ্চয় এই চণ্ডালিনী গত রাত্রে যা দিয়েছিল তার মনের গভীর দেশে বসে। তাই বিনয়কে নিতে হয়েছিল শাশ্বতী ভূমিকা। চণ্ডালিনী এক ভীরু দীপ বর্তিকা। চেয়েছিল বাংলোর আলোটার মতই আশ্রয়।

হু হু শব্দে চলেছে ঝড়ো হাওয়া···

আবার এদিনের বিনয়ের কাছে ভেসে আসে সেদিনের মালা চন্দনের সুগন্ধ

মেয়েটি বলতে আরম্ভ করে, আমি একবার ঝড়ে পড়েছিলাম বড়দির বাড়ি গিয়ে।

তখন হয়ত ঘরে ছিলেন না, ছিলেন রাস্তায়—নদী পথে নাকি?

না, ঘরেই ছিলাম। প্রকাণ্ড টিনের ঘর। উড়িয়ে নিয়ে গেল চালের টিন।

এতো ইটের খুপরী। সে ভয় নেই।

বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারলেও মনটা যে কিছুতেই সুস্থ হচ্ছে না।

চিরদিনই বিনয় একটু ব্যঙ্গ প্রিয় লোক। বলতে যাচ্ছিল, তবে কি বুকে জড়িয়ে ধরব নাকি? কিন্তু সে তা মনের ভিতরেই চেপে রেখে দেয়। এ দুর্যোগে এত কঠিন কথা অন্তত মেয়ে লোকের সইবে না। আর ইনি হচ্ছেন আবদারে নাচুনে মেয়ে।

তবু ম ম করে ছোট্ট কুঠুরীটার হাওয়া কাজল চন্দন চুলের গন্ধে এক স্বর্গচ্যুতা অপ্সরীর মত মনে হয়। কখনো বা মনে হয় শাপ ভ্রষ্টা এক দেব কন্যা। স্বভাব প্রগলভ বিনয় সৌম্য হয়ে বসে।

কিন্তু বুক কাঁপে দুরু-দুরু।

কথা বলতে ইচ্ছা করে। অথচ ভাষা যোগায় না। ফুটবল ফিল্ড, কলেজের ক্লাশের বাচালতা কি যেন যাদুমন্ত্রে স্তব্ধ হয়ে থাকে। ফেনোচ্ছল তারুণ্যের কে যেন রুদ্ধ করে অর্গল।

সেই মেয়েটির মুখোমুখিই বিনয় বসে। একেই না বাক্ যুদ্ধে কতবার, কতরূপে আহ্বান করেছে বিনয়—রেঁস্তোরায়, সিনেমায়, জলসার আসরে। চণ্ডালিনী না হোক, ওর প্রতিভূ অনেককে।

ভাল লাগছে, আবেগে থর থর করছে এই ঝড়ো হাওয়ায় গড়িয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলি। যাক না এমনি করে শতাব্দী কেটে। ঘটে যাক যুগান্তের অক্ষরেখা।

কিন্তু তা তো যায় না। বাংলোর বিনয় আর্শির দিকে চেয়ে দেখে, তার মুখের শ্রীতে সে তারুণ্যের দ্যুতি নেই এসেছে রুক্ষতা দৈনন্দিন বিপর্যয়ের ঝড়ে সে যেন বুড়ো হতে চলেছে। সে অপূর্ব মুহূর্তগুলোর স্বাদ পাওয়া যায়। ধরে রাখা যায় না স্থির গণ্ডীতে। চেয়ার ছেড়ে উঠে বিনয় এদিক ওদিক হেঁটে বেড়ায়।

বড্ড ফাঁকা লাগে। এখনো যদি অমিয়টা আসত।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে কখন ঝড় আসবে?

জানিনে। তবে শীগগির যে নয়, তা বুঝতে পারছি।

কি করে বুঝলেন?

হাওয়ার গতিবেগ দেখে।

উড়িয়ে নিয়ে যাবে না তো আমাদের? খুপরিটা যেন নড়ছে।

বিনয় একটু হাসে। দেখছি আপনার বড় প্রাণের ভয়।

বিদ্যুৎ একটু চিকমিকিয়ে উঠতেই মেয়েটি আরো ঘন হয়ে আসে। সে

কথা সত্যি। আচ্ছা আপনি কি এখন বাইরে যেতে সাহস করেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করি।

আপনার তো বেজায় সাহস।

পুরুষ মানুষের কি ভয় থাকলে চলে! ঝড়ে বাদলে কখন কোন দিকে পাড়ি দিতে হয় তার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে। একবার—

ঝড়ের গল্প হলে চুপ করুন, আমি শুনতে চাইনে।

আজকালকার মেয়েদের কি অত দুর্বলতা শোভা পায়। জানেন ওদের দেশে মেয়েরা সাঁতরে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়। বলুন না আমাকে এক্ষুনি ঘুরে আসছি প্ল্যাটফর্ম থেকে।

না, না—আপনি আমাকে একা ফেলে যাবেন না। আপনার দুটি হাত ধরছি। মেয়েটি যেন অনুরোধে ভেঙে পড়তে চায়।

আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি কি আপনাকে ফেলে যেতে পারি এ অবস্থায়? ও শুধু কথার কথা বললাম।

এবার নিঃশব্দে কাটে অনেকটা সময়। বিনয় অনুমানে বুঝতে পারে মেয়েটির মন যেন একটা স্থিতিশীল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

আপনার পরিচয় তো জিজ্ঞাসা করিনি এতক্ষণ?

ভুলে যাচ্ছেন প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছেন—কে আমিও উত্তর দিয়েছি।

ও, ঠিক।

এই মেরিট নিয়ে আজকাল আপনারা যে কি করে এগজামিনে পাশ করেন।

তবে চণ্ডালিনী নিছক অচ্ছুৎ নয়, কিছু লেখা পড়াও নিশ্চয় শিখেছে। একে শিক্ষিতা যুবতী, তাতে আশ্রয়-প্রার্থিনী, তার ওপর নায়িকার ভূমিকায় সজ্জিতা। এ দুর্যোগের রাত্রি বিনয়ের জীবনে যদি না কাটে দুঃখ করার কিছু নেই। তার মুখে কোন বিরুদ্ধ উত্তর জোগায় না।

ঝড় চলতে থাকে।

বাংলোর ভিতর বিনয় পায়চারি করে। জীবনের অতি সমৃদ্ধক্ষণ, মুহূর্তগুলো কেন স্থায়ী হয় না? স্মৃতির জন্য কেন মনুষের কান্না? আবার কেনই বা সুখ সে জীর্ণ বিবর্ণ পাতা ওলটাতে। এত কেনর উত্তর সে জানেনা—অন্তত তার বুদ্ধি দিতে পারে না। তবু তার ভাললাগে বিগতকে মুখোমুখি বসে দেখতে। তার খোঁপাখানি আলতো ভাবে ছুঁতে। তুলে ধরতে পটে আঁকা মুখখানি। আজো তুমি, শুধু ছবি নও। জানি তোমাকে আর কখনো

পাওয়া যাবে না, তবু মিথ্যা নও। তুমি গত তবু আমার কাছে শাশ্বত। তুমি ইন্দ্রধনু আমি আকাশ। মিলিয়ে গেলেও আমার বুকে মিশে রয়েছ। তুমি প্রেমের প্রথম নূপুর ধ্বনি। তোমার স্পর্শেই তো আমি জগৎকে ভালবাসি—ভালবাসি এই ছন্নছাড়া অমিয়টাকে। পুরুষ হয়েও ও তোমার মতই ভঙ্গুর। ওর ভিতর আমি প্রায়ই দেখতে পাই তোমার সেই ঝড়ের রাত্রির ভয়ার্ত মুখখানি।

বিনয় অনেক ভাবে। এবং ভাবতে ভাবতে এক সময় সে অভিভূত হয়ে পড়ে। তার বেড়ে যায় পায়চারি।

মেয়েটি নড়ে বসে, একটু হয়ত সরে যায় আঁচলখানা। বেজে ওঠে পায়ের নূপুর। অমনি ফিরে তাকায় তরুণ বিনয়। চোখে তার সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময় ঘনদৃষ্টি।

আপনি নাচতে শিখলেন কি করে?

যেমন করে আপনি শিখেছেন বাজনা। এই পরিশ্রম করে।

নৃত্যরতা পরিশ্রান্ত মেয়েটির রূপ দেখকে ইচ্ছা করে বিনয়ের। কিন্তু আপনার নাচ দেখার সৌভাগ্য হল না।

আমারও কি কম দুর্ভাগ্য!

বিনয় বিস্মিত হয়! কি বললেন?

বললাম যে আমারও তো আপনার বাজনা শোনার লোভ ছিল। কিন্তু সে আশা কি পূর্ণ হল? এমনি অনেক কিছুই হয় না।

না হয়ে ভাল হয়েছে—আপনি হয়ত লজ্জা পেতেন। বার বার তাল কেটে যেত নাচের। অন্তত হাত তালির ক্ষতি থেকে রেহাই পেয়েছি।

আপনিও যে মুখ মচকাতেন না কি করে বুঝলেন? ভুলে যাচ্ছেন, আমিও উর্বশী নই।

মানবী? রক্ত মাংসের একটি মেয়ে? কেন এসেছে মালা চন্দন পরে? এটা কি ওদের বাসর রাত্রি?

বিনয় নিজেকে সামলায় স্রোতের মুখ থেকে। এ ঠিক সামলাবার নয়—ভয়ে লজ্জায় পিছিয়ে আসা যেন ক্ষুধিতের মুখে বৈরাগ্যের কথা।

এতক্ষণে হয়ত টেলিগ্রাফের থামগুলো উড়ে গেছে।

জানিনে।

কিন্তু আমার কঙ্কন জোড়া যে পাচ্ছিনে। মার হাতের কঙ্কন, বাবা কি বলবেন অস্থির হয়ে ওঠে মেয়েটি। চার ভরির নতুন গড়ন।

আমি তো নিই নি। বিনয় বিব্রত বোধ করে।

কি জানি কি হল। আমি আর বাড়ি ফিরতে পারব না। মেয়েটি কাপড়চোপড় ঝাড়ে। নূপুর বাজে খন খন। ও, স্টেজে টেবিলের নিচে রেখে এসেছি। সেই যে খুলেছিলাম। মালার বালা পরার সময়।

এখনো কি স্টেজ আছে?

তবু দয়া করে একটিবার যদি আপনি···

বীরত্বের অগ্নিপরীক্ষা। বিনয় দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে কিন্তু মালকোচা সামলাতে হয়। আস্তিন গোটাতে হয় সিল্কের পাঞ্জাবীর।

দোর খোলামাত্র প্রাণ শুকিয়ে যায় দুজনার। ঝাপটা বাতাসের সঙ্গে কুঠরিতে ঢোকে পাগলা বৃষ্টি। চতুর্দিকে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। বিনয় বাইরে পা বাড়ায়। দেখতে না দেখতে যেন ডুবে যায় বালির সমুদ্রে।

ফিরে আসুন—ঝড় থামুক, এখন যেয়ে কাজ নেই। মেয়েটি চিৎকার করে ডাকে। কই আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন না? আমার বড্ড ভয় করছে। একবার মেয়েটি ভাবে দোর ভেজিয়ে দেবে, আবার চিন্তা করে, তা তো হয় না। কি অন্যায় সে করেছে এমনি সময় কঙ্কনের জন্য অস্থির হয়ে! যদি কোন বিপদ হয় তবে চিরদিনের জন্য তার স্মরণে কলঙ্ক হয়ে থাকবে।

ফিরে আসুন শুনছেন? কাজ নেই অলঙ্কারে।

হু হু হাওয়ায় ভেসে যায় অনুরোধ। ক্ষণে ক্ষণে আকাশটা চিকচিকিয়ে ওঠে। অমঙ্গল আশঙ্কায় মেয়েটির কেমন যে লাগে! ওর ইচ্ছা করে ছুটে যেতে—কিন্তু কেন যেন তা পারে না।···

আকাশটা আবার ঝিলিক দিয়ে উঠতে না উঠতেই বাজ পড়ে সশব্দে মনে হয় চণ্ডালিনী ঝলসে গেল আঁচে।

কঙ্কন নিয়ে বিনয় ফিরে এসে দেখে গীতিনাট্যের নায়িকা অসাড় অবস্থায় পড়ে। সে দোর ভেজিয়ে ভঙ্গুর দেহটা জড়িয়ে ধরে পরীক্ষা করতে চায়; কিন্তু সে সাহস পায় না। হাজার হলেও নারী দেহ তো।

বিনয় বসে রয়েছে একা—বড় বিষণ্ণ।

আবার ভেসে আসে সেই ঝড়ের রাত্রির মালা চন্দনের গন্ধ।

ভোর হয়েছে ঝড় থেমেছে। নায়িকা সবেমাত্র সুস্থ হয়ে বসেছে। বিনয়ের কৌতুকোজ্জ্বল চোখ জোড়া ওর দিকে নিবদ্ধ। দিনের আলো একটু তাড়াতাড়ি আজ আসুক পৃথিবীতে। ও তৃষ্ণা মিটিয়ে দেখবে গতরাত্রির অনাহূত বধূকে। কিন্তু বিনয় বেশিক্ষণ চাইতে পারে না। মনে পড়ে ওর দুর্বলতার কথা।

দেখতে দেখতে লোকজন এসে হাজির হয়।

নায়িকার পিতাও আসে। মাও এসেছে তার সঙ্গে।

এরা দুজনে অবাঙালী। সন্তানহীন। নায়িকা নাকি এক উদ্বাস্তুর কন্যা। পথে কুড়িয়ে পেয়েছে। তারপর তাকে কন্যাধিক যত্ন করেছে। শিখিয়েছে নাচগান লেখাপড়া বাঙালী আর পাঁচটি মেয়ের মত। বিড়ি মার্চেন্ট হয়েও যথেষ্ট রুচির পরিচয় দিয়েছে মুল্লুকরাম আগরওয়ালা এবং তার স্ত্রী লছমিবাই।

বড় একটা নথ ও ওড়নায় ঢাকা মুখখানা দেখলেই বোঝা যায় এখানেও কম ঝড় হয় নি। মুল্লুকরামের তো গলার আওয়াজ ধরে গেছে।

বিদায় দেওয়ার বেলা ট্রেনের সঙ্গে এগিয়ে এসে বলে, রাম রাম বাবুজী। আপনি না থাকলে হামার শিউলি আজ বাঁচতনি।

কি যেন কি ভেবে লছমি তার স্বামীর মারফতে ঠিকানা চেয়ে রাখে বিনয়ের।

ট্রেনের সঙ্গে ভেসে চলে শিউলি ফুলের গন্ধ।

বিনয় বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে উদাস দৃষ্টিতে। রুক্ষ দাব-দগ্ধ প্রান্তর শীতল হয়েছে। কাঁকর মিশান গেরুয়া মাটিও ধারন করেছে সিক্তশ্রী! এখানে ওখানে খাদগুলো ভরে গেছে জলে। কোথায় বা নেমেছে গৈরিক প্রবাহ। গাছ-পালায় সজল শ্যামলতা।

বিনয়ের চোখে উদাস দৃষ্টি। তরুণ মনে প্রথম বিরহ বিধুরতা—শুরু হতে না হতেই যেন আকস্মিক সমাপ্তি। ওর মনের কাঁচা সিমেণ্টে কে যেন আলতো হেঁটে চলে গেছে—তবু তার পায়ে আলক্ত চিহ্ন ফুটে রয়েছে। এ দাগ হয়ত আর কখনো মুছবেনা।

বাইরে জল থৈ থৈ খানা-ডোবা দেখা যায় অনেকগুলি।

ভিতরে ট্রেনের কামরায় বসে সেই তৃষ্ণার্ত মেয়েটি প্রশ্ন করে, জল কি পাওয়া গেল।

বিনয় মুখ ফেরায়।

এই যে আপনার জিনিসপত্তর বুঝে নিন। সব ঠিক-ঠাক আছে তো? ভাল করে দেখে শুনে গুনে নিন।

বিনয় এগিয়ে গিয়ে ওগুলো হাত বাড়িয়ে নেয়। ধন্যবাদ।

ওকি অমন করছ কেন বাবা? মেয়েটির মা বলেন, তুমি এখানেই বসো ঐ তো তোমার জায়গা।

বিনয় বসে পড়ে। জিনিসগুলি গুছিয়ে বাক্সে তুলে রাখে।

মেয়েটি চটুল কটাক্ষে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমাদের ঘটিটা?

বিনয়ের মাথায় যেন ট্রেনের ছাউনিটা ভেঙে পড়ে।

মেয়েটি মন্তব্য করে, আমরাও তো ধন্যবাদ জানাতে চাই !

বিনয় কিছু বলতেই পারে না। জবাব দেওয়ার মত কোনো যুক্তিই তার মাথায় আসছে না।

এবার তৃষ্ণার্ত মেয়েটি সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে।

পনের

বাংলোর জানালা খুলে অমিয় বলে, আর নয়—বিকেল হয়েছে এবার বার হতে হবে। সে তাড়াতাড়ি জুতো জামা পরে। বেলা একেবারে কাবার হয়ে গেছে। উচিত ছিল আর একটু আগেভাগে যাওয়া।

কেন কোন এনগেজমেণ্ট আছে নাকি ?

আছে বইকি ! সারা সকালটা কি এমনি এমনি ঘুরেছি ?

কিছুই তো আমাকে বলিস নি।

তুই কি জানিয়েছিস কিছু ? সবই তো চেপে চেপে যাচ্ছিস। জুতোর সোল ক্ষয়িয়েছিস আদ্দেক। আমি হাফসোলের খরচা দিতে পারব না। অন্তত সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি তোমাকে সঙ্গে আনিনি।

এ চাকরীর উমেদাবী নয় অমিয়। অমিয় এখানে যে সোল ক্ষয় হয় হাফ-সোল কেন রি-সোলও করতেও চায়না—মানে পারে না কোন মিস্ত্রী। এমন ওস্তাদ কারিগর এখনো জন্মায় নি।

তোর কবিতা থাক—আমি চললাম।

অমিয় বেরিয়ে গিয়ে ফিরে আসে।

কি ?

পদে পদে বাধা। ক্যামেরাটা ফেলে গেছি। অমিয় ক্যামেরাটা তুলে ঝুলিয়ে নেয়।

সুশীল বলে বাবু !

আঃ !

চা খাবেন না ?

এতক্ষণ ছিলি কোথায়—যত জ্বালাতন ! দাও, ধন্য কর তাড়াতাড়ি ! আসুন বিনয়বাবু আপনি খাবেন না ? বসুন।

না অমিয়।

সারা সকালটা আপনি ঘরে রইলেন অথচ চা খেলেন না,আপনার শরীরটা কি খারাপ ? একটু ঘোলের সরবৎ করে দেব ? সুশীল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে।

অমিয় চিন্তিত মনে চা খেয়ে বেরিয়ে যায়। একটু বাদেই ফিরে এসে বলে, তুইও চল বিনয়।

বারে আজ আর নয়। কাল দেখা যাবে। আজ আমার শরীরটাই তেমন ভাল নয়। অগত্যা অমিয় বেরিয়ে যায়। দূর থেকে তার পদক্ষেপগুলি তেমন সুদৃঢ় বলে মনে হয় না। তবু সে উৎরাই ভেঙে নেমে যায় নিচে।

সন্ধ্যা আসে ক্লান্ত ডানা মেলে।

ঝিঁঝিঁরা ইতিমধ্যে বাজনা জুড়ে দিয়েছে লতাগুল্মের অন্তরালে।

বিনয় একখানা চেয়ার টেনে আনে। বাংলোর বারান্দায় সে যেন আর নেই। প্রথম যৌবনের বাতায়নে দাঁড়িয়ে শুনছে ঝিঁঝিঁর বেহাগ। সুমুখের গাছ গুল্ম অন্ধকারে ক্রম বিলীন।

ভাই বোনেরা বেড়াতে গেছে। তাদের মন আজ নাচছে ময়ূরের মত। কেউ শাড়ি কেউ খেলনা দেখাতে গেছে সমবয়সীদের ডাকে।

মা ও বাবা বাগানে। কিছু টাটকা ফল মূল সংগ্রহ করবেন। ঐ সঙ্গে মঙ্গলার দুধ! বিনয় কি কি খেতে ভালবাসে এবং বাসেনা তাই নিয়েও আলোচনা হয় খানিক। মাঝে মাঝে উঁকি ঝুকি মারে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি।

ওকে আজ দুধ বেশ ঘন করে জ্বাল দিয়ে দিও। দুধ ও বরাবরই ভালবাসে।

হ্যাঁ পিতৃরোগ যাবে কোথায়? বাক্যটি শেষ না করেই বর্ষীয়সী স্ত্রী বঙ্কিম কটাক্ষে তাকান।

স্বামী উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করেন না, তিনি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যান। এর পর কষ্ট হলেও ভাবছি ওকে ডাক্তারি পড়াব।

কিন্তু আমার কেন যেন ওকে বিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে—ছোট্ট একটি অল্প বয়সী বৌ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে।

সেদিন নেই হেমলতা—বড় কঠিন দিন আসছে। আগে নিজেকে নিজের পায়ে তো দাঁড়াতে হবে। আমারও তো চাকরী শেষ হয়ে এলো। ও বড় ওর ওপরই পড়বে এতগুলো ভাই বোন মানুষ করার দায়িত্ব।

সব বুঝি তবু আমার অন্তর চাইছে। অবশ্য দুর্বলতাও বলতে পারো যখন আমার বুকের অসুখটা একটু বাড়ে, তখনি মনে হয় যে আমি বেশিদিন বাঁচব না। আমার—।

ছিঃ ওসব কথা বলতে নেই। কিবা তোমার বয়স।

না, না তা বলছিনে, তবে আমার একটা খেয়াল মাত্র।

এখন বাজে কথা রেখে চলো তো খেয়ালী মহিলা ঘরে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

তরকারির ডালাটা তুলে নাও। দুধের ভাণ্ডটা আমার হাতে দাও। কি স্বার্থপর তুমি মরতে চাইছ আগে!

না গো তা নয় ঠিক।

তবে?

মমতাময়ী মাতা কিছু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলতে পারে না। শুধু দেখতে পাচ্ছেন তাঁর ছেলে মেয়ের জীবন কেমন যেন অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নিরাপত্তা নেই। বেকারী রয়েছে তীক্ষ্ণ দংষ্টা মেলে, দাম্পত্য জীবন ওদের রাহু-গ্রস্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে। এই তো আঠারতে পা দিল অতসী, কোন কিছুই করা গেল না। পড়ো পড়ো—আরে শুধু পড়াটাই কি নারী জীবনের চরম সার্থকতা হয়ে দাঁড়াল? তারপর একটি ভ্যানিটি ব্যাগ ও চাকরী একটি।

তারপর—?

শূন্যে সমাপ্তি।

ছেলেদের বেলাও তাই।

এই সাধের সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। কোন পারের ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এপারের সব ঐতিহ্য।

শুধু জেগে রইল কয়েকটি ছেলে মেয়ে হস্টেল। আর কয়েকটা রেস্তোঁরা এবং হাসপাতাল। মায়া-মমতাহীন এ যান্ত্রিক দাসত্ব মা হয়ে কল্পনা করতে বুক ফেটে যায় হেমলতার। তিনি দেখতে পান ঘরে ঘরে এক ছবি। ঘরে ঘরে ভাঙনের আর্তরোল।

হেমলতা বলেন দেখেছ বিনয়টা কেমন গম্ভীর হয়েছে।

বয়স বাড়ছে তো?

এমন একটা কী বয়স হয়েছে, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। চিরদিন মনের বেসাতি করে এসেছি, অতএব ও তোমারই এলাকা আমি নাক গলাতে ভালবাসি নে। নিজেরটাই নিজে সামলাতে পারিনে।

স্বামীর জবাব মনমত হয় না। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তিনি আবার প্রশ্ন করেন আচ্ছা এদিন কি ফিরবে না?

কোন্ দিন?

যে সুখের দিন আমাদের যৌবনে দেখেছি—ক্রমেই তো খারাপ হচ্ছে। ক্রমেই তো সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যত তো চিন্তাই করা যায় না। ধীরে ধীরে যেন রাহু এসে গ্রাস করছে সমস্ত পারিবারিক শান্তি।

তুমি যেদিন ফেরাতে চাচ্ছ তা ফেরে না। হাজার কাঁদলেও কি আমরা

যৌবনের দিনগুলোতে ফিরে যেতে পারি ? চুল পাকলে আর কাঁচা হয় না—এ বড় কঠিন সত্য হেম।

তবে উপায় ? ওরা কি অন্ধকারের দিকেই এগিয়ে যাবে ? ছেলেরা সময় মত নিজের পায় দাঁড়াতে পারবে না—মেয়েদের হবে না সময় থাকতে বিয়ে, সংসার কি ভেঙে চুরে হোটেল রেঁস্তোরা হবে ?

দেখছি আজকাল তুমি বড় বড় কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। এসব চিন্তা করে লাভ কি ?

আমি কি এমনি ভাবি ! ভবিষ্যতের চাপে ভাবাচ্ছে। তোমার তো সময় হয়ে এল পেন্সনের। কুলদাবাবুর সংসারের চেয়ে দেখ না। ভদ্রলোক মারা গেলেন চাকরী করতে করতে গত বছর। যমের মত দুটো ছেলে একটা মেয়ে বেকার বসে। বড়টি ইঞ্জিনিয়ার, ছোটটি ল'ইয়ার, মেয়েটি ডাক্তার। শুনেচ নিয়ম মত নাকি বাস ভাড়া দিতে পারে না। সে তুলনায় আমরা কি।

অথচ ছেলের বিয়ে দিতে চাচ্ছ। ঘাড়ের ওপর একটা ধিঙ্গি মেয়ে। বিনয়ের বাবা একটু হাসলেন।

স্ত্রীলোকের এ যে কি মধুর বাসনা তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন না। তাই state প্রসঙ্গ চাপা পড়ে থাকে। হয়তো অনেক কিছুই এসংসারে দুর্লভ তবু তা কেন যেন কল্পনায় পেতে ভাল লাগে। বিশেষ করে যৌবনটা বিগত প্রেমের সেই আকুলি—ব্যাকুলি ছবি। নিজে না ফিরে যেতে পারুক অপরের মাধ্যমে দেখতে সাধ জাগে। ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে হেরে আসা কেড়ে নেওয়া প্রিয় রাজ্যে।

তুমি কি রাগ করলে ?

না গো না।

তবে যে তোমার কথার জবাব শুনতে চাচ্ছ না ?

বলো, শুনছি। একটু বিভ্রান্তের মতো জবাব দেন হেমলতা।

তুমি চারদিকে অন্ধকার দেখছ—আমি দেখছি ওর পিছনেই দিনের আলো। এই বিশ্বাস নিয়েই খেটে যাচ্ছি। আর বেশি কিছু জানাতে চাচ্ছিনে।

কিন্তু সে আলো কত দূর কিন্তু আমরা কি দেখে যেতে পারব ?

এখন মাথাটা সুস্থ করে একটু ঘুমাও—সবুর করো—ভোর বেলাই দেখতে পাবে। আমি আর বেশি কিছু আজ তোমায় বলতে পারিনে বড্ড ঘুম পেয়েছে। বিনয়ের বাবা ঘুমিয়ে পড়েন। হেমলতা সহজে চোখ বুজতে পারেন না।

তিনি অপেক্ষা করেন। ধৈর্য সংযমের যেন নিদারুণ পরীক্ষা চলে। অবশেষে তন্দ্রায় তন্দ্রায় সকাল হয়। বেশ একটু বেলাই হয়েছে। নিজেকে বড় ক্লান্ত ঠেকেন হেমলতা। কিন্তু সমস্ত অবসাদ ও ক্লান্তি দূর হয় ছেলেমেয়েদের কলরবে।

মা, মা, ওঠো—খেতে দাও।

শুধু বিনয় নেই। এখনো রয়েছে গবাক্ষ পথে গিয়ে দাঁড়িয়ে।

কে যেন বলে একখানা চিঠি এসেছে।

কার চিঠি?…

কে লিখেছে?…

বিনয়ের ছোট ভাই বোনেরা ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যায়।

এবার চকিতে বিনয় জানালা থেকে মুখ ফেরায়। তার বুকটা কাঁপে কেন? এমন অনুভূতি সে পেল কোথায়? কার স্পর্শে তার হৃদয়ে শতদলের পাপড়িতে পাপড়িতে যেন শিহরণ জেগেছে। বুঝেও সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু বড় ভাল লাগছে।

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসে বাংলোর কোঠার ঘরে ঘুলঘুলিতে। উঠে দাঁড়ায় পায়াচারি করে ধীরে ধীরে।

অমিয় প্রায় পৌঁছে গেছে দিলরুবা কেবিনের কাছে। আর একটা মাত্র বাঁক—একটা মাত্র অসমতল ক্ষেত্র। যত অমিয় এগিয়ে যায় তত তার হৃদ-স্পন্দন বাড়ে। সকাল বেলায় গৌরী তো কাছে এল না। মাহাতোই যা কিছু বলল। বিকাল বেলা গৌরী গররাজীও হতে পারে। পিতা এবং কন্যা যে একই ধাতুতেই গড়া হোক এর তো কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই তবে মাহাতো যে অর্থলোভী—সে তার পথ বের করে নেবে।

কাজটা কি ভাল হচ্ছে? এই তস্কর বৃত্তি? গোপনে দূতী পাঠান চিরাচরিত প্রথা। অমিয় তো নতুন কিছু করছে না। তবু তার মনটা ছোট হয়ে যাচ্ছে কেন? ভাবনার কথা। অমিয় নিজের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করে।

পূর্ব রাগের পটভূমি রচনা—তাই এত দ্বিধা সংকোচের কণ্টক দংশন।

না—তা নয়।

তবে?

সভ্যতার নৈতিক কশাঘাত। গোপনে কেন এ-প্রেমের কণ্ডুয়ন?

অমিয় কণ্ডুয়ন করতে চায়না। সত্যি সত্যি ভাল বসতে চায়?

তবে এগিয়ে চলো। ভয়কে জয় করো পা বাড়াও।

কিন্তু দাঁড়াও, আর একটি মাত্র প্রশ্ন—ভালবাসার শেষ কথা, বন্ধন, সে বন্ধন এবং দায়িত্ব সন্তান।

একটু শিউরে ওঠে অমিয়। কিন্তু মাথা নত করে স্বীকৃতি জানায়। সে সুখে দুঃখে গড়া সংসার একটি মায়ার পুত্তলী।

তবে কদম কদম পা বাড়াও।

অমিয় রাস্তার বাঁক ঘুরে একেবারে দিলরুবা কেবিনে সুমুখে হোচট খেয়ে এসে পড়ে।

এত বড় বেলাক্কেটকা গোল এসেন্টেয়ের কেবিনে একটা ধূমায়মান দেশি লণ্ঠন।

দিনের গৌরীকে রাত্রেও ঠিক চেনা যায় কিন্তু মুখখানা দেখা যায় না।

মাহাতো গম্ভীর হয়ে বসে।

আসুন হুজুর। কুর্শি দে শালা লোগ। সাফা কুর্শি আন।

আমি বেশি সময় বসব না, খবর কি?

ঘরে বসে শালী রাণ্ডীবাজি করবে, কিন্তু কাজের মত কাজে যাবে না, এমনি মওকা বছরে কটা জোটে? তোকে খাওয়াবে কে কুত্তিকা বাচ্চি?

অমিয় মন মরা হয়ে যায়।

ওর নাকি তবিয়ৎ খারাপ। বিলকুল মিথ্যা। আসলে ওর সরম করে। শালী ভদ্দর লোকের বেটি হয়েছে। মাহাতো বিড় বিড় করে অনর্গল বকে যায়

গৌরী কোন জবাব দেয় না।

অমিয় উঠে পড়ে। চলতে চলতে ভাবে এই বুঝি গৌরী এসে তার পা জড়িয়ে ধরবে, বাবু আমি নিরপরাধ।

কিন্তু গৌরী আসে না। হয়ত অন্তরালে বসেই নীরবে পাথরের প্রতিমার মত চেয়ে থাকে।

অথচ সব তলিয়ে বুঝে মাহাতোকেও সাজ্ঘাতিক ভর্ৎসনা করতে পারে না অমিয়।

সে ক্লান্ত মনে চড়াই ভাঙে।

ষোল

নীচু থেকে ধাপে ধাপে উঠতে তার যেন সুমুখের পথটা বুকে ঠেকছে। পাথরগুলো ধরে ধরে উঠলেই যেন ভাল হয়। জীবনটা বাইরের অন্ধকারের মতোই একেবারে ঘন কালির তুলি বুলানো। অমিয়র তখনই বাংলোতো

ফিরতে ইচ্ছা করে না। সে অপেক্ষাকৃত একটু সমতল ক্ষেত্রে এসে দাঁড়ায়। একটু বিশ্রাম করবে বলে একটা পাথরের উপর বসে পড়ে। তার উপরে নীচে এপাশে ওপাশে লোকালয়ে আলো জ্বলছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তারার মতো দেখাচ্ছে। ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতো অন্ধকারের বুক চিরে একটা মোটর ছুটে চলেছে—ঐ দূর পাহাড়ের কোল বেয়ে। শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু বর্বরতা টের পাওয়া যাচ্ছে ওর নিশানী চোখ দুটোয়। কি সাংঘাতিক ঝলকানি!

অমনি মাহাত্তোর চোখ। অমনি তার নির্লজ্জ লোভ।

কিন্তু গৌরী?

তাকে দেখেনি অমিয়। অথচ মনের উপর ফেলেছে এক সৌম্য, শান্ত সহনশীলতার ছবি।

ওকে কি উদ্ধার করা যায় না চামার পিতার কবল থেকে? অমিয়রই কাজ নষ্ট করেছে তবু ওরই জন্য কেন যেন দুর্বলতা অনুভব করেছে। আশ্চয মানুষ অমিয়। যত সুন্দর ভাবা যাচ্ছে মুখখানা, হয়ত কেন—নিশ্চয়ই সুন্দর নয় গৌরীর চরিত্র। নইলে পিতা কি পারে অমন কঠোর মন্তব্য করতে? একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হজম করল সব!

অমনি গঞ্জনা তো অমিয়কেও সহ্য করতে হয় হায়ার অফিসারের। তবে মাত্রা এবং সুর একটু মার্জিত এই যা শুধু খাদ্য সংগ্রহের নয়, কোন ক্ষমতায় যে গরিষ্ঠ তারই জগতে এই ব্যবহার, অমার্জনীয়।

গৌরী নিষ্কলঙ্ক—ওর বর্ণের মতোই ও শুভ্র এবং পবিত্র।

কে একজন যেন ঐ পথ ধরে যাচ্ছে, বলল, ওভাবে আপনি একা অন্ধকারে বসে থাকবেন না।

কেন বলুন তো?

আপনি নিশ্চয় নতুন এসেছেন এখানে কি বলেন? বড্ড সাপের ভয় উঠে আসুন।

অমিয় উঠে পড়ে। তিলে তিলে পলে পলে যে যাতনা ভোগ তার চাইতে অনেক ভাল, অনেক কাম্য। এভাবে মরার চেয়ে হঠাৎ মৃত্যু একান্ত শ্রেয়।

একটি লণ্ঠনের আলো নেমে আসছে উপর থেকে নিচে। অন্ধকারের মধ্যে বেশ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। পাশের পাথর ও গাছপালাগুলো চক্‌মক করছে।

ঐ আলোর দিকে চেয়ে এগিয়ে চলে অমিয়। কিন্তু বাংলোতে ফিরে কি বলবে সে? ওর চলার গতি মন্দীভূত হয়ে আসে।

আলো একটু আবডালে পড়ে একটা উঁচু টিলার। তার পরই নেমে আসে দ্রুত।

কেন, কি যেন অহেতুক একটা শুভ সংবাদ প্রত্যাশা করে অমিয় হেঁটে চলে।

দুঃসংবাদ হওয়াও আশ্চর্য নয়। বিনয়টার ভাব গতিক ভাল দেখে আসে নি। এ সকলি তার কল্পনা—সমস্তই ভিত্তিহীনও হতে পারে।

তবু আলোটা নেচে নেচে নামে, সৃষ্টি করে ক্রমান্বয় আকর্ষণের উচ্চগ্রাম—যেন সপ্তমে চড়ে যাচ্ছে সুর। অমিয় চেয়ে থাকে।

বাংলোতে বসে বিনয় চলে গেছে যেন বিগত জীবনে—পশ্চিমের সেই বাসাবাড়িতে। বাবা মার কাছে চিঠি এসেছে বিনয়ের নামে।

কে লিখেছে দাদা? বেশ তো ওজনদার।

তোর দরকার কি?

তবু? অতসী এগিয়ে আসে। ছিঁড়ব?

না, না—আমায় দে।

এসে পৌছতে পারলে না এর মধ্যেই এত বড় চিঠি। বোধহয় আগে থেকে লিখে রেখেছিল। এত বড় চিঠি লিখতে আমার তো একমাস লাগত।

কই দে দেখি? বিয়ে হলে এক রাত্তিরও লাগত না।

তবে আর পেয়েছ। এ চিঠি না পড়ে আমি দিচ্ছি নে। ছিঁড়ব দাদা? তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

চিঠি ছিঁড়লে তোর চুলের মুঠি থাকবে না। এর মধ্যে আর বাকি কটি ভাইবোন এসে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত অতসীর পক্ষেই সব দাঁড়ায়। বিনয় সকলকে পর্যুদস্ত করে চিঠিখানা কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। পারে না।

সংগ্রাম চলে হাতাহাতি।

হেমলতা এসে পড়েন। দে ওর চিঠি ওকে। পরের চিঠি নিয়ে ওকি ছেলেমানুষী অতসা? দিয়ে দে বলছি।

একটি ছোট বোন বলে, দিওনা মা, দিওনা—দিসনে দিদি ওখানা দাদার ভালবাসার চিঠি।

সকলে ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে যায়। বিনয় ওর চুলের ঝুঁটিটা শক্ত হাতে টেনে দিয়ে চিঠিখানা নিয়ে যায় কেড়ে। ফাজিল মেয়ে।

হেমলতা বলেন, যেমন তুমি অসভ্য মেয়ে তেমনি শিক্ষা হয়েছে—এখন কাঁদছ কেন? কিন্তু ভিতরে ভিতরে হেমলতা চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ আবার কি উপসর্গ? বিনয়ের বয়সটাই বা কি? লেখাপড়াও তো চুলোয় যাবে তিনি গম্ভীর মনে কাজকর্ম সারতে থাকেন।

মা কি ভাবছেন বিনয় সে বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে তার ঘরে

ঢুকে রুদ্ধ নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে যায়। পড়া শেষ হলে সে হতাশ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

শিউলির মাতার শুধু কৃতজ্ঞতা—শুধু নিমন্ত্রণ। কলকাতা ফেরার পথে একটিবার যেন দেখা করে যায়। এত যে উপকার করল তাকে এক বেলাও ওরা চারটি খাওয়াতে পারল না। বিনয় একটু অনুগ্রহ না করলে ওরা চিরদিন দেনার দায়ে হাবুডুবু খাবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি—অতি মামুলি ইনুনি-বিনুনি।

বিনয় চোখ বুজে ভাবছে কত কি! এমন সময় অতসী এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় পত্রখানা।

একটু বিস্মিত হয় অতসী। এবার যে দাদা কিছু বলছে না।

কথাটা কিছু সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে।

ঝড়ের রাত্রির নির্দোষ কাহিনীটা বিনয়ের পিতা পর্যন্ত শোনেন।

অতসী এক সময় জিজ্ঞাসা করে একান্তে। হ্যাঁ দাদা, মেয়েটি দেখতে কেমন ?

এই তোর মত ঠিক যেন শ্যাওড়া গাছের পেত্নী।

পেত্নী আমার মত হয় না দাদা—আমার মতো দেখতে হলে হয় রাজরানী।

মন্তব্যটার ধ্বনি আজ পর্যন্ত কানে বেজে আছে বিনয়ের। কিন্তু অতসীর কি হয়েছে—রূপ ঝলসে যেতে বসেছে। কোন রাজা তো দূরের কথা সামান্য একজন কেরানি পযন্ত জুটল না সোয়াশো টাকা মাস মাইনের। গজমোতির হার কেন, একছড়া গোড়ের মালা পর্যন্ত নিয়ে এল না কেউ।

শিউলি বোধ হয় তার চেয়েও সুন্দর।

চোখ বুজে দেখতে চেষ্টা করে বিনয়। নাকে আসে যেন মালা চন্দনের সুগন্ধ।

সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে অব্যক্ত এক স্পর্শ অনুভূতি—যে অনুভূতি শুধু ঝড়ের রাত্রে সম্ভব। সে চুম্বনের স্বাদ জীবনে শুধু একটিবারই পাওয়া চলে, অতি সংকীর্ণ ইটের খুপরির অন্তঃস্থলে বসে।

বিনয় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে।

বাংলোটার চারিদিক অন্ধকার।

একটা আলোর প্রয়োজন, বিনয় ডাকে সুশীল, সুশীল!

সুশীল আলো নিয়ে আসার পূর্বেই একটা ছোট্ট হ্যাজাকের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে সুমুখের পথে। দুটি তরুণীর সঙ্গে একজন পথ-প্রদর্শক।

এদের যেন কোথায় দেখেছে বিনয়।

শিউলির কাহিনীটা যেন ফিলিম কেটে গেছে প্রেক্ষাগৃহে। দ্রুত চাকা

ঘুরিয়ে গুটিয়ে তোলে দরদী অপারেটরের মতো বিনয়। তবু ছায়া ছায়া চমক পড়ে পর্দার বুকে। শোনা যায় যেন ওর বাপ-মার কথাবার্তা।

তুমি তো হেম এবার তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করতে পার। এ চিঠির অর্থ যে কি তা হয়ত বুঝেছ?

ছেলে কেন মরা হয়েছিল তাও হয়ত এবার পরিষ্কার হয়েছে তোমার কাছে?

এখন কী করতে চাও—অজ্ঞাত কুলশীল রিফিউজির মেয়ে, আমার কোন আপত্তি ছিল না—শুধু…

ও এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি—এই তো?

ধীরে ধীরে হেমলতা জবাব দেয়, হুঁ।

কাল সন্ধ্যার তোমার সেই উত্তেজনা কই? অত যে অধীর হয়েছিলে ছেলের বউ দেখবে বলে?

স্ত্রী চুপ করে থাকেন। বোধহয় তার হার্ট ট্রাবলের একটু একটু টের পাচ্ছেন।

পূর্ণ স্বার্থের আড়ালে বুঝি চাপা পড়ে গেছে সব? তোমার সংসার, তোমার ভবিষ্যৎ কি বলো হেম?

না, না—তাও নয় গো—।

স্বীকার করো হেম, স্বীকার করো। আমাদের পাপ আমরাই স্বীকার করলে খানিকটা হয়ত নৈতিক প্রায়শ্চিত্ত হবে। সন্তান যারা তারা এ পাপ দূর করার কথা ভাববে। হয়ত ওর জীবনই কেটে যাবে, তবু ঠিকঠাক দাঁড়ানো হবে না।

তুমি চুপ করো আমাকে আর কষ্ট দিও না।

সব আমি জোড় হাতে স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করো। আমার বুকের ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে।

বিনয়ের পিতা ওষুধ নিয়ে আসেন। খাইয়ে দেন সযত্নে ধীরে ধীরে। মাথার চুলে হাত চালাতে চালাতে বলেন, এবার তুমি আমায় রক্ষা করো হেম—বড্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম বুড়ো বয়সে।

দরজার আড়াল থেকে নিঃশব্দে সরে যায় সেদিনের অল্পবয়সী বিনয়।

রাত্রের শিউলি সকালে ঝরে পড়েছিল। শুকিয়ে যায় মধ্যাহ্নের খর মার্তণ্ডের দুঃসহ তেজে।

বিনয় আর কোন চিঠিপত্রের জবাব দেয় নি।

সতের

মেয়ে দুটি এসেই আগে নমস্কার করে।

বিনয় বলে, নমস্কার। বসুন, বসুন। সুশীল, সুশীল!

সুশীলের লণ্ঠনটা নিষ্প্রভ হয়ে যায় হ্যাজাকের আলোর কাছে।

তুমি শীগগির একটু চা করো তো।

না, না, আমরা এইমাত্র চা খেয়ে এসেছি। বড্ড গরম পড়েছে।

তবে তিন গ্লাস ঘোলের শরবত। বরফ দিও না।

পাবেন কোথায়?

ও, তা ঠিক। যাও এই তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।

সঙ্গের লোকটা ইঙ্গিতে সুশীলকে কি যেন বলে। বিনয়ের নজরে পড়ে তা। আরো এক গ্লাস বেশি এনো।

এটি কে?

সেই লোকটির নির্লজ্জের মতো উত্তর দেয়, হামাকে চিনলেন না? হামার রিকশায় চড়েই তো এখানে এলেন দোবাবু। আপনি আর আপনার দোস্ত।

হামার নাম কানাই সরদার—রিকশা ফুটবল ইউনিয়নের সিক্রেটারী। হামি কলকাত্তা খেলতে গেছি তিন তিন বার।

কী যেন নিতে সুশীল এসেছিল, খুব তারিফ করে গেছে। ঐ তো ওর চেহারা। মাঠে নামলে একাই একশ।

সত্যি? তবে রিকশা ঠেল কেন?

সব সময় তো খেলতে পারিনে—রিকশায় চড়ে দম ঠিক রাখি—মাস্‌ল তাজা থাকে পা দুটোয়।

একজন তরুণী বলে, এর কাছেই সংবাদ পেয়েই আমরা এসেছি।—যদি অনুগ্রহ করে আমাদের একটু উপকার করেন?

কী আমি করতে পারি বলুন? নিশ্চয় করব সম্ভব হলে।

তিন দিন হয় এখানে এসেছি। এর মধ্যে বাসা বদল করেছি দুটো। শেষেরটা যা হক্‌ এক রকম হয়েছে। কিন্তু স্থান সংকুলান হচ্ছে না মোটে। আমরা জন-বার বন্ধু-বান্ধব, একেবারে মেইল ভ্যানের পার্শেল হয়ে রাত কাটাচ্ছি।

বড়ই দুঃখের বিষয়।

আপনাদের নিকটেই আছি—একটু পশ্চিমে সরে হনুমান কলোনিতে।

বেনারসের মতো কোন উপদ্রব ফিল্ করছেন নাকি ?

দুটি তরুণীই এক সঙ্গে হেসে ওঠে। এ-ওর দিকে বাঁকা চোখে তাকায়।

যাক, আশ্বস্ত হওয়া গেল। এখন বলুন আমি কী করতে পারি ?

আপনাদের ঐ পিছনের ঘরখানা, মানে ছোট্ট বাংলোটা যদি দিন পনেরর জন্য ভাড়া দেন ? এর কাছেই শুনে এসেছি। ও হচ্ছে এখানকার গেজেট।

বিনয় মন্তব্য করে গুণী লোক।

সুশীল চারটে গ্লাস নিয়ে আসে একখানা ট্রেতে সাজিয়ে।

বিনয়ের ইশারায় তিনটে থাকে টেবিলের উপরে একটা নামে নিচে : বিনয় রিকশাওয়ালাকেই আপ্যায়ন করে বেশি। আর এক গ্লাস দেব নাকি ? লজ্জা করো না জোগাড় আছে।

তা দিতে পারেন।

একেই বলে প্লেয়ার—সহজ সরল স্পোর্টসম্যানস্পিরিটের তরুণী দুটির হাসতে হাসতে কাশি আসে।

কানাই সর্দারের কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। নিন্দা স্তুতিতে সে যেন সমজ্ঞান। পর পর সে গ্লাস চারেক একাই খায় শরবত।

সরদার এক কাজ করতে পারো ?

কেন পারব না হুকুম করুন—এমন অনায়াসে চক্কোর দিয়ে আসতে পারি ইস্টবেঙ্গল-ক্যালকাটা মাঠ। পাঁই পাঁই করে আমাদের মতো ঢুকে যাবে গোলে। দশ জনেও রুখতে পারবে না।

ওর চোখ-মুখ দেখে কেউ এখন এমন আর অবিশ্বাস করতে পারে না। দক্ষতার দীপ্তিতে ওর রোদে পোড়া মুখখানা ভাস্বর। বিনয় এবং তরুণী দুটি সামাজিক স্বীকৃতি না দিলেও এই শ্রমিক ওদের মন থেকে আদায় করে নেয় সম্ভ্রম।

আমার দোস্ত নিচের দিকে বেড়াতে গেছে। এখনো ফিরছে না—একটু খুঁজে নিয়ে এসো। হয়ত তাকে দেখতে পাবে দিলরুবা কেবিনে। সিগারেট ফুরিয়েছে কিনা—বুঝলে, দিলরুবা কেবিনে। এই লণ্ঠনটা নিয়ে যাও। আচ্ছা দাঁড়াও, একটু লিখে দিচ্ছি।

কানাই সর্দার উঠে পড়ে বিনয়ের চিরকুট নিয়ে। নাচতে নাচতে লণ্ঠনটা নিচের দিকে নামে। পরম উৎসাহে ছুটে চলে খেলোয়াড়।

অমিয়র শ্রান্ত মন দীপ্ত হয়ে ওঠে আশায়। নিশ্চয় একটা সুসংবাদ আছে। সেও অন্ধকারে তাড়াতাড়িই এগিয়ে আসতে চেষ্টা করে। মাঝে ঠোকর খেয়ে থামতে হয় তাকে। মজবুত জুতোও যেন নাজেহাল হওয়ার জোগাড়।

অমিয় আর একটু এগুতেই কানাই সর্দার সুমুখে এসে পড়ে। সে সেলাম করে বিনয়ের চিরকুটখানা অমিয়র হাতে দেয়। এই লিন।

"হতভাগা শীগ্‌গির আয়। নইলে তোর ভাত দাঁড়কাকে খেয়ে যায়।" অর্থটা কি? বেটা কাব্য করেছে। একেবারে প্রথম ভাগের কবিতা। কী লেখার শ্রী -তোর ভাত দাঁড়কাকে খেয়ে যায়। খেয়ে দেখুক না ঠোঁট বাড়ালেই এক কোপ।

তুমি কে? তোমাকে তো চিনতে পারলাম না? কোথায় যেন তোমাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?

একটু দুঃখ মিশ্রিত স্বর কানাই সর্দার বলে। ও হামার নছিব - খেলার মাঠে সবাই হাততালি দিবে বিকশয় উঠলে আর চিনবে না। তারপর সে তার প্রশংসাপত্র দাখিল করে। অবশ্য মৌখিক।

ও বুঝলাম—এখন বলতো কে এসেছে?

দুটি মেম সাহেব। মানে ইস্কুলের মিসট্রেস—ছুটিতে বেড়াতে এসেছে দল বেঁধে। কিন্তু ভাল আস্তানা পাচ্ছে না।

চলো চলো তাড়াতাড়ি।

তবে কি শেষ পর্যন্ত আশ্রয় চাইতেই এসেছে? না, না—তা নয়। যখন চাকরি করে—স্বাবলম্বী তখন নিশ্চয়, এসেছে অন্য কোনো প্রত্যাশা নিয়ে। প্রত্যাশা নয়, প্রার্থনা। পূর্ণ করতে হবে যে কোন উপায়ে।

প্রত্যাশা নয়—প্রার্থনা ভাবতেও ভাল লাগে।

বিভোর হয়ে চলে অমিয়।

এখন আর চড়াই-উৎরাই ভাঙতে কষ্ট হয় না। সেই বরঞ্চ কানাই সর্দারেব মতো প্লেয়ারকে হুঁশিয়ার করে দেয় অত আস্তে চলছ কেন হে? বাঘ-ভালুকের ভয় আছে এই পাশের জঙ্গলে।

মরসুম না এলে ফসল পাকে না। লগ্ন এসেছে কর্তনের। হীরক উঠেছে খনিগর্ভ থেকে। এখন জহুরির মতো তাকে ডৌল দিতে হবে পল তুলে—প্রখর পল। কিন্তু বিনা চেষ্টায় বিনা পরিশ্রমেই যেন এল। একেই বলে আবির্ভাব।

বিনয়কে সে মিছামিছিই বিনা দোষে জড়িয়েছে—সকাল থেকে অমিয় ওর সম্বন্ধে যা যা ভেবেছে তা সত্যিই নিন্দনীয়, অমিয় বড় চপল চিত্ত। এ কখনই ক্ষমার নয়, কিন্তু বিনয় তা কিছুই মনে রাখেনি। সংবাদ সংগ্রহ করেই সে পাঠিয়েছে আমন্ত্রণ। আচ্ছা ওর কি কোন দুর্বলতা নেই? ঠিক অমিয় জানে না। তলিয়ে ভেবেও দেখেনি কোন দিন। সে নিজেকে নিয়েই নিজে বিব্রত। এবং ওকে নিয়ে সকলে বিব্রত থাকে এই অমিয় চায়।

অমিয় শ্বাপদ — অসংযমী।

তবু তাকে বিনয় ভালবাসে—বিনয়কে ভালবাসে এইটাই কি আসল প্রাপ্তি নয়? ঠিক স্বার্থ নেই, অথবা অস্বার্থকও নয় ওদের বন্ধুত্ব।

ওরা অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছে। প্রায় বাংলোটার কাছাকাছি। বামা কণ্ঠের আর্তনাদ শুনে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে। দুজনেই কান খাড়া করে থাকে। শব্দ আসছে নিচের পাহাড় থেকে।

কানাই সর্দার কে চিল্লাচ্ছে?

বুঝতে পারছিনে। দাঁড়ান — শুনতে দিন।

রজনীর অন্ধকার ভেদ করে আবার ভেসে আসে মর্মন্তুদ কণ্ঠস্বর:

মাহাতো গৌরীকে মারছে। নিশ্চয় লোহা পুড়িয়ে ছ্যাকা দেবে।

কী বলছ? চলো, চলো ছুটে চলো।

কি ওরা যে বসে রয়েছেন।

থাকুক, তুমি চলো।

আপনি যেয়ে কী করবেন, এতো ওদের কেবিনে হামেশা ঘটে। মেম-সাহেবরা গোঁসা হয়ে যাবেন—হামার দোটিপ ভাড়া মাটি হয়ে যাবে।

যাক তোমার যা কিছু পাওনা—বকশিস আমি দিয়ে দেবখন। এসো আর দাঁড়িও না। চলো ভাই সর্দার।

অমিয় বুকের টেবিল থেকে এত প্রতীক্ষার এত আগ্রহের জরুরি ফাইলটা সরিয়ে রাখে। জাগে একখানা আর্তমুখ, সে মুখখানি তার এখনো দেখার সুযোগ হয় নি।

সর্দার বলে যে এ পথে ফিরে গেলে, ততক্ষণে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে যাবে। গৌরীকে এ যাত্রা রক্ষা করতে হলে সোজা পথেই যেতে হবে। কিন্তু তা যেমন চড়াই-উৎরাই তেমনি বন্য শ্বাপদসংকুল—পাহাড়ী জংলী পথ!

তবু অমিয় রাজী হয়।

যাওয়ার সময় ওরা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করে সঙ্গে নিয়ে যায় সুশীলকে। বিনয়কে কিছু খুলে বলার অবকাশ হয় না। শুধু জানিয়ে যায় যে একটু দেরি হবে ফিরে আসতে।

তরুণী দুটি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বসে থাকে।

চা খাবে না। ঘোলের শরবত হয়ে গেছে। এখন কী দিয়ে আর আপ্যায়ন করা যায়। বিনয় চিন্তায় পড়ে। বিশেষ চিন্তার কারণ যে এদের দলটিই সেদিন ওদের দু বন্ধুকে আলোড়িত করে গেছে। তার রেশ আজো যায় নি। প্লাস্টিকের রিঅ্যাকশন প্রায় আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল—ভাগ্যে রক্ষা করল সুশীল।

ও মনে মনে দণ্ডবৎ হয়ে সরে দাঁড়ায়।

তবু রিকশাগুলো বোঝাই মেয়েদের ভিড়টা মনে পড়ে সেদিনের। দুটিকে আলাদা করে চেনা যায় না। ভাল করে বার বার চেয়ে দেখে বিনয়। কিন্তু প্রতিবার গুলিয়ে যায় সুমুখের এ দুখানা মুখ।

দুজনের পরনে দুখানা হালকা ঘিয়ে ও কমলা রঙের শাড়ি। গায়ে হাতে কাজ করা ব্লাউজ—সূক্ষ্ম কিন্তু দক্ষতার পরিচায়ক। শাড়ির সঙ্গে বেশ কনট্রাস্ট এসেছে—ফিকে ব্লু ও বাদামী রঙে। কানে দোল দোল করে দুলছে কুমারী মাকড়ির চুম্বন। গলায় সরু হার। এক গড়নের দু গাছা না হলেও এফেক্ট হয়েছে এক রকম।

একজন উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী আর একজন উজ্জ্বল গৌর বর্ণা। কিন্তু কে যে বেশি সুন্দরী বোঝা দায়। কার আকর্ষণ অধিক তাও ঠিক করতে পারে না বিনয়। আর যাই হ'ক এরা বোধহয় প্লাস্টিক নয়।

আপনার বন্ধুটি কোথায় গেলেন? ফর্সা মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে। দেখছি আপনারা হরিহর আত্মা—একত্র না হয়ে কিছুই বলতে পারছেন না।

পাগলা মানুষ, ওর গতিবিধি বোঝা দায়।

শেষ পর্যন্ত কি পাগলের পাল্লায় ভিড়িয়ে দেবে—উপকারটা মন্দ নয়। ফর্সাটি মনে মনে হাসে। শ্যামাঙ্গী থাকে চুপ করে।

উজ্জ্বল আলোর চিমনির উপর একটা কালো পোকা বারবার ঠক ঠক করে এসে পড়ে। বিনয় বলে, দেখেছেন মজাটা? সে ওটাকে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু ওটা আবার আসে দ্বিগুণ বিক্রমে।

ওরা তিনজনেই হাসতে থাকে।

পোকাটা এক সময় কেমন করে যেন চিমনির ফুটো দিয়ে ঢুকে যায়। বিনয় চিৎকার করে ওঠে।—সর্বনাশ! পুড়ে গেল।

তরুণী দুটি অন্তরে বড় ব্যথা পায়।

ওরা স্তব্ধ হয়ে অমিয়র জন্য অপেক্ষা করে। এখন এসে পড়লেই ভাল হতো। কেমন যেন একটা অপ্রিয় কিছু ঘটে গেল—যার সঙ্গে ওদের কোন যোগ নেই। অথচ ওরা একেবারে বিচ্ছিন্ন করতেও পারে না সংযোগ। রাত নটা বাজে। ওরা দূরাগত একটা ঘণ্টার শব্দ শোনে।

গৌরাঙ্গী তরুণী বলে, আর তো দেরি করা চলে না। না এলো রিকশাওয়ালা না এলো আপনার বন্ধু। আজ উঠি কাল না হয় আসব।

আর একটু বসুন না।

না, না, রাত হয়েছে অনেক। দেখছি হেঁটেই যেতে হবে।

কেন, চলুন একটা রিকশা করে দিচ্ছি। মোড়েই পাওয়া যাবে'খন। কানাই এলে বিদায় করে দেব। আলোটা নিয়ে উঠে পড়ে বিনয়।

ওর ভাড়া নিন। এতক্ষণ বাদে শ্যামাঙ্গী হাত বাড়ায়।

কথা বলে এই প্রথম।

বিনয় যেন দেখতে পায়। শিউলির সুডৌল হাতে সেই কঙ্কন। নিমেষে ঝড়, জল, ঝাপটা বয়ে যায়। বিনয়ের টাল সামলে নিতে কষ্ট বোধ হয় যথেষ্ট।

হোঁচট খেলেন বুঝি? ইস্!

উহুঁ কিছু হয়নি। বিনয় হাসে—তালমান ছাড়িয়ে একটু উঁচু পর্দায় উঠে যায় তার হাসির শব্দ।

আঠার

অমিয়. সুশীল, কানাই পাহাড় বেয়ে নেমে যাচ্ছে। পা হড়কে গেলে আসে পাশের খাদে তলিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কাটা জঙ্গল, সাপখোপের অন্ত নেই। সুশীল এবং কানাই বন্য পশুর মতো চলে। ওদের সঙ্গে তালে তাল রেখে চলতে হিমশিম খেয়ে যেতে হয় এই শহুরে বাবুকে। তবু অমিয় দাঁড়ায় না। কেন যেন আজকার এই নির্যাতনের সঙ্গে অমিয় নিজেকে জড়িত মনে করে। হয়ত সত্য নয়, আবার সত্যও হতে পারে।

এখন যে চেঁচামেচি শুনছি নে?

একটু হয়ত শালা থেমেছে, পাঁয়তারা করেছে শোরের মতো। পয়লা নম্বর হারামী।

মাহাতো বেটা এমন করে কেন?

জন্ম দিয়েছে এক পাল কাচ্চাবাচ্চা—নিজে কিছু করবে না। সারাদিন গোঁফে তা' দিয়ে কেবল আমিরী করে ফিরবে। বৌ নেই, ঐ গৌরী আর কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে খালি জ্বালাবে। বৌ মরেছে এই তো সাত বছর। কেউ কেউ বলে যে মরেনি, ঐ দামড়া পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে রোগা খিটখিটে বলে। শালা একজনার খোরাকি কমিয়েছে।

লোকটা তো বড় নিষ্ঠুর।

আর বলেন কেন, শালা পয়লা নম্বর আসামী।

অমিয় এসব কথা বিশ্বাস করত না। ওর শৈশবের একটা কাহিনী মনে পড়ে। দিদির বাড়ি বেড়াতে গেছে। দূর সম্পর্কের এক দিদি। রাত্রে এমনি হৈ চৈ। বয়স্কদের সঙ্গে অমিয়ও ছুটল বিভ্রান্ত হয়ে।

বিষ্টু কৈবর্ত নাকি তার স্ত্রীকে চুবোচ্ছে খালের জলে। অনেক ওঝা, বৈদ্য ঝাড় ফুঁক করেছে জর ছাড়ে না। সংসারের কাজ-কর্ম কিছু হয় না। এইবার নাকি একেবারে জর ছাড়িয়ে দেবে। দারিদ্র্য সংসারে কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

খাল পার লোকে লোকারণ্য। কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ আকুতি আর বট্‌ বট্‌ শব্দ।

বিষ্টু নিখোঁজ।

সকাল বেলা লাশ পাওয়া গেল একটা যুবতী স্ত্রীলোকের। সকলে আহা উহু করল বটে, কিন্তু সে সমস্তই মেকি এবং মামুলি। ভিড়ের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে একটি বালকও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছিল সেদিন। কিন্তু তা আজ হয়ে উঠেছে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ।

তাই অমিয় কষ্ট হলেও থামতে পারে না। প্রাণের ভয়কেও সে আজ তুচ্ছ মনে করে।

চলো—চলো জলদি।

কানাই সর্দার বলে আর বেশি দূর নয়, এই উতরাইটুকু ভাঙলেই টিলকরা কেবিন। সে লণ্ঠনটার আলো একটু বাড়িয়ে দেয়।

অমিয় বলে, বেশ দিব্যি দেখাচ্ছে—এখন আর নামতে কষ্ট হবে না। তারপর সে মনে মনে বলে, ঈশ্বর গৌরীকে গিয়ে যেন শুভ কুশলে দেখি।

জোনাকির ঝিক্‌মিক্‌, ঝিঁঝিঁর ডাক, অন্ধকার পর্দা ভেদ করে চলে। একটা কি যেন সড়াত করে সরে যায় পথের পাশ দিয়ে।

ভয় পাবেন না বাবু ও পাহাড়ী কেউটে কি চিতা বাঘ।

ভাল অভয় দিচ্ছে কানাই সর্দার। তু'দুটোই তো মানুষের পরম হিতৈষী জীব। কী যেন কী নির্ভয়ে কানাই সকলের আগে ফুটবলের মতো আগ বাড়িয়ে চলে।

কারো অনিষ্ট না করলে কেউ নাকি অনিষ্ট করে না। বিষাক্ত সর্পদেরও এই নাকি ধর্ম।

অদ্ভুত তত্ত্বকথা। কিন্তু তার বর্ণনার দৃঢ়তা দেখে অবিশ্বাসও করা যায় না। কোথা থেকে এই সামান্য রিকশাওয়ালা পেল এর উৎস সন্ধান? ভাবতে গেলে অনেক ভেবেও এ তত্ত্বের মৌলিকত্ব একেবারে অস্বীকার করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অমিয় সশ্রদ্ধ মনে হেঁটে চলে।

একটা জংলী লতার সাহায্যে হাত পঞ্চাশেক উঁচু থেকে নিচে নামতে হবে

এখন। নিচটা ঘোর অন্ধকার। অমিয়ের কানে একটা শব্দ যায়।

কী?

শের শিকার নিয়ে খেলছে।

অমিয়ের মনে হয় যেন সাক্ষাৎ যম গুমরে গুমরে উঠছে।

এখন কে আগে নামবে?

কানাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এবার হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে সুশীল। পাশেই সুগভীর খাদ ও কঠিন প্রস্তর। অমিয়র হাত-পা কাঁপতে থাকে। কানাইও ইতঃস্তত করে।

এও কি সেই তত্ত্বকথা। সেই আত্মবিশ্বাস? এ বিশ্বাস আবার জীবন রসায়নের কোন রস?

অমিয় স্পষ্ট দেখতে পায় একটা টক্‌টকে লৌহ-শলাকা নিয়ে মহাতো ঘুরছে উন্মাদের মতো। আর গৌরী চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে। একা সুশীল যে এগিয়ে গেল ওকে ও তো গেঁথে ফেলতে পারে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কানাই-এর সাহায্যে অমিয় নামে। ছুটে যায় কাঠা তিনেক সমতল ক্ষেত্র।

মাহাতো কাবু হয়েছে সুশীলের লাঠির আঘাতে।

লোহার শলাটা এখনো নিবে যায় নি!

গৌরী বিত্রস্ত বাসে আশ্রয় নিয়েছে সুশীলের বুকে।

তুমি কি পাষণ্ড বাপ বলোতো মাহাতো?

ছিঃ ছিঃ এমন কাজ করে?

তবে মওকা ছাড়বে কেন আজ রোজগারের? শরীরে তো কোন চোট লাগবে না। রাত জাগতে হোবে না। আপনি একেবারে সাচ্চা আদমী আছেন।

এ কি কঠোর উক্তি। পিতা হয়ে এমন কদর্য পঙ্কেও ঠেলে দেয় মেয়েকে? সেই নির্যাতনের ভয়েই গৌরীর মাঝে মাঝে এ বিদ্রোহ। এবং তার জবাবে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা—হায় ঈশ্বর! অমিয় একটা পাথরের উপর বসে পড়ে। বাইরের সমস্ত ঝিঁঝিঁ গুলো তার কানের মধ্যে যেন ঢুকে মগজে চলে যায়।

চতুর্দিকে যেন অন্ধকারে বীভৎস নগ্ন, কুৎসিত দৃশ্যগুলো ভাসতে থাকে। পিতার আদেশে গৌরী সাশ্রুনেত্রে প্রত্যহের যূপকাষ্ঠে আপনাকে বাধ্য হয়ে বলি দিচ্ছে।

পিতা নয়, অমিয় অনেক চিন্তার পরে স্থির করে অন্নদাতা।

সে কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়ে। কী যেন কি মর্মান্তিক অনুভূতি তার

এতকালের জংপড়া স্নায়ু চেতনাগুলোকে উত্তেজিত করে তোলে। সে একটা সিগারেট ধরায়। মাহাতো গোমড়াচ্ছে। আর চুপ করে রয়েছে গৌরী।

এত গোলমালে, বিশৃঙ্খলায় আলোটা নিভে গেছে।

নিভে গেছে দেশলাইর কাঠিটা।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে অখণ্ড অন্ধকার।

অমিয় নিতান্ত আধুনিক যুবক হলেও ডাকতে ইচ্ছা করে মহাকালকে। ভাঙতে ইচ্ছা করে তার মোহ নিদ্রা, তামস তপস্যা। তোমার লাঞ্ছিতা গৌরীকে তুমি উদ্ধার করে নাও—হে রুদ্র, হে ভয়াল ভয়ংকর।

কিন্তু কোথায় সে মহাকাল?

অমিয় উঠে দাঁড়ায়। দশটা টাকা গুঁজে দেয় মাহাতোর হাতে। বলে, তার আর গাইডের দরকার নেই—সন্ধান পেয়েছে।

মাহাতোটা দশটাকার নোটখানা হাতে পেয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে। সে বলে যে তার চাকরি গিয়েছে দশ বছর। একখানা হাত পঙ্গু। সে ছিল এক বনে পয়েণ্টস্ ম্যান। ছেলে মেয়েরা তার কথা মতো না চললে কী করে সংসার থাকবে?

অমিয় সে কথায় কান না দিয়ে সোজা চড়াই ভাঙতে আরম্ভ করে। আর মনটা ঘৃণায় বিরক্তিতে শহরে শীতের সন্ধ্যার বস্তি অঞ্চলের মত ঘোর ধোঁয়াটে হয়ে গেছে।

সারা পথটা অমিয় গম্ভীর হয়ে অতিক্রম করে।

কেনই বা সে মাহাতোর কাছে প্রস্তাব করতে গিয়েছিল, কেনই বা তার পরিণাম এমন বিষময় হয়ে দাঁড়াল? সে তো চায় নি এমনি অনভিপ্রেত কিছু একটা ঘটুক। তবু তা' ঘটে গেল। এর একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিয়ে হেতু বিশ্লেষণ করা চলে। কিন্তু তা যেন নিছক সত্য বলে মেনে নিতে মন সায় দেয় না।

তবু অমিয় নিজের মনের গ্লানি ঢাকতে পারে না। সে বাংলোতে পৌঁছে হাত পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসে পড়ে।

বিনয় অমিয়র জন্য ব্যস্ত হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপারটা কি, এসেই আবার হৈ-চৈ করে ফিরে গেলি?

— দাঁড়া, বলছি — একটু জিরিয়ে নি। উঃ! বড্ড কষ্ট হয়েছে দু-দুবার চড়াই উতরাই ভাঙতে। বাপস্, কি রাস্তা। তুই হলে বোধহয় কেঁদে ফেলতিস।

বিনয় চুপ করে থাকে। তার কাছে যে আগ্রহের সম্ভার স্তবকে স্তবকে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে না চাইতে কিন্তু এগিয়ে দেবো না অমিয়কে? এ ভ্রান্তি

নয়, ওর উপেক্ষা। হয়তো খেয়াল বন্ধুবরের। এত সময় যদি বিনয় ধরে রাখতে পেরে থাকে, আরো অপেক্ষাও করতে পারবে তা বহন করতে।

কানাই সর্দারকে বিনয় ডেকে পয়সা দিয়ে দেয়। এই তোমার ভাড়া। ওঁরা দিয়ে গেছেন।

অমিয় বলে, এই নাও আর একটা টাকা—খুশি হলে ত? আবার কখনো ডাকলে এসো।

সেলাম ও সম্মতি জানিয়ে কানাই চলে যায়।

আবার তুই একটা টাকা দিলি কেন—টাকা কি খোলামকুচি?

তা নয়—বেচারী অনেক খেটেছে।

কী নিয়ে এত খাটল? হাল চালিয়েছে—না কোদাল মেরেছে? একখানা চিরকুট নিয়ে যেতে আর এত পরিশ্রম হতে পারে না। বিনয় মনে মনে একটা কিছু সিদ্ধান্তে পৌছতে না পেরে অধীর হয়ে ওঠে। সে অপেক্ষা করে থাকে কখন অমিয় মুখ খুলবে।

কিন্তু অমিয় বা কি বলবে? গৌরীর প্রসঙ্গ তো ওর কাছে বলার মতো নয়।

সে জামা জুতো খুলতে উঠে যায়। নিতান্ত অনিচ্ছায়ই দুজনের মধ্যে হৃদ্যতার আবহাওয়া নষ্ট হয়ে যেতে থাকে।

অমিয় কিছু বলতে গেলেই আর গর্বও পৌরুষের উচ্চ শৃঙ্গ ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। গ্লানিতে ভরে যাবে সমস্ত আকাশ বাতাস। হাজার বন্ধুত্ব থাকলেও বিনয়ের সম্মুখে এ অপমানের বোঝা কিছুতেই খুলতে মন রাজী হয় না অমিয়র।

বিনয় সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করে, কার সংবাদ চমকপ্রদ? কোনটা অনেক বেশি কৌতূহলের নুনে ঝালে মশল্লায় জড়ায়? নিশ্চয় অমিয়রটা। নইলে ও কিছুতেই এতক্ষণ বুকে করে বসে থাকতে পারতো না। ও একা একাই আস্বাদ নিচ্ছে। বেশ গম্ভীর হয়েই চাখছে!

ক্ষুব্ধ মনে বিনয় বসে থাকে বারান্দায়।

কিন্তু মানুষের চির চঞ্চল মন স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে না। সে মাকড়সার মত জাল বোনে। ধীরে ধীরে মৃত্যুর সুতন্তুর ওপর কারুকর্ম করে।

আত্মগোপন করে থাকে বহুদূরে। যেন সরে গিয়েছে ঝড়ের রাত্রে।···

একটি মক্ষিকা এসে উড়ে গেল। আর কোথায় যাবে? ছটফট করছে—কিন্তু তবু নিষ্কৃতি নেই। বিনয় ধীরে ধীরে পা ফেলে—ধীরে ধীরে।

ধরতে গিয়ে দেখে এতো চণ্ডালিনী নয়—আজকার একটু পূর্বের ঐ

শ্যামাঙ্গী মেয়ে। বিনয় বিস্মিত হয়ে একটু সরে যায়। যেন লজ্জা পেয়েছে· সাক্ষাৎ মৃত্যু!

মাকড়সার খোলস ছেড়ে সে বলে, আমি ভালবাসতে চাই। আমি উর্ণনাভ কিংবা তুমি মক্ষিকা নও। চণ্ডালিনীর কাছে আমি যা শিখেছি ও পেয়েছি এতদিন তার সদ্ব্যবহার করতে পারি নি। এবার তোমায় উজাড় করে দেবো। আমার সাধ রয়েছে অগাধ—আমার কামনা রয়েছে অনন্ত।

খেতে আয় বিনয়।

বিনয়ের চমক ভাঙে। সে চেয়ে দেখে চারিদিকে জমাট আঁধার। উজ্জল আলোটা যে এখানে কখনো ছিল, তা এখন আর কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। পোকাটাও যে ঠক ঠক করে মাথা কুটে মরেছে সেও মনে করতে রীতিমত স্মৃতির আশ্রয় নিতে হয়। মেয়ে দুটিও যেন ভেসে গেছে অতীতের অনন্ত স্রোতে। যে স্রোতের সঙ্গে শিউলি ফুলের একটু একটু গন্ধ মিশান। যে স্রোতে হয়েছে ইতিহাসে। যে স্রোতে চলেছে যুগ হতে যুগান্তরে বয়ে।

বিনয় যেন সেই প্রবাহেরই একটি অতি সামান্য বুদ্বুদ। সে মনে মনে এক পলকে সকলের সঙ্গে যেন নিজেকে একাত্ম বোধ করে।

বিনয়!

দাঁড়া মুখ ধুয়ে যাচ্ছি তুই আরম্ভ কর।

ঘুমচ্ছিলি নাকি?

না এমনি বসেছিলাম। তোর কি হাত পায়ের কাঁপুনি থেমেছে ভাই?

হ্যাঁ থেমেছে।

এবার বিনয় নিশ্চই এসে বলবে সব। অমিয় চুপ করে শুনবে। সে ওর কথার আড়ালে লুকিয়ে রাখে নিজের দুর্বল কাহিনী। এ ছাড়া এখন আর গত্যান্তর নেই। ওর যেমন পেটটা ফুটবল হয়ে রয়েছে—একটু মাত্র খোঁচা দেওয়ার অপেক্ষা।

সুশীল কি রেঁধেছে আজ? বিনয় এক ঢোক জল খেয়ে ভিজিয়ে নেয়।

মাংস।

এই গরমে?

আপনাদের যেমন হুকুম।

অমিয় প্রশ্ন করে কাকে কটাক্ষ করছ? আমি কি হাটবাজার সম্বন্ধে কখনো কিছু বলেছি? ও তোমার এলাকা। আমাকে লোহা দাও হজম হয়ে যাবে।

বিনয় আর কোন উচ্চবাচ্য করেনা। কারণ সে এখানে এসেই পরপর

কয়েকদিন মাংস আনতে বলেছে। সুশীল রেঁধেছে বেশ মশলা খাটিয়ে। অত্যন্ত গরমে এখন হয়েছে আশঙ্কা।

বিনয় তবু চুপ করে যায়।

এ অহেতুক মনঃসংযোগ অমিয়র ভাল লাগে না। সে কিছুক্ষণ ধরে রুটি চিবোয়, বাটি থেকে মাংস তুলে নেয় কয়েক টুকরো। মনে হয় যেন একা বসে খাচ্ছে। বিনয় গেছে এখান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে।

যে মাংসে বিনয়ের অতৃপ্তি সে মাংসের কথা মাহাতো ভাবতেই পারে না। রুটি কখানা পেলেই সে পরম তৃপ্ত হয়তো কলহ মালিন্য মিটে গিয়ে ওর স্বল্প পরিসর কেবিনে নেমে আসে কল্যাণময় হাসি।

অন্যমনস্ক অমিয় একটু বেশি খেয়েই ওঠে।

দুবন্ধুতে গিয়ে গ্রহণ করে পৃথক পৃথক শয্যা।

উনিশ

গৌরী অমিয়কে ভাবিয়ে তুলেছে। এতদিন এ পৃথিবীর এত জটিলতা অমিয় এমন করে চিন্তা করে দেখেনি। গৌরীর রূপ তাকে সম্মোহিত করেনি, যৌবন তাকে আকর্ষণ করেনি, মজ্জায় মজ্জায় ঘা দিয়েছে নির্যাতন। সমাজের সামগ্রিক ব্যাধি যত দিনে দূর না হবে, ততদিন এই নির্যাতিতাদের উদ্ধারের উপায় কি ?

গৌরীর সঙ্গে অমিয় তার জীবনের একটা ক্ষীণ যোগসূত্র দেখতে পায়। সেও তার শৈশব থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত পেয়েছে অশেষ দুঃখ, ও অবর্ণনীয় ক্লেশ। অবশ্য দৈহিক নির্যাতন থেকে মানসিক আঘাতই পেয়েছে বেশি।

মাহাতোর নিদারুণ অর্থাভাব—কিন্তু অমিয়র পিতার ছিল অর্থ প্রাচুর্য। তাঁর ছিল মদ বিক্রির লাইসেন্স। দেশি বিলাতি সবই চলত।

রূপকথার মতো মার মুখে শুনেছে, তারা স্বামী-স্ত্রীতে নাকি যখন দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে তখন অমিয় মাতৃগর্ভে। সে এক রহস্যালোক, অন্ধকার, না আলোয় আলোময় তা ঠিক করতে পারেনা শিশু অমিয়।

মা তখন আমি কী খেতাম ?

ঈশ্বর খেতে দিতেন।

কেন, তোমার দুধ ?

তা কি তখন হয়েছে বোকা!

না, না—নিশ্চই হয়েছে। আমি চুপটি করে পেট থেকে বেরিয়ে এসে খেয়ে যেতাম।

আচ্ছা তাই।

তুমি হাসছ যে?

আজ চোর ধরা পড়েছে বলে। মা চুমো খেয়েছে অমিয়র মুখে।

অমিয় রয়েছে লজ্জায় চুপ করে।

আর এক দিন হয়তো অমিয় জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা তোমরা পালিয়ে এলে কেন দেশ ছেড়ে?

তোমার জন্য বুঝলে?

বালক তখন এ কথার রহস্য বোঝেনি। সাবালক হয়ে তার অর্থ বুঝেছে অন্যরূপ। তবু আজ পর্যন্ত যেন সম্পূর্ণ রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি—তাই মানসিক যাতনা কমেনি অমিয়র।

টেরাইর সন্নিহিত একটা পাহাড়ী অঞ্চল। আবছা এবং ঘন তুলির দাগের মত স্মরণ হয় তার। ছোট বাড়িটার সমুখে একটা বিস্তীর্ণ কাঁকর উপল মিশ্রিত মাঠ। মাঠের প্রান্তসীমা দিয়ে একটা পাহাড়ী নদী বয়ে গেছে সর্পিল রেখায় অনেকটা শাদা চওড়া জড়ির পারের মত। কোথাও বা এক হাঁটু জল—কোথাও বা পায়ের পাতা ডোবে না। জায়গায় জায়গায় ওর মধ্যেই রয়েছে ছোট ছোট আবর্ত। অমিয়র বড় ভাল লাগত পাথরের ওপর বসে পা ভিজিয়ে রাখতে।

বর্ষা এলে এই নদীর রূপ-হত ভয়ংকরী। পার কিনার গাছ পাথর ভাসিয়ে নিয়ে যেত। তখন নৌকা চলত এপার-ওপার। গাড়ি, ঘোড়া, গরু, মানুষ প্রভৃতি পার হত নায়ে চড়ে।

তখন অমিয় চুপটি করে বসে থাকত মায়ের কাছে। শুনত চোরা-বালির গল্প। এই নদার পারে যেখানে শিমুল গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে কে নাকি কবে হয়েছে জীবন্ত কবরস্থ। চোরাবালিতে ঘোড়সওয়ার ঘোড়া সমেত ডুবে গেছে।

বালির রাক্ষুসে হাঁ কল্পনা করে অমিয়।

বালকের কল্পনা আজ ব্যাপ্তি লাভ করেছে। জগৎ জুড়ে কি সাংঘাতিক মুখব্যাদন। অমিয় বিছানায় উঠে বসে। সিগারেট ধরায়, ভাল লাগেনা—কিছু ভাল লাগে না, শুতে বসতে উঠতে সব জ্বালাময়। জ্ঞান, অনুভূতি, বয়স যত পাকছে ততই যেন দাহন বাড়ছে।

ওকে আজ গৌরী অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে।

অমিয় চেয়ে দেখে বিনয়টা ঘুমিয়েছে কিনা? ঘুমিয়েছে, বেশ নিশ্চিন্ত মনেই নিদ্রা যাচ্ছে। হয়তো শুভ সংবাদ ওকে দিয়েছে সুষুপ্তি। ঘুমাক শান্তিতে। একদিন ও যেন কী জ্বালায় জ্বলেছে। অমিয় স্পষ্ট না বুঝলেও, অস্পষ্টে অনেক কিছু বুঝেছে। বিনয় কেন, জগৎটা নীরবে ঘুমাক। চোরাবালি তপ্ত শলাকা অনেক সয়েছে—আরো সইতে হবে, ঘুমাক, নিদ্রা যাক্ জগৎটা নীরবে।

অমিয়র আবার মনে পড়ে অল্প বয়সী মার মুখখানা। গৌরীর মত আজ অপ্রসন্ন মনে হয়, গৌরীর মুখখানা অবশ্য তাকে মনে মনে এঁকে নিতে হয় তুলির ক্ষিপ্র টানে। গৌরী যেন মা হয়ে ওকে শৈশবের পাদদেশে ঠেলে নিয়ে গেছে।

সেদিন অমিয়র বাবা বাসায় ফিরছে মত্ত অবস্থায়।

দোর খোলো।

না আমি দ্বার খুলবোনা। তুমি যেদিকে পার সেদিকে যাও।

না আমি মদ খাইনি। মদ খেলে কি মাইরি কেউ ইস্তিরির কাছে ফেরে? দেখ আমার মুখ দিয়ে ভুর্ ভুর্ করে বের হচ্ছে আতরের গন্ধ।

তোমাকে আমি বলিনি যে ছেলে আমার বড় হচ্ছে, ওসব ছাড়ো। বেলেল্লাপনা আর চলবেনা। একটু সভ্য ভব্য হয়ে চলো।

সভ্য হয়ে চলো।

এর মধ্যেই তোমার বাবা ছেলে বড় হয়ে গেল—রাত তো বারোটাও বাজেনি?

চা বাগানের ঘড়িতে তখনি ঢং-ঢং করে শব্দ হয় চারটা।

মদখোর মাতাল, চরিত্রহীনের কি রাত কখনো ভোর হয়? সব সময় নেশায় চুর দিনের আলোতেও দেখে সাঁঝ রাত্রের ঘোর। তুমি যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফিরে যাও বলছি।

দোর কেঁপে ওঠে সদম্ভ পদাঘাতে। তবেরে সতী মাগী। দেব সব ফাঁস করে? দেবো?

অমিয় ভয়ে চুপ করে শুয়ে ছিল শয্যায় কুকুর-কুণ্ডলী দিয়ে। সে এবার আতঙ্কে গিয়ে জড়িয়ে ধরে মাকে।

এবার সে একটু একটু বুঝতে পারে কেন আজ সন্ধ্যার পর থেকেই মার মুখখানা দেখাচ্ছিল আসন্ন বর্ষাকালের মেঘের মত। মা হয়তো পূর্বাহ্নেই অনুমান করে নিয়েছিলেন এমনি একটা কিছু ঘটবে।

দোর খুলে দে, নইলে আমি চেঁচাবো। তোর সব কীর্তির হাঁড়ি হাটে ভেঙে দেবো।

অমিয়র মনে মনে ইচ্ছা হচ্ছিল বাবাটাকে কেটে ফেলতে। দোরের খিলটা গিয়ে শক্ত হাতে চেপে ধরতে — কী অসভ্যের মত হেঁড়ে গলায় চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

কিন্তু মা কেন যেন দুর্বল হয়ে পড়লেন ; বললেন, আর চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করোনা। খোকা উঠেছে — তোমার পায়ে পড়ি চুপ করো। এই দোর খুলে দিচ্ছি।

ভিতরে প্রবেশ করে অট্টহাসি হাসলেন বাবা।

মা মন্তব্য করলেন, যতদিন পয়সা ছিল না—ভালবাসা ছিল স্নেহমায়া ছিল। পয়সাও হল ঘাড়ে শয়তানও চাপল — আমার গয়না-গাঁটি খুইয়ে এ দোকান করে লাভ হল কি? দেখছি ছেলেটাও শেষ পর্যন্ত হবে মাতাল। এ দোকান কি পুড়ে যায় না।

ও অভিশাপ দেওয়া হচ্ছে বুঝি।

দেবনা অভিশাপ? জন্ম-জন্মান্তর দেবো, তুমি আমার যা করেছ! আর কথা বলতে পারেন না মা।

বাংলোর পাশের ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজে — শিস শোনা যায় ভোরের পাখির। অমিয় অতর্কিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। এর পরের কাহিনী আরো মর্মান্তিক। আজ থাক — সে আর ভাবতে পারে না দুর্বল মস্তিষ্কে।

সুশীল!

আজ্ঞে?

হাত মুখ ধুয়ে আমার কাছে এস একটা কথা আছে। খুব সকাল সকাল তোমার ঘুম ভাঙে তো — অমিয় স্লিপিং ড্রেসেই বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসে। ভোরের হাওয়ায় ফুলের গন্ধে মনটা প্রফুল্ল বোধহয় অমিয়র। সে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে থাকে।

একটু বাদে সুশীল এসে হাজির হয়। কী বলছেন?

সিগারেট আনতে হবে দিলকুশা কেবিন থেকে।

এখনো তো টিন তোলা রয়েছে — দেখেছেন?

হ্যাঁ জানি, তবু—

যেতে হবে? সুশীল বিস্মিত হয়। কিন্তু তার বিস্ময় কেটে যায় অমিয়র মুখ চোখের চেহারা দেখে। সে টের পেয়েছে যে বাবু গত রাত্রির ঘটনার পর একটু কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়েছেন — রাতটাও কেটেছে অনিদ্রায় সারা মুখখানা জুড়ে একটা করুণ ক্লান্তি ভেসে বেড়াচ্ছে। এমন ক্লান্তশ্রী সে দেখেছে যাত্রাদলের রাজ্য-হারা প্রিয়জনহারা কোনো দুর্ভাগা রাজার—মাত্র

এই কটা দিন যেতে না যেতে সুশীলের একটা মায়া জন্মেছে এই দুটি ছন্নছাড়া মনিবের জন্য।

এদের সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত সমস্ত কিছু না জানলেও এটুকু বুঝেছে যে এরা যেন কোথায় অসহায়। কোথায় যেন এদের সমস্ত প্রাচুর্যের মধ্যেও রয়েছে অভাবের চোরাবালি।

এক্ষুনি যেতে হবে?

হ্যা—তবে চা খাইয়ে যেতে পার, তাও এমন একটা বেশি কি দেরি হবে?

না বাবু, তা হবে না। আমার সব গোছান রয়েছে। আপনি বিনয়বাবুকে ডেকে তুলুন, ততক্ষণে চায়ের জল নেমে যাবে।

বিনয়, বিনয়। বড় ক্লান্ত কণ্ঠে ডাকে অমিয়।

এত সকালে উঠেছিস? তুই কি রাত্রে ঘুমোস নি? আমি দু-দুবার উঠেছি তোর উসখুসানি টের পেয়েছি, কিন্তু ডাকিনি কি হয়েছে ভাই?

বিনয়ের কণ্ঠে মাতার মমতা ফুটে ওঠে। সেই অল্পবয়সী লাঞ্ছিতা মার। অমিয়র বলার কিছু ইচ্ছা থাকলেও বলতে পারেনা। কিন্তু পারলেই বুঝি এ ভার কেটে যেতো। বলতে হলে যে বলার মত করে বলতে হবে—যাকে ইংরেজিতে বলে, কনফেসন্। ওঃ! এর চাইতে গ্লানি-মুক্তির চমৎকার পথ বুঝি আর নেই। হাজার বার ফাঁসিকাঠে ঝুলেও যে পাপের, গ্লানির মৃত্যু ঘটান যাবে না, তা মাত্র একটি বারের অন্তরের অশ্রুধারায় ধুয়ে মুছে নির্মল হয়ে যাবে। অমিয়র পক্ষে আজ সে কনফেসনও করা সম্ভব নয়। নিজের আত্মমর্যাদা ও অসম্মানের চেয়ে যে বড় অবমাননা হবে তার মার। চিরদুঃখিনী বটে, তবু গরিয়সী অমিয়র কাছে।

বিনয় অমিয়র কপালের ওপর লুটিয়ে পড়া কোকড়া কোঁকড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলে, যা মুখ হাত ধুয়ে আয়, চা খেতে খেতে শুনব সব।

দুজনে উঠে মুখ ধুতে চলে যায়।

সুশীল ঘরে ঢুকে ক্ষিপ্রহস্তে বিছানা মশারি গোছায়। সে ভাবে মাহাতো পাষণ্ড। গৌরটাও চরিত্রহীন। ওদের ওখান থেকে সিগারেট এনে লাভ কি? পয়সা দিতে হলে অপাত্রে দিয়ে লাভ কি? আর তো অনেক দোকান আছে এ কথা উল্লেখ করে দেখবে নাকি?

সে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আসতে যায়।

একটু বাদেই ট্রেতে করে সব নিয়ে আসে।

কোন কথা উল্লেখ করে লাভ হবে না। বাবু যখন দশটাকার নোট একখানা অনায়াসে দিয়েছেন, তখন অন্য দোকানের সিগারেটে আর সে স্বাদ পাবে না।

দিলরুবার আস্বাদই আলাদা!

বড় ভাল লেগে ছিল কাল গৌরী যখন ওর বুকে মুখ লুকিয়ে ছিল। কিন্তু এসব কথা চাকরের ভেবে লাভ কি? মনিবের পাতের মুড়ো চাকরের কাছে আকাশকুসুম কল্পনা। সে শুধু সুগন্ধি ব্ল্যাক ক্যাট সিগারেট এগিয়ে জুগিয়ে দেবে—ঐ পর্যন্তই তার পাওনা—এ জীবনে আর শার্টের ওপর টাই ঝুলিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চেয়ে দেখা হবে না!

সুশীল হাতটা পুড়িয়ে দিলে তো? বিনয় বলে, তা হয়েছে কি, ব্যস্ত হয়োনা! এখন তেমন গরম নেই চা।

ওর দোষ নেই,আমিই ওকে ব্যস্ত করেছি। অমিয় চা খেতে খেতে বিনয়ের কাছে গৌরীর কথা বলে, বাপটা একেবারে নচ্ছার, বুঝলি বিনয় ইনহিউম্যান।

সুশীল এসে পয়সা নিয়ে চলে যায়।

বিনয় বলে, এর উপায় নেই, এমনি ইনহিউম্যানের অন্ত নেই পৃথিবীতে। সাইকোলজিতে বলে, এ একটা বিশেষ ধরনের রোগ। এ নিয়ে অনেক পণ্ডিতেরা গবেষণা করে গেছেন। এই যেমন ফ্রয়েড…।

জানি। অত্যন্ত বস্তাপচা মাল।

বলিস কি, একজন মনীষী ব্যক্তি!

হতে পারেন,তবু আমি বলব চিরকালের আসনে বসে থাকার ওঁর যোগ্যতা নেই। সমকালের চাহিদায় তিনি গজিয়েছিলেন, আজ মরে গেছেন। ব্যস!

বিনয় একটু বিস্ময় বোধ করে। অমিয়র মত একটা হ্যাবল ছেলে একি মন্তব্য করছে! সত্যিই তো মাহাত্যের চরিত্র আজ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখার সময় এসেছে। সেই দৃষ্টিকোণকে নিয়ে গেল অমিয়কে! একটা রাত্রে যেন যুগ পরিবর্তন।

বিনয়ের আনন্দ বোধহয়। আজ যেন নূতনভাবে পেল ও অমিয়কে। সে নিবিষ্ট মনে চা খায়। একটু একটু করে খায় টোস্ট দুখানা।

বিনয় বলে, এর ওপর নির্ভর করে তো অনেক গবেষণা, অনেক সাহিত্য হয়েছে, তাও মরে গেছে।

তবে কি বলতে চাস, এর কোনো মূল্য নেই?

থাকবে না কেন—ফসিলের যেমন মূল্য আছে।

আরো অনেক কথা হয় দু'বন্ধুতে। শুধু অমিয় ব্যক্ত করে না তার মায়ের ধূ ধূ স্মৃতিমাখা ব্যথা।

বিনয় সময় বুঝে বলে, এবার তবে শোন আমার কথা, সত্যিই ওরা এসেছিল, আজ আবার আসবে।

কুড়ি

চল দুজনে একটু বেড়িয়ে আসি, নিকটের ঐ পাহাড়টা পর্যন্ত যাবো।

ওরা সাধারণ জামাকাপড় পরে বেরিয়ে যায়। এক বাড়ির পাশের একটি বাগানের দিকে নজর পড়ে, অজস্র গোলাপ গাছ, অজস্র সুগন্ধি ফুল। কোনটি ফুটব ফুটব করছে, কোনটা ফুটে ঝরে পড়েছে। পূর্ণ গৌরবেও ফুটে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা।

দেখেছিস বিনয় এমন রুক্ষ পাহাড়ী মাটিতে কী জন্মেছে!

বিনয় আজ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। আজ নয়, এখানে এসে অবধি তার উপর ধূসর প্রাণেও কী যেন ফুটতে চাইছে! তুই কি কখনো কারুকে ভালবেসেছিস? অমিয়র একটি প্রশ্নে কি যেন ওলটপালট হয়ে গেছে এমন যে ওর কখনো হবে তা চিন্তা করেই দেখেনি। আজ ওর মন সাগ্রহে আকুল হয়ে রয়েছে যেন কার প্রতীক্ষায়!

বিনয় বলে, মানুষের জীবনও তো ঐ ফুলের মতো। সকাল বেলা ফুটে সন্ধ্যাবেলা ঝরে পড়ল, কি বলিস?

হ্যাঁ কতকটা তাই বটে। তবে মানুষ ঝরে পড়েও মরে না! তার স্মৃতি থাকে, কীর্তি থাকে—পুরুষ পরম্পরায় সে সন্তানের মধ্যে বাঁচে। ফুল আর মানুষে এই যা তফাৎ।

তা ঠিক। বলেই বিনয় হাস্যোচ্ছলে একটা দুর্বল উক্তি করে। বিকেল বেলা সে এগিয়ে এল, আমাদের অবস্থা কি?

আমরা কি মানুষ! অমিয়ও দুর্বল স্বরে জবাব দেয়। ভেবে দেখ ভাল করে সত্যি বলছি কি না!

কেন আমরা মানুষ নয় কেন রে? বেশ খেয়ে দেয়ে দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছি, আবার চেঞ্জে এসেছি! কত জায়গা দেখব কত জিনিসের ফটো তুলবো কত আমাদের কল্পনা আশা-আকাঙ্ক্ষা।

তবু আমরা মানুষ না!

তার কারণ?

আমরা যে কেরানি! লেখাপড়া শেখা পালিশ দুরন্ত মেশিন। তারপর ধীরে ধীরে অমিয় বলে, যুগের বলি।

কথাটা বিনয় যেন শুনেও শোনে না। এবার বেড়াতে এসে সমস্ত উৎসাহ ও আনন্দ যেন অবসাদে ডুবে গেছে। আর নয়, এবার একটু চেষ্টা

যত্ন করেই বাঁক ঘুরাতে হবে। দার্শনিক চিন্তায় লাভ নেই। জীবনের সমস্ত সমস্যা কোনোদিন একেবারে মীমাংসা হবে না, তা বলে বর্তমানটাই বা খুইয়ে লাভ হবে কি? আর বেশি দূর যাবো না অমিয় এখানে একটু বসি—এই পাথরখানার উপর। তারপর বাংলোয় ফিরে যাবো। ওরা কখন এসে পড়ে তার তো ঠিক নেই।—

দেখিস আসবে না। অমিয় বলে, বেশি আশা না করাই ভাল।

বেচ তো আমাদের নয়, তাদের। জায়গা কুলোচ্ছে না, বস্তার মতো গাদা দিয়ে রয়েছে, ভাড়া নিতে চাইছে আমাদের পিছনের বাংলোটা।

তুই কি রাজী হয়েছিস? বাড়িওয়ালা কি বলে?

তাকে না জিজ্ঞাসা করে কি করে কথা দিই। বাড়িওয়ালার এর মধ্যে কোন বক্তব্য নেই। ভাড়া পাওয়ার সময় দুটো পোরসনই ভাড়া নিতে হয়েছে আমাদের।

মানে বাধা করেছে?

তা হলে পাকা কথা দিলেই পারতিস?

ঐ তো বললাম বরের মনের কথা কী করে জানব? আমি তো জ্যোতিষী নই।

এবার তুই গিয়ে টোপর পর, আমার আর সাধ নেই।

মিথ্যা কথা বন্ধু, মিথ্যা কথা। তোমাকে ঠেলে আমি এগিয়ে গেলে পিছন থেকে ফাউল করবে—সম সাইড হবে নির্ঘাত। তুমি বরঞ্চ টোপর পরে এগিয়ে যাও। আমি রইলাম সেন্টার হাফ। কোনো শালাকে এগুতে দেব না। অমিয়, দুষ্টু প্রতিপক্ষের অভাব নেই সংসারে।

কে, কে এসেছিল?

একটি গৌরাঙ্গিনী, অপরটি শ্যামাঙ্গিনী মেয়ে।

নাম?

জিজ্ঞাসা করা হয়নি। বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

কেবল আমার সঙ্গেই যত ফক্কবাজি তোমার! এরা যে তারা তা বুঝলি কি করে?

দাদার গোঁফ দেখে।

এবার মন মরা অমিয়ও একটু না হেসে পারে না। সত্যি, তুই আছিস বলেই এখনো বেঁচে আছি। চিরদিন তুই এমনটি থাকিস।

অমিয় মনে মনে অনুভব করে বিনয় যেন মৃতসঞ্জীবনী। ওর জীবনেও

তেমন সুরাহা নেই, তবু ও হাসে এবং হাসায়। পৃথিবীতে এমন লোক কজন মেলে? ওর সঙ্গ ছাড়া অমিয় যেন একান্তই একা। ওর অসহায় শিশু মন আরো জোর করে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরে এই পরম বন্ধুর গলা।

এখন চল, ফেরা যাক বিনয়,ঘর দুখানা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে রাখতে হবে। হয়তো চামচিকের বাসা হয়ে রয়েছে।

ওরা দুজন ফিরে আসে।

সুশীল তখনো ফিরে আসেনি। দুটো চেয়ার নিয়ে দু বন্ধুতে পাশাপাশি বসে। বেলা প্রায় সাতটা। এর মধ্যেই যথেষ্ট সূর্যের তেজ বেড়েছে, সমুখের ঝাউ গাছ ও পাম গাছগুলো রোদে ঝিলমিল করছে। কয়েকটা যাযাবর পাখি উড়ে দ্রুত ডানা ঝাপটায়। কোন্ দেশ থেকে কোন্ দেশে যাবে তা হয়তো এখনো জানা নেই। তবু চলেছে কী যেন কী নেশায়। অদূরে ছোট্ট একটি পাহাড়ী টিলার ওপর বৃদ্ধ গির্জা। একটি আইভি লতায় তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরেছে। বছরের পর বছর বোধহয় বেড়েই চলেছে এ লতার আবেষ্টন। বিনয় ঠিক জানে না, তবু তার এই মনে হয়।

যত দূর সরে যেতে চাও সংসার তোমায় ছাড়বে না অমিয়। তার নজির এই গির্জাটা। কোন সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে এই নিরালা পাহাড়ী রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। তবু বুড়োর রেহাই নেই। সন্ন্যাসী হয়েও ঐ দেখ কেমন নাতি-নাতনির পিছন টান। একবার আইভি লতাগুলোর দিকে চেয়ে দেখ।

বিনয়ের কথায় অমিয় চোখ ফেরাতেই সুশীল এগিয়ে দেয় সিগারেটের টিনটা। অতএব গির্জাটা ঢাকা পড়ে সামান্য সুশীলের আবির্ভাবে।

সংবাদ কি?

সব ভাল।

মাহাতো তো ঠাণ্ডা আছে, আর কোনো উদ্বেগ করেনি তো?

না যতক্ষণ টাকা দশটা হাতে আছে, আর কোনো ভয় নেই, ফুরলেই ভয়।

এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার কার আছে, যে এ ভয়কে নির্ভয় করে তুলবে অমিয় খানিক ভেবে বলে, যাও বিনয়বাবু যা যা বলে তাই কর গে। পিছনের ঘর দুখানা সাফ করতে হবে। দরকার আছে। একটু পরে আমিও যাচ্ছি।

এখন তো রান্নাবান্নার জোগাড় করতে হবে। দুপুরের পর করলে হবে না আমি একাই সব পারবো তখন।

বেশি দেরি করা ঠিক হবে না—কখন ভাড়াটে এসে পড়ে ঠিক নেই।

লজ্জায় পড়তে হবে সব গোছগাছ না থাকলে। রান্না সংক্ষেপে করো—শুধু ডাতে ভাত—বাস।

ঘরের চাবি নিয়ে বিনয় চলে যায়

সুশীল সঙ্গে যেতে যেতে নিজের মনে নিজে প্রশ্ন করে, আবার কারা আসছেন—রুই, মৃগেল, না কালকের রানী ইলশে? কিন্তু গৌরী ওদের তুলনায় অনেক শ্রীমতী। তার জামা কাপড়ের বাহুল্য নেই, আছে সুগঠিত মাংসপেশী। সাধারণ গৃহস্থলির পক্ষে এ হচ্ছে পরম লোভনীয়। তখন সে যে সুশীলের কথা শুনে অমিয় একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল, সে কি চকিতে গৌরীর কথাই ভাবল? সুশীল অনুভব করে গত রাত্রির ভয়ার্ত মাংসল আবেষ্টন।

জলের শব্দ হয় সঙ্গে সঙ্গে আসে ঝাড়ুর আওয়াজ। সাফ হচ্ছে সব আবর্জনা। কিন্তু মর্মান্তিক স্মৃতি মুছে ফেলা যায় না। তিরস্কৃতা, বিষাদিতা মা আসেন অমিয়র কাছে তার মাথায় যেন সস্নেহ হাত চালান।

তবে রে হারামজাদী, তুই কাকে শাপ দিচ্ছিস, তা জানিস নে। আমি হচ্ছি এ অঞ্চলের মালের রাজা—ওয়াইন-কিং, দেখিয়ে দিচ্ছি মজাটা। একটা ছুরি এসে পড়ে মার কপালে ফলাটা না লেগে বাঁটটা লাগে। তার আঘাতেই যথেষ্ট মা বসে পড়েন।

চিৎকার করে ওঠে অমিয়।

চোপরাও, গলা কেটে ফেলব

কি কষ্টে যে সেদিন অমিয় চুপ করে ছিল উঃ! দম বন্ধ হয়ে আসছিল আর মনে মনে সে ঐ ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করছিল এই শয়তান পিতাটাকে।

মাতাল পিতা ঘুমিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ বাদে।

রক্ত মুছে মা অমিয়কে কোলে করে জানালাটার কাছে গিয়ে বসে থাকেন

সেদিন হাটবার হাট বসে নদীটার ওপারে। পিঠে পিঠেই মালপত্র আমদানি হয় বেশি আসে বোঝা নিয়ে নুয়ে নুয়ে ওপর পাহাড় থেকে, নেপালী মেয়ে পুরুষ। স্থানীয় অধিবাসী, চা বাগানের কুলি-কামিনও আসে—কোল, ভিল, সাঁওতাল শেষ পর্যন্ত বুকের ওপর থেকে হাঁটু পর্যন্ত নামান লুঙির ঢঙে কাপড় পরা মেয়েদেরই সমাগম হয় বেশি। হাটের শেষে অমিয়র মনে হয় এ বুঝি কামরূপ-কামাখ্যার মতই এক রাজ্য কত বিচিত্র রঙের যে কাপড়। কত অদ্ভুত গড়নের যে গয়না!

প্রতি হাটবার অমিয় নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

কিন্তু আজ আর কিছু ভাল লাগে না।

মা আকাশের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রয়েছেন। তাঁর মুখের দিকে চাইতে ভয় হয়। অথচ বড্ড খিদে পেয়েছে অমিয়র।

সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। মা যদি কথা বলেন, তবেই যেন ভাল হয়। কিন্তু মা একান্ত অন্যমনস্ক। অমন করে স্থির নিশ্চল হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে কি ভাল লাগে!

একটু আঁচলটা টানে অমিয়। টেনেই একটু ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে মায়ের মুখের দিকে। কিন্তু মুখখানা ভাল করে দেখতে পায় না সে। অন্যদিন হলে ভিন্ন কথা ছিল। আজ তার সাহস হয় না বিরক্ত করতে।

সে কোল থেকে নেমে পড়ে। ঘরের ভিতর ঘুর-ঘুর করে ঘুরে বেড়াতে মন সরে না। বিছানায় একটা যেন রাক্ষস শুয়ে। হাতের কাছে পেলেই যেন ওকে আস্ত গিলে খাবে।

ওর ক্ষুধা ক্রমে তীব্র হয়—ক্রমে যেন অবসন্ন বোধহয় শরীর। ও ওর খেলনা ঘোড়াটাকে নাড়ে একটু। তুলে নেয় রথের মেলায় কেনা ঝকঝকে তলোয়ার-খানা। এখন ইচ্ছে করে ঘোড়ার পিঠে উঠে, টগবগ করে ছুটে যেতে ঐ ঘুমন্ত শত্রুটার কাছে পর্যন্ত।

কিন্তু কাতর করে আসে খিদেয়। ও দিকে মার কাছে চলে আসে। ওর পায়ের ঠেলা লেগে একটা পেয়ালা বড় কাঁসার গ্লাসটার উপর পড়ে যায়।

আহা ভাঙল বুঝি দামি পেয়ালাটা! এক্ষুণি আড়-মোড়া ভেঙে উঠবে বুঝি দৈত্যটা।

বালক অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

মা মুখ ফিরিয়ে তাকান। অমিয়র দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

চলো বাবা খেতে দিই তোমায়।

এত বয়স হল—এত লোকের সংস্পর্শে এল, কিন্তু এ মমতার গভীরতা আর তো কোথাও দেখতে পেল না অমিয়। সেদিন মাত্র চারটি মুড়ি খেতে দিয়েছিলেন মা,—তারপর কত চপ, কাটলেট, টোস্ট, মামলেট ডিনার খেল অমিয়, কিন্তু সে আস্বাদ কোথায়? সে অমৃতের আস্বাদ।

ও বাংলোটায় ঝাড়ুর শব্দ হচ্ছে এখনো। বেলা প্রায় সাড়ে আটটা। ওদের গিয়ে একটু সাহায্য করা উচিত—নইলে একেবারে ভদ্রতা বিরুদ্ধ দেখায়। যাদের আসবার কথা তারা এসে পড়লে কান কাটা যাবে সকলেরই।

অমিয় উঠব উঠব করে।

দুপুর হয়েছে হাটবার। যথারীতি খেয়ে-দেয়ে বালক অমিয় বসে রয়েছে ছোট্ট জানালাটার শিক ধরে। মা গম্ভীর হয়েই তাঁর কাজ কর্ম শেষ করেছেন

এই কিছুক্ষণ হয় বেরিয়ে গেছে মাতাল পিতাটা। ঘরটা হাল্কা ঠেকছে অমিয়র কাছে। এতক্ষণ যেন দুর্গন্ধে ভরেছিল ভিতরটা।

মার মুখ অপ্রসন্ন। তাই অমিয় নীরব। নইলে সে তার তলোয়ারখানা দিয়ে একটা যুদ্ধ আরম্ভ করে দিত। শত্রু ভয়ে মেঘের অন্তরালে গা ঢাকা দিয়ে কাঁপছে। এই তো বীরত্বের সুযোগ।

একটা তীব্র চিৎকার শোনা যায়।

আবার গৌরী চেঁচাচ্ছে নাকি? অমিয় লাফিয়ে ওঠে চেয়ার ছেড়ে। অতদূর থেকে শব্দ আসা অসম্ভব আর মাতালের এত তাড়াতাড়ি চক্ষুলজ্জা কেটে যাওয়াও অবিশ্বাস্য।

শব্দ আসছে আরও দূর থেকে—সুদূর অতীত থেকে।

একুশ

আর নয়—অমিয় উঠে পড়ে। এ জায়গাটা না ছাড়লে চিন্তায় ওকে ছাড়বে না।

কতদূর হল বিনয়? একেবারে দেখি কোমর বেঁধে লেগেগেছিস। বাঃ বেশ তো ঝকঝকে হয়েছে। এ ঘরখানাকে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে আমাদের খানার তুলনায়। বদলাবদলি করে নিবি নাকি?

দূর, দূর—মেয়েদের কি বাইরে রাখতে আছে।

ওরা তো আর ঘরকুনো মেয়ে নয় যে ভয় করছিস।

তবু অভিভাবকের দরকার, দরকার হুঁশিয়ারির। যখন আমাদের ছত্র-ছায়ায় এসে আশ্রয় নিচ্ছে, তখন যতদূর সম্ভব আমাদের সাবধান থাকতে হবে। প্রহরীর জায়গা হচ্ছে ফটকে।

যদি কেউ গোপনে খিড়কির দোর খুলে দেয়? ধরো গভীর নিশীথে?

টাকা পয়সা সোনা-দানা চুরি হয়ে যাবে। প্রহরী করবে কি—এমন তো অঘটন ঘটেছে! অমিয় আমরা এ ক্ষেত্রে অসহায়। দে তবে সমুখের বাংলোটা ওদেরকে।

না, না, তা বলছিনে, তাহলে ওদের অনেক অসুবিধা হবে বাথরুম ইত্যাদি নিয়ে। সমুখটা একেবারে বেআব্রু তো।

অমিয় একটুখানি দৈহিক পরিশ্রম করতে চায়, হয়তো তাতে মনের গ্লানি দূর হবে। সে ইঁদারা থেকে কয়েক বালতি জল নিয়ে আসবে ভাবে। সুশীল বালতি দুটো আমাকে দে।

না—উঃ-হুঁ সে কি হয়।

তবু অমিয় বালতি ধরে টানাটানি করে।

বিনয় বলে, দে সুশীল ছেড়ে দে—এতক্ষণ তো নবাবের মতো বসে ছিল। ফাঁকিবাজি করে তার বাড়ির মালিক হওয়া যায় না। তাতে ভাড়াটে বিগড়ে যায়। টাকা দিয়ে সুখ সুবিধা চায় সকলেই। আঙুলের ডগা দিয়ে রগড়ে রগড়ে দেখবে আয়নার মতো হয়েছে কিনা।

তুই তো সমস্ত ব্যবস্থাই করেছিস। একটু ময়লাও কি আছে কোনোখানে? তুইও তো সমান অংশীদার—অবশ্য আমি যদি বাড়িওয়ালা হই।

আর সব ব্যবসায় পার্টনার নেওয়া চলে—কেবল এখানেই অংশীদার অচল। বুঝলি অমিয় আইন নেই। মহাভারতের যুগ থেকে মানুষ অনেক এগিয়ে এসেছে।

সত্যি কথা। কিন্তু বিনয়ের মতো বন্ধুকে নিয়ে ভোগ করার কল্পনা করা যায় না। এও এক নিষ্ঠুর কথা। অমিয় একটু দুঃখ বোধ করে।

এবার আধঘণ্টার মধ্যে ধোয়াপোঁছার কাছ শেষ হয়ে যায়। তিনজন মিলে করলে আর কতক্ষণ। সুশীলের কাছে দুবন্ধুতে বুঝিয়ে বলে সব। তোমাকে একটু ফুট-ফরমাশ করলে কানে তুলো দিয়ে মুখ ফিরিয়ে থেকো না। আমাদের সকলেই অতিথি ওরা।

সুশীল বলে, আমি কি নুন দিয়ে ভাত খাইনে যে এটুকুও বুঝিয়ে দিতে হবে? কিন্তু মনে মনে শঙ্কিত হয় অত্যন্ত। এতগুলো আলসে বাবু-মেয়ের হুকুম তালিম করা প্রাণান্ত। ও দেঁতো হাসি হাসে।

অমিয় বলে,আর নয়,এবার সিঁদুর পড়লে মেঝে থেকে তুলে নেওয়া যাবে।

হতভাগা একেবারে সেকেলে! এখানে সিঁদুর আসবে কোত্থেকে? বল যে রুজ পড়লে, পাউডার, ক্রিম পড়লে।

ওরে সাহেব, গড ফর বিড্—এখানে বসে তোর একটা অ্যাকসিডেণ্ট হলে আর চার্চে যাবি নে। যে ডাক্তার আসবেন তিনি খোট্টা হলেও ফার্স্ট এইডে ব্যবহার করবেন সিঁদুর—এই হল ফিউডাল ট্রিটমেণ্ট, অর্থাৎ সেকেলে ব্যবস্থা।

বিনয় কৃত্রিম অনুযোগের সুরে জিজ্ঞাসা করে, গড ফরবিড্ বললি কেন? তুই কি চাসনে যে আমার—

না, কোনো মানুষই চায় না যে তার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর একটা অ্যাকসিডেণ্ট হ'ক। বিনয়ের দিকে চেয়ে একটু মুখ মুচকে হাসে অমিয়।

এতো ট্রেন নয়, মোটর নয়, বা ইলেকট্রিক শক্ও নয় যে তুই ভয় পাচ্ছিস! তবে কিরে হতভাগা।

পুষ্পস্তবক।

তবে হ'ক অ্যাকসিডেণ্ট—মর এক্ষুনি। আমি টেলিগ্রাম করে সমবেদনা জানাই তোর বুড়ো হোটেলওয়ালার কাছে। আই একারেজ মই ডিয়ার ফ্রেণ্ড!

ছুটে এসে বিনয় শেকহ্যাণ্ড করে অমিয়র সঙ্গে।

সুশীল ঝাড়ু-বালতি নিয়ে চলে গিয়েছিল—এসে বলে, বাজার যেতে হবে না?

অমিয় বলে, আজ আর ঝামেলা বাড়িও না সুশীল। স্রেফ ভাতে-ভাত হোক।

যদি ওঁরা এসে পড়েন? একটু জলখাবার দিতে হলেও—

তবে বাজার যাও, শীগ্‌গির বাজার যাও। আর দেরি করো না। রেশন ব্যাগ আনো।

এ দিকেও তো সব ছড়ান-বড়ান রয়েছে। উঠানটা হয়ে রয়েছে নোংরা। ঐ দেখুন—ওগুলো সাফ করে যতক্ষণে বাজার যাবো, ততক্ষণে…

তবে থাক। চল বিনয় আমরাই যাই। কিছু ফুল আনতে হবে, কিছু ধূপকাঠি। দুটো ফুলদানিও চাই বাংলোটার জন্যে।

কিন্তু দুজনে একসঙ্গে যদি বেরিয়ে যাই, আর ওঁরাও এসে ওঠেন—তখন সুশীল একা কী করবে? হয়তো মনে মনে ক্ষুণ্ণ হতে পারেন, কি বলিস?

চিন্তার কথা। তার চেয়ে ভাবনার কথা তোকে নিয়ে। পারেন, করেন, ওঠেন ক্রিয়াপদের গৌরবে একে-বারে ও-গো মা-গো তুই। হা-হতোস্মি!

তোর কেবল ঠাট্টা। বিনয় একটু রাঙা হয়ে ওঠে। চকিতে মনে পড়ে সেই কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটিকে। তবে তুই থাক এখানে অগৌরবের হাতুড়ি নিয়ে। এমন অভ্যর্থনা করবি যে গেট থেকেই কেঁদে বিদায় হয়।

আঃ-হা-হা বলিস্ কি! তোর চোখ দুটোই যে আগে ছল্‌ছল্ করে উঠছে। মন্তব্যটা করেই স্বাভাবিক কণ্ঠে বিনয় বলে, রাবিশ! সত্যিই তুই থাক, আমি চললাম অমিয়। হ্যাঁ, একটা কথা, ফুল কিন্তু বাজারে পাওয়া যাবে না। পাশের বাড়ির মালিককে কিছু দিয়ে যোগাড় রাখিস আবার ভুলে যাসনে যেন।

বিনয় কী যেন ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে যায়। সে না গিয়ে যদি অমিয় বাজারে যেত।

এ অহেতুক অভ্যর্থনার কারণ কি? অমিয় নিজের মনে নিজেকেই প্রশ্ন করে। বলতে পার এ আত্মতৃপ্তির নেশায় কি সত্যি পিপাসা দূর হয়?

তবে?

আর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই যে ছুটোছুটি, হাহাকার, আয়োজন, সব কি বৃথা নয়?

এবারও তার জবাব দিতে পারে না তার মন। কিছু চয়ন করে চলে বিগত স্মৃতি। অমিয় ব্ল্যাক ক্যাটের টিনটা টেনে নেয়। সে সম্মুখের বারান্দায় এসে বসে পড়ে। চলে যায় শৈশবের টেরাই অঞ্চলে।

মানুষের আর্তনাদ নয়—একটা রক্তাক্ত পশুর। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে গেল একটা শূকর ছানা। বালক অমিয় জানালা বন্ধ করে ছুটে এল।

মা যেন কোল পেতে ছিলেন—আশ্রয় দিলেন অমিয়কে। কোনো ভয় নেই বাবা।

নদীর ওপারে একটা দরমার ঘেরা জায়গা—হাটের ঠিক দক্ষিণ পাশে—কিছু দিন হয় ঔৎসুক্য বাড়িয়েছে অমিয়র। সে বারবার মাকে জিজ্ঞাসা করেছে, ওখানে কি হবে? পুতুল নাচনা সার্কাস—ঐ যে সেবার এসেছিল, একটা মানুষের দুটো মাথা, চারটে হাত?

মা শুধু বলেছেন, না ও সব কিছু নয়, তোমার বাবা কী জন্য যেন ইজারা নিয়েছেন।

আজ প্রাঞ্জল হয়ে গেল সব। একটা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে পাঁজর ফুটো করে হত্যা করা হচ্ছে শূকর। মাংস বিক্রি করা হবে। একজন কসাই রাখা হয়েছে পাহাড়ী। ঘা খেয়ে শূকর ছানাটা আর্তনাদ করে ছুটে বেরিয়েছে দরমার গণ্ডী ছাড়িয়ে—

সেদিন অমিয় রাগে, ঘৃণায়, ভয়ে অধীরতা অনুভব করেছে, আজ দেখেছে মাহাতোর সঙ্গে পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে তার পিতার। কিন্তু তুলনার মধ্যে অবস্থার আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

মানুষের এ হত্যার নেশা কেন? কেন এ আদিমতা? যুগ যুগ ধরে সে কত শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ, গীতার মধ্যদিয়ে এগিয়ে এল, কিন্তু কেন ছাড়তে পারল না এ বর্বরতা?

আজ অমিয় ব্যস্ত অস্থির হয়ে পড়ে তার মাতার কথা ভেবে। ওঁরও যেন কলিজায় আঘাত করা হয়েছিল সুতীক্ষ্ণ শায়ক দিয়ে। তিনি চিৎকার করে ছিলেন না বটে, তেমন সাংঘাতিক রক্তক্ষরণ হতে দেখেনি অমিয়, তবু বুঝতে পারছিল আঘাতের নিষ্ঠুরতা।

মা আজ তার অমিয়কে কাছ ছাড়া করেন না। কিন্তু বেশি কথাবার্তাও বলেন না। অমিয় আঁচলে আঁচলে পায়ে পায়ে ঘোরে। বড় মিষ্টি লাগে মায়ের গায়ের গন্ধটুকু। চুলের রাশটা ও বার বার নাড়ে। এবার গন্ধ

আসে আরো মধুর ওর।

কিন্তু এক সময় অমিয় জিজ্ঞাসা করে, মা তুমি যে কথা বলছনা?

কথা বলে কি হবে? তুই ও তো বড় হলে আমায় কষ্ট দিবি।

কে বললে এ কথা। আমি তোমায় কত জিনিস এনে দেব যা তুমি যখন চাইবে।

তা দিবি বটে। বাঁশের গোড়ায় আর অশ্বত্থ জন্মে না।

মার মন্তব্যটা আজো মনে আছে অমিয়র। কত বছর পেরিয়ে এসেছে তবু ম্লান হয়নি এতটুকু। সে বাঁশের ঝাড়ের অতি দড় কঞ্চি হয়েছে না কি হয়েছে তার প্রমাণ দেওয়ার তো অবকাশ হল না। কোনো উপায় কোনো ক্ষমতা নেই আজ অমিয়র। সে শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। দূরের আকাশে কে যেন মিলিয়ে যায়। কার যেন সেদিন চুলের ছায়া পড়ে। তারই অন্তরালে হয়ত জলভরা মুখ।

বড় হলে তুইও তো বৌকে কষ্ট দিবি। বাসন কোসন গোছাতে গোছাতে মা বলেন, বলেন হ্যারিকেনের চিমনিটা সাফ করতে করতে। আমি দিব্য চোখে সব দেখতে পাচ্ছি।

ছোট ছোট কথা, কিন্তু কি যেন গভীরতা রয়েছে। লজ্জিত বালক বলে, আমি বিয়েই করব না। তুমি ভেবনা মা।

আজ বয়স্ক অমিয় নিজের মনেই হাসে। দেখেছ মা আমি কথা রেখেছি তো? অন্যগুলো কতটা সফল করা যেত জানিনে—এটা পালন করেছি তো?

চিমনির কালি পোঁছা হয়েছে। দেশলাই খুঁজে বার করেন মা। আলোটা জ্বালান তিন চারটে কাঠি নষ্ট করে। প্রত্যহ এতগুলোর দরকার হয় না।

আমার তোদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে।

কেন? কেন? বালক অমিয় বুঝতেই পারেনা এমন কি অন্যায় সে করেছে। তার পিতা? একদিন মাত্র হঠাৎ একটা কিছু করার জন্য কেন অমিয়র মা এতখানি রাগ করেছেন? বালকের বিশ্লেষণী দৃষ্টি মূল পর্যন্ত আলোকপাত করতে পারে না। মায়ের অভিমানে সে আহত হয়ে পড়ে।

সিগারেট টানতে টানতে অমিয় দেখে সমস্ত অন্ধকার। কোনো রহস্যই উদ্ঘাটিত করা যাচ্ছে না। এ যেন কয়লা খনির লাইট ফিউজ হওয়া একটা ধসে যাওয়া গহ্বর। শুধু আঁধার। তাঁর শৈশবের এবং জন্মের বহু পূর্বের কৃষ্ণ যবনিকা। কে তাকে তুলে দেখাবে?

সন্ধ্যা হয়েছে। মা গিয়ে উনোনে আঁচ দেয়। ব্যথাহত মায়ের পিছু ছাড়ে না অমিয়।. কাঠ এগিয়ে দেয়। এনে দেয় কেরোসিনের বোতলটা

সেদিন যে কেন সে এগিয়ে দিয়েছিল কেরোসিন ! কি যে বালকের বুদ্ধি হল। এমন সে মাঝে মাঝেই সাহায্য করত মাকে, তাই ঠিক দোষ দেওয়া চলে না। আর ওর মাও তো ছিলেন মনে মনে আহত।

গোষ্ঠীর ধারা যায় কোথায়, তুইও নিশ্চই জ্বালাবি তোর বৌকে হাড়ে হাড়ে।

স্ত্রীর ব্যাপারে বালক তো একেবারেই সাফ জবাব দিয়েছে। এখন নীরব হয়ে যাচ্ছে।

আকাশের তারা উঠেছে ফুলঝুরির মতো। বাইরে শাল-গাছগুলো ডাইনির মতো কেমন করে দাঁড়িয়ে, ধোঁয়ায় কেমন করে ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ছে সব। আবার একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে—রোজই অমিয় চেয়ে চেয়ে দেখে এ দৃশ্য কিন্তু আজ আর ভাল লাগে না। ও যেন চায় না পৃথিবীর ধোঁয়ায়, মালিন্যে ঢাকা পড়ুক নির্মল আকাশ, মুক্ত প্রকৃতি, শাল পিয়ালের গাছ।

নিত্যকার মতো রান্নাবান্নার যা কিছু গুছিয়ে নেন মা। কেন যেন কুটনো বাটনা—সংগ্রহ করেন অন্য দিনের চেয়ে বেশি। বার বার তিনি মুখ মোছেন। হয়তো ঘাম নয়তো আর যে কি তা সেদিন অমিয় ঠিক বোঝেনি।

আজ তার অন্তর পুড়ে পুড়ে ওঠে। সে ভুলে যায় সিগারেট টানতে।

গন্ গন্ করে আঁচ উঠেছে। মায়ের মুখখানা ততোধিক গন্গনে। তখনো কেরোসিনের বোতলটা রয়েছে উনোনের নিকটে। শাদা কেরোসিন দাঁড়িয়ে রয়েছে বোতলের অর্ধেকটা পর্যন্ত।

মায়ের রাঙা মুখের সঙ্গে যেন কানের পলা দুটো মিশে গেছে। সে এক অবর্ণনীয় শোভা! বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারে না অমিয়। তার যেন চোখ ধাঁধিয়ে আসছে।

একটা হাঁড়ি চড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন মা ?

ফুল কি আনা হল অমিয় ?

একজন কুলির মাথায় উনোকোটি জিনিস। বিনয় তা ধরে নামাচ্ছে।

অমিয় ধড়মড় করে উঠে বসে।

আমি জানি যে তুই ভুলে যাবি। এমন পেচোয় পেল তোকে কাজের সময়।

কী কাজ, কী উৎসবের আয়োজন—অমিয়র মাথায় কিছু আসে না। সে দেখে যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জোড়া মায়ের থমথমে মুখখানা—কোথায় যেন হারিয়ে গেছে কানের রক্ত-পলা।

বাইশ

জিনিসপত্রগুলো হাতাহাতি সরিয়ে ফেলা হল।

কী কী রান্না হবে সুশীল? বিনয় জিজ্ঞাসা করে।

এতো নেমন্তন্ন নয়—জলখাবার, উপস্থিত মতো করে দেব। দুজন আসবেন, তাতে আর কত লাগবে। এই দু-খানা লুচি আর চা।

না, না দু একটা চপ করো এবং কাটলেট।

যদি দলসুদ্ধ এসে উপস্থিত হয় দু একটা চপ কাটলেট তো কুলোবে না। আর সবাই সব খান না, কিন্তু লুচির কারুর আপত্তি হবে না। আমার একার পক্ষে ঐটে সুবিধে। আপনারা যে ব্যস্ত হচ্ছেন, তাঁরা তো এখনো এলেন না।

বিনয় ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখে। তাই তো প্রায় সাড়ে এগারোটা। কিন্তু এবেলাই যে আসবেন তাতো হলফ করে বলে যাননি। সকাল বেলা আর কে কোথায় বেড়াতে আসে। দেখো বিকেল না হতেই এসে পড়বেন।

অমিয় বলে, কিন্তু গরজ তো আমাদের ছিল।

ওরে সে গরজ কমেনি। শোবার কষ্ট রাত্তিরে, সেজন্য কেউ সকালে অস্থির হয় না। আগে দেখ না বিকেলটা পড়েই নিক। তুই ভাই অমিয় ফুল আনতে যা—আইটেম্ বাদ দেওয়া যাবে না। সুশীল তুমি জেনো, মাইনে দেই বলে তুমি গরু নও। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর আমরাও তোমার সঙ্গে খাটবো।

অমিয় বলে, আমি তা পারবো না।

আহা তোকে কে বলেছে খাটতে! তুই তো বর—

না, না বাবু সে কি ভাল দেখায়, আপনারা খাটবেন কেন?

অমিয় বলে, উনি ক্লাউন না সাজলে সার্কাস জমবে কেন? এসে দেখবেন কি তারা! এখন বাঁদর নাচটাই যা বাকি।

অমিয়র মনে পড়ে, শিপ্রা রেবা, অনুভার কথা। তাদেরই যেন নৈতিক জয় হতে বসেছে। সব আয়োজন থাকতেও ওকে যেন অদৃশ্য সুতোর টানে টানে কাহিল করে দিচ্ছে। সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে অনেক দূরে। কত দূর তা কেবল মাত্র অনুমান সাপেক্ষ।

বিনয় যেন একটা বিয়ের আড়ম্বর জুড়ে দিয়েছে—মেয়েরা আসবে।

অথচ এদেরই সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য কি অপরিসীম ব্যাকুলতা ছিল অমিয়র। এখন আর সংবাদ নয়—একেবারে রক্তে-মাংসে আবির্ভাব ঘটছে।

তবু মনে সে চাঞ্চল্য জাগছে না দেহে সে সাড়া নেই। ফুল কটাও আনতে যেতে যেন বিরাট আলস্য পেয়ে বসেছে।

সুশীল বলে, এক কাজ করলে ভাল হয়—টাকা খানেক খরচ করলে একটা তোলা মানুষ পাওয়া যাবে। সে সব করে দিয়ে যাবে যত রাত হোক আপনারা কি পিরিচ পেয়ালা ধুতে পারেন? আমি ত থাকব রান্না নিয়ে ব্যস্ত।

অমিয় বলে সেই ভাল।

বিনয় বলে, অবশ্য অমিয়র কানের কাছেই এসেই পিরিচ পেয়ালা কেন, যতক্ষণে তোর এ কাজ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ দরকার হলে শাড়ি সেমিজও ধুতে হবে আমাকে। আমি হচ্ছি বরকর্তা।

যা তবে যা এখান থেকে, হনুমান কলোনিতে গিয়ে একটা ডাইং অ্যাণ্ড ক্লিনিং খোল গে। অফিসে, বাড়িতে চিঠি লিখি দেব'খন—বিনয় সাডেন্‌লি একসপায়ার্ড!

তা দিস—আমার কোন ক্ষোভ নেই। মরবার আগে ভগবান যেন তোর মত ভবঘুরের একটা হিল্লে করে যেতে দেন।

ভবঘুরে কি আমি একা বিনয়—ইন ট্রু সেন্‌স?

একটু অপ্রতিভ হয়ে জবাব দেয় বিনয়। কেন আমার বাপ আছে, ভাই বোন আছে, সংসার রয়েছে—আমার অভাব কি! আমি তো হোটেলে খাইনে, তোর মতো রাস্তায় রাস্তায় রাত বারটা পর্যন্ত ঘুরিনে। ইন ট্রু সেন্‌স তুই-ও ভবঘুরে।

এযে কত বড় আস্ফালন, কত বড় আত্মপ্রবঞ্চনা তা অমিয় অনায়াসে বুঝতে পারে। বিনয়ের মুখখানায় এক অতি সকরুণ দীপ্তি। মোটরের বাইরের চাকচিক্য দেখে অনেক সময় হয়তো স্থির করা দুঃসাধ্য ভিতরের পিস্টনের মতন। এত দিন বাদে এবার যেন কী আঘাতে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়র হতে চলেছে অমিয়। সে ধরতে শিখেছে অসুস্থ যান্ত্রিক হৃদয় স্পন্দন। সে শুধু বলে, আমারও বাসা আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব, আমি কি বেওয়ারিশ কুকুর?

বিনয় টেনে এনে অমিয়কে কাছে বসায়। নারে, সে কথা বলিনি। তুই মিছিমিছি দুঃখ পাচ্ছিস। আমি বলি তুই একটা বিয়ে করে সংসারী হ। সত্যি তোর বিয়ে হলে যে আমার কি আনন্দ হবে!

অনেক অন্তরায় আছে—কিছু তুই জানিস, বাকিটা জানিস নে। তাই আজ আমি একান্ত মনে পাণ্টা প্রস্তাব করছি যে তুই-ই বিয়ে কর। দেখিস সে-বিয়েতে তোর সব চাইতে নচ্ছার বন্ধুই সুখী হবে।

দুজন একটু ঘন হয়ে বসে। গভীর কথা যখন উঠেছে, গভীর ভাবেই আলোচনা করা উচিৎ। ওরা অনেক কথাই অনেক সময় বলে, কিন্তু তার পৌনে পনের আনাই জলো-ইয়ার্কি, তাই এই সুযোগটা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে বিনয়।

জানিস তো আমার চাকরিটা কি ?

অমিয় হেসে বাধা দেয়, আমারটা বুঝি পারমানেন্ট ?

তা নয় তবু—বাক্যটা অসমাপ্ত রেখে বিনয় ফের নতুন একটা সংযোজন করে, সংসারে মা নেই, ভাইবোনগুলো এখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি, এদের পড়াশুনার খরচ একটা ছোট-খাটো বাহিনী পোষা। বাপ বুড়ো, সামান্য কটা পেন্সনের টাকা মাত্র—একা আমি কি করি বল ? দুবেলা খেটেও কুলোতে পারিনে।

তবে কি তুই কোনো দিন বিয়ে করবি নে ?

জানিনে—তবে অতসীটা যদি একটু দাঁড়াতে পারে, ছোটটা আই. এস.-সি. পাশ করে—আর মাঝখানের বেকার দুটোর একটা কিছু জোগাড় হয়ে যায়—

তখন ভেবে দেখবি ?

অমিয় মনশ্চক্ষে দেখে বিনয়ের পিতা শয্যাশায়ী হয়েছে আদালতী ব্যাধিতে। চাকরির তদ্বিরে কিউ দিতে দিতে মূর্ছিত হল একটি ভাই। অতসীর যাও বা জুটল তাতে তার একান্ত অপরিহার্য সাজসজ্জা, রুজ, পাউডার বজায় রেখে টিফিনের পয়সাও কুলোতে চায় না। তবু আশায় আশায় বিনয় সংগ্রাম করছে। একটার পর একটা কাটিয়ে উঠতে চাইছে তুফান। অমিয় হঠাৎ মাথায় হাত দেয় বিনয়ের। সে আশ্চর্যই হয়ে গেছে—না, না ওর তো চুল পাকেনি। অমিয় দিনের বেলা রাত কানা হয়েছে। যুবকের ভিতরে দেখেছে এক চিরকুমার বৃদ্ধ !

অমিয় সিগারেটের ছাই ঝেড়ে একটা জোর টান দেয়। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় খণ্ডাংশটা। টুকরোটা পড়ে গিয়ে একেবারে জানালার বাইরে।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চারিদিক পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। একটি পাখিও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু প্রচণ্ড উত্তাপ। বোধহয় গলে যাবে ঐ পাহাড়ের কালো পাথরগুলো। তবু তার ভিতরে দুটি ফণিমনসা, দুটি ঘোড়া নিমগাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে সতেজে। অমিয়র হৃদয়ে নতুন আলোক বিচ্ছুরণ ঘটে। অমনি শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে ঠিক অমনি কিন্তু স্নেহময়ী মৃত্তিকার প্রাণরস কোথায় ? ওরা দুজনেই তো মাতৃহারা।

জননী নইলে অন্তত জায়ার আস্বরস চাই। কিন্তু তা তো চলচ্চিত্রের মত ওদের জীবনে অলীক। পর্দায় ভেসে আসে, কিন্তু শেষে মুছে যায়—ওদের কখনো একান্ত করে ধরে রাখবে উপায় নেই। কোন অপারেটর যেন উন্মাদনা সৃষ্টি করেই গুটিয়ে নেয়। নায়িকার হাসিকান্না চালান হয়ে যায় ভিন্ন কোন দেশের বাজারে।

অমিয় এগিয়ে বিনয়ের হাত দুখানা চেপে ধরে। আশা করি তুই আর নতুন কোন প্রস্তাব করবি নে। তুই নিজে যখন অক্ষম, আর একজনকে শক্তিমান ঠাহর করিস নে।

বিনয় মনে মনে ভাবে, সে ঠিক অক্ষম ছিল না। মানুষ মাত্রই সময়ের দাস। দাস নয়—এযুগে হয়েছে ক্রীতদাস। তবু তার প্রবৃত্তি মরে না, মরেনা মানব সত্তা। নইলে সে কি করে একটি রাত্রির মধ্যে ভালবেসেছিল চণ্ডালিনী শিউলিকে? শিউলি দূর দিগন্তে সরে গেছে আজ কিন্তু—

যাক এই মাত্র সান্ত্বনা শিউলি দূর দিগন্তে সরে গেছে আজ। কিন্তু ভালবাসা শিখিয়ে দিয়ে গেছে বিনয়কে। হয়ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরুন তাকে সেদিন সে পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে পারেনি, শিউলি তা মনে রাখেনি। সে দীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, নিজে অন্তরালে সরে গিয়ে। কিসের দীপ জ্বলছে বিনয়ের মনে? মৃতের? না—প্রেমের, অভিনন্দের, প্রতীক্ষার!

ছিঃ ছিঃ হাত ছাড় অমিয়। আমি আর প্রস্তাব করব না। শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাই, তোর চাকরি ছাড়া অন্য কি বাধা আছে?

আজ বলব না—আর একদিন শুনিস।

কেন আজ শুনলে দোষ কি? এমন পরিবেশ তো রোজ হয়না।

নারে, আমি তা এখন কিছুতেই বলতে পারব না। আমার মাথায় টেনসন সইবে না। আমাকে আর পাগল করিস নে।

অমিয়র মুখে একি বেদনার ছায়া। একি উক্তি! বিনয় চেয়ে থাকে। ইচ্ছে থাকলেও ঔৎসুক্যের অর্গল জোর করে বন্ধ করে।

আমার অনেক অন্তরায় আছে বিনয়, অনেক বাধা। চল স্নান করতে চল এখন। হাঁ করে থাকলে পেটের খিদে যাবে না। আজ ইদারায়ই চল, জলটা বেশ ঠাণ্ডা। এই তেল এই গামছা এই কাপড়। গামছা কাপড় বিনয়ের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে অমিয় হেসে ওঠে। দেখ একটু আয়নার দিকে চেয়ে লাল গামছাখানায় তোকে কি সুন্দর মানিয়েছে!

এই মেঘ, এই রোদ—বড় ভাল লাগে বিনয়ের কাছে প্রিয় বন্ধুর ব্যবহারে।

ওরা অনেকক্ষণ ধরে ইঁদারায় জল তুলে স্নান করে। খোলামেলা জায়গা একটু লজ্জা লজ্জা করলেও শেষ পর্যন্ত তা কেটে যায়। ইঁদারাটা বেশ বড় এবং একটু বাইরের দিকে। এ ছাড়া আশপাশের যাদের জলাভাব তারা টের পেয়েছে যে এখানে কোন কলহপ্রিয় মেয়ে ভাড়াটিনি আসেনি। এসেছে দুজন উড়নচণ্ডীবাবু, তারা মোটেই আত্মকেন্দ্রিক নয়।

একজন জিজ্ঞাসা করে কতদিন থাকবেন হুজুর?

বিনয় বলে কেন?

আপনারা বড় ভাল লোক।

ওরা দুজনে আশ্চর্য হয়ে যায়। ভাল হলেও এমন মুখের ওপর কেউ যে শুনিয়ে দিতে পারে তা ওদের জানা ছিল না। লোকটা কি ঠাট্টা করল? না তা নয়। ওর মুখে সরল ভক্তির আভা। ও এই ইঁদারাটার ঐতিহাসিক একটা কাহিনী বলে যায়। এ মুঘল বংশের রক্তাক্ত কাহিনী নয়—তবু জলন্ত হয়ে রয়েছে ওর কাছে।

বিনয় ও অমিয় কান পেতে থাকে।

এক মেমসাহেব এসেছিলেন এখানে, তাঁর নাকি বড় ফুলের শখ ছিল। তিনি একখানা সুন্দর বাগান করেছিলেন এই ইঁদারাটার চারিদিকে খোলা জায়গাটায়। লাল গোলাপ, শ্বেত রজনীগন্ধা, পিংক ডালিয়া ফুটত আরো অজস্র রকম ফুল। চলমান পথিকরা একবার চোখ না ফিরিয়ে পারত না। এটা ছিল নাকি এ শহরের ফুলের রানী মহল।

ওদের এক বালতি জল নেওয়ার বিনিময়ে দু বালতি ঢালতে হত বাগানে। ছেলে বুড়ো নির্বিশেষে।

মেমসাহেবও নাকি ভাল লোক ছিলেন ঠিক ওদের দুটি বন্ধুর মত। তিনি নাকি কোন আপত্তি জানান নি এই জল নিতে।

কিন্তু একদিন ওর একটি ছেলে নাকি পড়ে গিয়েছিল ইঁদারায়। ছোট ছেলে আর উঠতে পারেনি।

এ আর কিছু নয় বৃদ্ধের অদৃষ্ট—।

কিন্তু মেমসাহেব বড় দয়ালু ছিলেন। সব চেয়ে সেরা ফুলগুলো মৃতপুত্রের জন্য শ্মশানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর একশ টাকার একখানা নোট

বৃদ্ধ আবার বলে, আপনারা বড্ড ভাল লোক।

অমিয় বলে, বুঝলাম, তুমি কি আর বলতে চাও?

হ্যাঁ সরকার চারটি দানা চাই খেতে।

বেশ তো। ঐ বারান্দায় গিয়ে বসো।

মানুষটা ইতস্তত করে। কোন দুঃসাহসে ও যাবে বাংলোটার কাছে।

কতদিন তোমার ছেলে মারা গেছে? অমন করছ কেন? যাও ছায়ায় গিয়ে বসো।

প্রায় বিশ বছর লেড়কা মারা গেছে। ও এখানেই। ও এখানেই দাঁড়াবে যতক্ষণ না বাবুদের স্নান সারা হয়।

অনেক বলা কওয়ার পর বুড়ো এগিয়ে যায়—কিন্তু বাংলোর কাছে ঘেঁসেনা।

এতদিন ধরে ওর অবস্থা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে একস্থানে, তুই কি ভাবতে পারিস বিনয়? প্রায় বিশ বছর।

পারব না কেন এইতো সারা পৃথিবীর ফুলের ইতিহাস। মিলিয়ে দেখলে তোর আমার সকলের। কেন আমরা প্রশংসা করি আমাদের বস্‌কে—মানে ওর কথায় বললে বলতে হয় পুষ্পবিলাসিনী মেমসাহেবকে। ইতিহাস তো তাদের কথা নিয়েই স্মরণীয় হয়ে থাকবে কিন্তু চিরকাল এ চলবে না।

অমিয় বিস্মিত হয়ে তাকায় বিনয়ের দিকে। যেন একটা নতুন ঘোষণা শুনছে।

ওরা নিজেদের খাওয়ার পূর্বে অনাহুতকে খাইয়ে দেয়।

আর কদিন থাকবেন?

তা ওরা জানে না। সমুখে একটা মহাকাব্যের আভাস দেখা যাচ্ছে! নায়কনায়িকা আসবেন, হাসি অশ্রুর মিলন বিয়োগের পঞ্চমাঙ্ক শেষ হবে, তারপর মহাপ্রস্থান। সে কথা আজ আর বলা যায় না। তবে এই মাত্র অমিয় বলতে পারে যে, হে অচ্ছুৎ তুমি মাঝে মাঝে এসো, স্মরণ করিয়ে দিয়ে যেও কুসুমের ইতিবৃত্ত।

তেইশ

খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যায় অল্প সময়ের মধ্যে। ভাতে ভাত না হয়ে বরঞ্চ হয়েছে যথেষ্ট আয়োজন। এদের মনের পুষ্টি বিধান করা হয়ত সুশীলের আয়ত্তে নয়, কিন্তু এদের দেহের প্রতি তার অসামান্য দৃষ্টি। নইলে এত বেলায় এত সব রান্না হতে পারে না।

বিনয় জিজ্ঞাসা করে, জলখাবারও কি তৈরি করে ফেলেছ?

সুশীল হেসে ফেলে। যত সহজ ভাবছেন তত সহজ নয়। অনেক খুঁটিনাটি আছে চপ, কাটলেট তৈরি করতে। মালমশলাও তো সব আনা হয়নি।

বলো কি, এখন আবার ছুটতে হবে বাজারে? বড্ড ঝামেলায় পড়া গেল তো।

আমি থাকতে আপনারা যাবেন কেন? একটা লোক ঠিক করতে এখন তো আমিই যাব। আমার এ বেলার ঝামেলা তো একটু বাদেই মিটবে।

বিনয় স্বস্তি বোধ করে। তাই মিটুক, তুমি যাও।

দুজন মুখহাত ধুয়ে শয্যায় এসে উপবেশন করে। এরপর সিগারেট, তারপর কিছু নেই। কেবল সুদীর্ঘ দ্বিপ্রহর। হয়ত দু একটা দমকা জলন্ত হাওয়া। প্রায় লুর সামিল। জানালা কপাট খোলা যাবে না। এ একরকম হাজত বাস। শুধু বসে বসে জলো। রাজা মহারাজার সঙ্গে প্রাইভেট সেক্রেটারী থাকে কি জন্য, যাতে তার কোনো অসুবিধা না হয়। কিন্তু তোকে সঙ্গে এনে আমার কোনো লাভ হয়নি বিনয়। একখানা খবরের কাগজের পর্যন্ত তুই বন্দোবস্ত করতে পারিস নি। অন্তত একখানা ইংলিশ জারনাল।

ইউনিভারসিটির সারটিফিকেটখানা নিয়ে বেরুবার পর, আর কি তুই কিছু পড়ে দেখেছিস? তোর প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে আমি কি কিছু জানিনে? ইংলিশ জারনাল পেলে দেখতিস মেমসাহেবদের নেকেড় বার্স্ট, আর খবরের কাগজ পেলে খুব জোর সিনেমার বিজ্ঞাপন।

আর অতিরিক্ত থাকে কি?

থাকে রে অনেক কথা থাকে। ধৈর্য ধরে খুঁজে পেতে পড়তে হয়। এই পড়াশুনার রুচি এবং নিষ্ঠা আমাদের না থাকায় যত রাবিশ মালের আমদানি।

যা বলেছিস। তবে আরো একটা সত্যি কথা আছে। ছোটবেলা থেকে এখন আর আমাদের অধ্যয়নং তপঃ নয়—চাকরি, কেরানিগিরি। সেই মাফিক একটু তৈরি হলে আর কথা নেই। আমরা হচ্ছি চাণক্যের কথায় লম্ব সাট পটাবৃত…।

বিনয় একটু হাসে।

বড্ড যে হাসলি? এখনকার ছেলেমেয়ে কে না ঐ কবিতার আওতায় পড়ে? একেই বলে শাশ্বতকালের কবিতা। অন্তত আমি বলি।

বিনয় আবার হাসে।

তোর বুঝি বিশ্বাস হল না?

কেন হবে না? তবে ষোল আনা সত্য না হলেও আংশিক সত্য। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে। তোর কি মনে আছে হিরুকে—যাকে ক্লাসের সব্বাই ডাকত গোমুখখু বলে, যার বাবা ছিলেন একজন জাঁদরেল আই. ই. এস.?

খুব মনে আছে। একখানা সরু বাঁশের ডগায় একজোড়া দামি আমেরিকান ফ্রেমের চশমা। উ হাউ লাভলি হি ওয়াজ, তাকে কি ভোলা যায়। অমিতা সেন তো তার বিরুদ্ধে একদিন একটা মানহানির মামলা জুড়ে দেওয়ার জোগাড়। সে ছিল শান্ত ঘরোয়া মেয়ে। বাপ মা আদেশ না দিলে সে নাকি প্রেম করবে না। এমন একটি মেয়েকে গোমুখখু নাকি চোখ মেরেছে।

বিনয় হো হো করে হেসে ফেটে পড়ে। সে নাকি একটা নামকরা কলেজের বাংলার প্রফেসার। শুধু তাই নয়, হেড অফ দি ডিপার্টমেণ্ট।

হবে না কেন, মামার জোর।

বিনয় বাধা দেয়। যদিও আমি হিরুর বিপক্ষ তবু এক্ষেত্রে কিছুতেই তার মামা বেচারিকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না। তোরও তো উচিৎ নয়। বল যে, বাবার জোর।

এবার অমিয় হাসি চাপতে পারে না।

সেই হিরু নাকি একখানা বই লিখেছে।

কিসের বই? নাম কি—নিশ্চয়ই অমিতার প্রেম।

নারে একখানা সমালোচনার বই। নামতো ঠিক মনে পড়ছে না—হয়তো বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা কিংবা অমনি একটা কিছু।

বেশ করেছে গোমুখখুটা বেশ করেছে। এ না হলে আমাদের মত ছাত্তর তৈরি হবে কী করে!

তারপর শোন। বই একখানা উপহার দিতে গেছে বুড়ো সনাতন বাড়ুজ্যেকে—সেই যে আমাদের কলেজের সিনিয়র অধ্যাপক ছিলেন বাংলার। স্যার আ-আ-আমি একখানা বই লিখেছি। বেশ ভালই তো, বসো বসো বড় সুখী হলাম। কি নাম দিয়েছ? হিরু নামটা বলল বইখানার।

অমিয় বলে, দাঁড়া একটা সিগারেট ধরিয়ে নি। খুব জমিয়েছিস যা হক।

বুড়োর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল নামটা শুনে। বাবা ওটা তো ইতিকথা নয় সাহিত্যের ইতিহাস। নামটা পালটে দাও। স্যা-স্যা-স্যার বইটা যে ছা-ছাপা হয়ে গেছে। চ-চ-চ-চর্যা পদ থেকে ব-ব-ব-বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত আলোচনা করেছি। আর প্রকাশক বললেন যে বে-বে-বেশ মিষ্টি হয়। উপহারেও চলে। এই ছেলেমেয়ের বিয়েতে। সনাতন বাড়ুজ্যে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলেন হিরুর দিকে। তারপর একটা বর্মা চুরুট ধরালেন। ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে ঢাকা পড়ে গেলেন বৃদ্ধ পণ্ডিত। আমি ও হিরু বেরিয়ে এলাম।

অমিয় জিজ্ঞাসা করে, তুই বেরিয়ে এসে কিছু বললি নে?

বারে, হিরু বই লিখেছে আমি কি কিছু না বলে পারি? না, বেচারা

চিরদিনই আমায় শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছে। সেই আমার মতামত চাইলে। ঠিক একেবারে পাঠশালার ছাত্তরের মত নরম হয়ে।

কী বললি?

বললাম যে তুই মন খারাপ করিস নে। ও সব ওল্ড ফুল। ইতিকথা জুড়ে দিয়ে নামটা খুব ক্যাচি হয়েছে, আজকাল কেউ জাতিভেদ মানে না। বাসরঘরেও রামপ্রসাদী চলছে। তিনখানা চরিতামৃত উপহার পেয়েছে সুমিতা বিয়েতে রাজি হওয়া মাত্র। এরপর পাকা দেখা বৌভাত তো রয়েছে। তোর হাজার কপি দুম্‌দাম্‌ ক'রে কেটে যাবে।

কী বলল গবেটটা।

খুশি হয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল। বললাম ক্ষণিক সোম কি যে একখানা উপন্যাসের নাম দিয়েছেন—সজনেলতার ইতিকথা—ওখানা হট কেকের মত চালু হয়েই তোদের মাথা খেয়েছে। যাক তোদের উচিৎ ফসিলদের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে বর্তমান সাহিত্য নিয়ে লেখা। আমি আর কিছু না পড়লেও সজনেলতার ইতিকথা অদ্ভুত রোমান্টিক্ যেন ঠাকুরপোর ঝুলি পড়ছি, আরখানা পড়েছি চৈতন্যচরিতামৃৎ সম্বন্ধে। বিয়ের পর সুমিতা মন্তব্য করেছে—দি বুক। বেরুতে পারলেন না বাজারে, এমন গ্রাহকের ভিড়। গেটের ভিতর হাতাহাতি—রাতারাতি সংস্করণ একটার পর একটা।

একেবারে আজগুবি অবিশ্বাস্য। উত্তেজিত অমিয় মন্তব্য করে। বল বল বলে যা ভুতুড়ে গল্প হলেও বেশ লাগছে।

বিনয় বলে, থাম তুই। লেখাপড়ার ধার ধারিস নে, বইয়ের বিষয় তুই জানিস কি? যার একটু চোখ আছে তার ভাল বই খুঁজে বার করতে কষ্ট হয় না। বুঝলি এটা বিজ্ঞাপনের যুগ।

তোর সাজেসন শুনে হিরু কি বললে?

যে চর্যাপদ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত আলোচনা করেছে সে যেন আত্মসম্মানে ঘা খেল, তো-তো-করতে করতে কেটে পড়ল। আ-আ-আ-আমি—শোন হিরু শোন আর শোনে কে?

অমিয় ভাল করে গুছিয়ে বসে বিছানায়। পোড়া সিগারেটটা চেপে দেয় অ্যাশট্রেতে। ধোঁয়ায় ভরে যায় ওটার মুখ। বিনয় এতক্ষণ তুই কটাক্ষ করলি কাকে?

কারুকে নয়। হিরুর ঘটনায় আমি আই উইটনেস্‌—বাকি যা তা ট্রামে বাসে শোনা। মোদ্দা কথা যে যাকে পারে তাকে ডাউন দিচ্ছে।

সে না হয় বুঝলাম। তুই আমাকে ডাউন দিলি?

কি করে?

অনেকগুলো কনট্রাডিকটারি কথার গুল্ মেরে। এ যুগের বড়দের ঐ নীতি। আমি তো দাসানুদাস শুধু পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি। ভবিষ্যতে নোবেল প্রাইজটা পাওয়ার জন্য এখন থেকে তামিল দিচ্ছি। চার্চিলের পর আমিই প্রথম ক্যানডিডেট। তুই যদি—

আর কিছু বলা হয় না। টুং টুং কাচের চুড়ির আওয়াজ যায় ওদের কানে। কে এল? ওরা দুজন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। খুলে ফেলে একটা জানালা। বেশবাসের দিকে চেয়ে দেখে ভাল করে।

বিনয় বলে, বেলা গেছে গল্পে গল্পে। ফুল আনা হল না। ফুলদানি দুটো খালি পড়ে আছে। তুই তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ে একটু ফিটফাট হয়ে নে।

আমি এগিয়ে যাই। বিনয় ওর মধ্যেই নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায় অভ্যর্থনা জানাতে।

সুমুখের দোর সে খুলে কারুকে না দেখে অন্দর মহলে এসে প্রবেশ করে। এখানেও তো ওদের কারুকে দেখা যাচ্ছে না। বিনয় আবার এসে ঘরে ঢোকে।

অমিয় জিজ্ঞাসা করে, কিরে?

কিচ্ছু না। হিন্দুস্থানী ঝিটা বাসন মাজছে।

সেও আজ নতুন এল—তাকে ত তো অভ্যর্থনা জানান উচিৎ। এক চোখো হরিণের মত ফিরে আসা কি ভাল হল? ঈশ্বর কি তা সইবেন?

তুই এগিয়ে যা না। দিদ্যি তো জামাই সেজে বসে রয়েছিল।

দুঃখ হলে তুই সাজনা ভাই। আমি এগিয়ে গিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছি। আমার আর লোভ নেই।

যদি একবার চোখে দেখতিস তা হলে আর মুখে এ ব্রহ্মচর্যের বাক্য থাকবে না। আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বরের পিঁড়িতে উঠে বসতিস গিয়ে। একেবারে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় অমিয়।

দিক্—তুই অন্ধ হয়ে যা।

কিন্তু অমন রূপের দিকে চাইলে কেউ অন্ধ হয় না। যেন কুমারসম্ভবের গৌরীকে দেখছি। সমস্ত কামনা বাসনার উর্ধ্বে তার গতি। দোষের মধ্যে একটি দোষ সে ও ঝি হয়ে এখানে এসেছে।

আমি না হয় তোকে ব্রহ্মতেজে চাকর করে দিচ্ছি—এখন তো হল? চুপ কর, আর কপচাস নে মাইরি।

সত্যি বলছি অমিয় মিথ্যা নয়।

ওঃ আমাকে তুই এদেশ ছাড়া করবি দেখছি। দুপুর বেলায় ভূতুড়ে গল্পে যা হক একটা রস ছিল, কিন্তু তখন আস্কারা দেওয়ার ফলে এখন তুই একেবারে মাথায় উঠতে চাইছিস। আমারও তো ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

তবু বলছি অমিয় একটিবার দেখে আয়।

না, না আমার রুচি তোর মত নয় রে বিনয়। অমিয় দোর খুলে সমুখের বারান্দায় বেরিয়ে যেতে চায়।

বিনয় তার হাত চেপে ধরে। তবে চল ফুল আনতে যাই।

তাতেও আমার রুচি নেই ভাই, যা। আমি বরঞ্চ একটু চুপচাপ বসে থাকি, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

সেকি হয়? তুইও চল, তোকে ছেড়ে আমি কিছুতেই যাব না। ত্রুটি বিচ্যুতি হলে আমি একাই শুধু লজ্জা পাবো না। ফুলের কথা তুই-ই তুলেছিস, ফুলদানি ও তোর ইচ্ছায়ই আনা।

অগত্যা অমিয় ওঠে। বিনয়ের সঙ্গে চলতে থাকে যন্ত্রের মত।

সূর্যের আঁচ ঢিমিয়ে এসেছে, কিন্তু গন গন করছে কয়লার আঁচ। তার মায়ের মুখের রঙের সঙ্গে মিলে গেছে কানের পলা জোড়ার রঙ। বোতলটার অর্ধেক পর্যন্ত তেমনি কেরসিন দাঁড়িয়ে।

আজ এত আয়োজন কেন রান্নার? বালক অমিয় কিছু বোঝে না। এত রান্নাই যদি হবে এখনো কেন চড়াচ্ছেন না ভাতের হাঁড়িটা ওর মা? মা কি রাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়বেন ঐ আগুনে? বালকের কেমন যেন একটা চাপা আশঙ্কা হয়। ওর মনটা কেমন যেন গুমরে গুমরে ওঠে বোবা কান্নার মত।

মা!

তোর বৌও একদিন জ্বালায় জ্বালায় ঝালাপালা হয়ে ঐ কেরসিন মেখে জ্বলে মরবে উনানের আঁচে। তখন মজাটা বুঝবি।

অমিয় কোন জবাব দেয় না। বিছানায় গিয়ে সটান মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ বাদে অমিয়র ডাক পড়ে। খোকা, খোকা।

অমিয় জবাব দিতে পারে না। ভাষা হারিয়ে গেছে অভিমানে।

খোকা! খোকা!

বাইরে কালো কুকুরটা, ভিতরে হুলো বিড়ালটা—তাদের দয়ায় সমস্ত ফেলে রেখে অমিয়র মা বড় ঘরে চলে আসেন, সস্নেহে বালকের মুখ মুছিয়ে কোলে তুলে নেন।

তোমার কি খিদে পেয়েছে বাবা?

না।

তবে কি হয়েছে ?

তুমি আমায় কেবল কষ্ট দাও, আমি একদিন না বলে কয়ে ঐ ওপর পাহাড়ে চলে যাব। আমার আর খোঁজ পাবে না তুমি। আমাকে ভাল্লুকে নিয়ে যাবে।

মা এই দুগ্ধপোষ্য বালকের কাছেও ক্ষমা চান। সে মর্মস্পর্শী দৃশ্য। তুমি আমাকে মাপ করো, বাবা আমি আর কখনো তোমায় কিছু বলব না, ষাট তোমায় কেন নিয়ে যাবে ভাল্লুকে ? তিনি আদর করতে থাকেন অমিয়কে।

আচ্ছা আমি আর যাব না ওপর পাহাড়ে। তুমি কিন্তু আর কক্ষনো রাগ করতে পারবে না আমাকে ?

মা সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন।

গভীর রাত্রে মা বলেন, আমার কোলে এসো বাবা। চুপটি করে থাকো। চুপ।

অমিয় ঘুমের মধ্যে গলা জড়িয়ে ধরে মার। কেমন যেন স্বপ্ন দেখে সব—কেমন যেন আবছা আবছা পথ-ঘাট, গাছ-পালা জঙ্গল। উঁচু নিচু চড়াই উৎরাই। মায়ের পায়ের শব্দ, কাপড় চোপড়ের খস-খসানি।

এবার যেন গরুর গাড়ির কাৎরানি কানে আসে।

অমিয় চোখ মেলতে চেষ্টা করে। কী যে ঘুম, চোখ খোলা যায় না।

উঁচু নিচুর টক্কর এখন, তবু ঘুম ভাঙেনা।

বিনয় জিজ্ঞাসা করে, এ ফুলগুলো কি পছন্দ হবে ? সঙ্গে থেকেও তুই ত কিছুই দেখলিনে ? দাম নিল বার আনা।

অমিয় কী লক্ষ্য করবে ! সে যেন তখনও মায়ের কোলের দোলায় দুলেদুলে ঘুমাচ্ছে। এগিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি পাহাড়ী মহুয়ার টাঁরের ভিতর দিয়ে।

দু একবার ঘুম ভেঙে অমিয় জিজ্ঞাসা করেছে, কোথায় আমরা চলেছি মা ?

কোথাও না। তুমি ঘুমোও চুপটি করে।

অতন্দ্র মার কোলে ঘুমন্ত অমিয় আবার এগিয়ে চলে। কানে আসে গরুর গলায় ঘণ্টার মিষ্টি বোল।···

ওরা যখন এসে গরুর গাড়ি থেকে নামে, তখন কত রাত ঠিক বলা যায় না। সমুখে এক একটা ছোট্ট স্টেশন আর দিগদিগন্ত ঢাকা অন্ধকার।

এরা যখন বাংলোর সিঁড়িতে এসে পা দিয়েছে তখন সূর্য অস্ত গেছে। এখানেও সেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু কোথায় আজ মা ?

কোন স্টেশনের সামান্যতম নির্ভরও তো দেখা যাচ্ছে না এখানে।

কোথায়ই বা নিশানী আলো।

চব্বিশ

সুশীলের উৎসাহের অভাব নেই। সে আলো জালিয়েছে দুটো বাংলোতেই। টেবিল সাজিয়েছে, পর্দা টানিয়েছে, পা-পোশ পেতেছে ঠিকঠাক মত। ধূপকাঠির গন্ধেও মদির হয়েছে ঘরগুলো। একটা বিরাট না হলেও বিশেষ সমারোহের ছাপ পড়েছে সর্বত্র। কার্পেট নেই, কিন্তু রঙিন চটে চমৎকার চটক ধরেছে। আরাম লাগছে পায়ের নিচে। ওরা ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে।

রান্না ঘরে টুং-টাং চুড়ির জলতরঙ্গ।

বড় ভাল লাগে বিনয়ের কানে। সে কেন যেন ভাবে, এই জন্যই কি সুশীলের এত উৎসাহ?

বিনয় ফুলগুলো সাজিয়ে রাখে ফুলদানিতে। ছোট বড় যেমনটি করে সাজান দরকার তাই করে। একটা বড় ফুল দেয় মধ্যমণির মত।

দেখ রে অমিয় ঠিক যেন হাসছে।

ওঁরা যে আসছেন!

কই? কোথায়? বিনয় যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

অমিয় একটু ঘুরিয়ে ফের বলে, আসবেনই তো তাই বলছি!

হ্যাঁ এক্ষুনি এসে পড়বেন। কাল ঠিক এমনি সময় এসে পড়েছিলেন। চল আমরা গিয়ে সমুখের বারান্দায় বসি।

বিনয়ের পিছনে পিছনে অমিয় ছায়ামূর্তির মত এসে বসে। ফুলদানিতে ফুল হসে, ধূপদানিতে ধূপকাঠি পোড়ে। সেই দিকেই যেন অমিয় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে।

কিন্তু দেখা যায় ট্রেন এসে থামল ছোট ডি. এইচ. আর-এর গাড়ি। ই. আই. আর-এর তুলনায় খেলনা। গরুর গাড়ি থেকে মার কোলে চড়ে অমিয় ট্রেনে গিয়ে উঠল।

বাইরে অন্ধকার, ভিতরে বিদ্যুতের আলো। সবই অমিয়র কাছে নতুন, কেমন ভয় ভয়—তবু ভাল! সে দোলায় আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আবার ঘুম ভাঙে। কোথায় চলেছি মা?

কতদূর পাড়ি দিয়ে কোথায় এসে গাড়ি থামবে তা অমিয় জানে না। সে আবার জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাব আমরা?

মা অস্ফুট স্বরে বলেন যমের বাড়ি। তাঁর মুখে চোখে আবার সেই থম থমে ভাব। যেন মেঘে ঢাকা কাল বোশেখী।

মামা বাড়ি? অমিয় একটু বিস্মিত হয়। কারণ এ আত্মীয় বাড়িটার কোন রসঘন স্মৃতি নেই তার। কোন আদর আপ্যায়ন, আতিথ্যের। সে কী যেন জিজ্ঞাসা করবে ভাবে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে আবার।

ট্রেন চলে এঁকে-বেঁকে।

বিনয়ের সত্তাটা এই বাংলোর গণ্ডী বেষ্টন করেই ঘোরে বার বার সে পথের দিকে চেয়ে দেখে। কান তার পাতা রয়েছে আরও দূরে বোধ হয়। রান্না ঘরে চুড়ির আওয়াজ মন্থর হয়ে এসেছে। বিনয় উঠে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

অমিয় ঘুম ভেঙে শোনে, মা বলছেন, মামা আমি জানি তুমি শিক্ষিত লোক, তুমি সব বুঝে আশ্রয় দেবে আমাকে।

আমি তোমার মামা নই এবং তুমিও তো অশিক্ষিত ছিলে না। থার্ড ক্লাশ অবধি পড়েছ। তাছাড়া আমিও কি তোমায় কম উপদেশ নির্দেশ দিয়েছি।

একটা ভুল করেছি।

আগুনে হাত দিলে অবুঝ ছেলেরও হাত পোড়ে, কেন, তুমি তোমার বাবার কাছে যাও না জলপাইগুড়ি। আমি খরচ দিয়ে দিচ্ছি। দরকার হলে একজন চলনদারও দেবোখন।

তবু আমি সেখানে যেতে পারব না—যেতে পারব না।

কেন?

তুমিই আশ্চর্য করে দিয়েছ! একজন বিদ্বান ব্যক্তির যদি এই উক্তি হয়, অতি সাধারণ একজন মুদী দোকানদার কী বলবে? তুমি কত বড় একটা ইস্কুলের হেড মাস্টার। কিশোর ছেলে মেয়েরা বার বার মুহূর্তে মুহূর্তে দোষ ক্রটি করবে, তা বলে কি তাদের এমন শাসন করবে যে তারা আর শিড়দাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে না পারে? তুমি আমার আপন মামা নও, কিন্তু তার অধিক তোমাকে জানি বলেই একথা বলেছি। তুমিও যে কম স্নেহের চোখে দেখতে তা তো স্বপ্নেও কল্পনা করিনি।

এখন তুমি আর কিশোরী নও, তাই যে অনুকম্পা তুমি আশা করছ তা তোমার জন্য নয়। পনের ও পঁচিশ এক বয়স নয়, বুঝলে? তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। অনেক খেটেখুটে আমি যে একটু মানমর্যাদা পুঁজি করেছি তা একদিনে পুড়িয়ে দিও না। হয়তো এক্ষুনি কেউ এসে পড়বে।

কতগুলো মোটা মোটা বই ছিল র‍্যাকে। মামা সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। মার কোলে অমিয়। সে ভাবে, ওর একখানা কি ছুঁড়ে মারবে ছুরির মত?

মা বলেন এখন সত্যিই আমি আর কিশোরী নই, কিন্তু তখন তো

ছিলাম। আর তুমি যে বলছ মামা অনুকম্পা নেওয়ার কি দেওয়ার কি কোন বয়স আছে? যখনও মানুষ অভাবে পড়ে, হাতজোড় করে এসে বন্ধুর দুয়ারে দাঁড়ায়। তুমি শিক্ষক মহৎ, বাবা তোমার তুলনায় কত নগন্য।

কিন্তু শিক্ষকের একটা কর্তব্য আছে, মুহূর্তেরও একটা আদর্শ আছে।

এ কেউ অস্বীকার করে না,—সেই ভরসায়ই তো ওকুল ছেড়ে একূলে এলাম। তুমি আর মাঝনদীতে ঠেলে দিও না। ওপারে আমার আর কিছু নেই শুধু ধস।

একটু ভেবে মামা বললেন, সমাজের কাছে আমার একটা দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্বের গুরুত্ব আমি দিন রাত উপলব্ধি করি। আমি সমাজের কল্যাণ ছাড়া কিছু ভাবতেই পারিনে।

আমি তা ভাল করেই জানি মামা—সত্য, প্রেম, পবিত্রতায় তোমার আস্থা। তোমার আস্থা পরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ায়, তুমি হচ্ছ ঝড় সমুদ্রে লাইট পোস্ট।

তাই তো তোমার চোখের জলে বিচলিত হতে পারছি নে—স্ত্রীলোকের মায়া কান্নায় আদর্শ ছাড়া যায় না।

কি বললে তুমি, কি বললে? এ তোমার আদর্শ নয় স্বার্থ। আমার চোখের জল হল মায়া কান্না। মায়ের বুকের মধ্যটা কেমন করে ওঠে যেন অমিয় কোলে বসে তা টের পায়। অক্ষম আক্রোশে তার সারা শরীরটা জ্বলতে থাকে।

সে বলে, এখান থেকে চল মা।

মা উঠে দাঁড়াল, যাবার সময় বলে যান, বাবা আমাদের অনেক স্বার্থক্ষুন্ন করে তোমাকে মানুষ করেছিলেন দেখলাম তুমি মানুষ হয়েছ। সামান্য মুদি দোকানদারের গচ্ছিত তহবিল তছরূপ করেছ। তোমার ভাল হবে না।

না হক, তা বলে তোমাকে জায়গা দিতে পারবো না।।

ঘর ছেড়ে অমিয়র হাত ধরে মা আবার বেরিয়ে আসেন নিরালম্ব আকাশের তলে। মুখখানার দিকে চেয়ে মনে হয় যেন অমিয় ঠিক মাকে চিনতে পারছে না। হাতের কাছে থেকেও যেন চলে গেছে বহু দূরে।

কোথায় যাব মা?

আবার পূর্বের উত্তর, যমের বাড়ি।

অমিয় চুপ করে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে।

আবার স্টেশন, আবার যাত্রীদের কলরব।

কিন্তু একান্ত নীরব আজকের এই বাংলোটা। বিনয় ঘুরছে তবু তার

পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বিনয় কি চায় যে অমিয় মরে যাক তবু সে ডাকবে না? অমিয় ঘুরে বসে। ধীরে ধীরে ডাকে, বিনয়!

কি?

ওরা যে এল না?

জানি নে।

আর ঠাট্টা করা কি আঘাত দেওয়া চলে না—বিনয়ের গলার স্বরে এমনি ভাবালু আর্দ্রতা। অমিয় ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে, এখন সময় আছে। মাত্র পৌনে আটটা। আর দু গ্লাস শরবত খাওয়া যাক। শেষে হয়তো ভাগে পাওয়া যাবে না। সুশীলের ডাক পড়ে।

কী জন্যে ডেকেছেন?

দু গ্লাস শরবত দাও না।

ভালই তো, বললে আরো আগে দিয়ে যেতে পারতাম। টেস্ট করে দেখুন কেমন হল?

ট্রের ওপর গ্লাস—গ্লাসের ওপর কাঁচের পিরিচের ঢাকনি। ঝক ঝক করছে। দুখানা প্লেটে কিছু খাবার। পর্দার ওপাশ থেকে দুখানা সুডৌল হাত এগিয়ে দিচ্ছে। সুশীল তা আবার ধরে ধরে রাখছে টেবিলের ওপর।

সবই একটু একটু চেখে দেখুন।

আয় বিনয় ব'স। সত্যি সুশীলের গুণ আছে। দেখছিস কত কি রেঁধেছে! অত কী ভাবছিস বল তো?

বিনয় খেতে খেতে জবাব দেয়, এত করে বলে গিয়ে না আসার কারণ কি? কিছুইত বুঝতে পারলাম না। একবার হনুমান কলোনিতে লোক পাঠাব নাকি?

ওরে ঐ-টে করিস নি। ধরে বেঁধে কিছু হয় না।

তুই দেখি হঠাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছিস!

একখানা কাটলেট চিবুতে চিবুতে অমিয় বলে, সত্যি সুশীল তোর হাতের বাহাদুরি আছে। আমি তারিফ না করে থাকতে পারছি নে।

বার বার আমাকে যে প্রশংসা করছেন তার ভাগীদার আর একজন আছে? দু'জন এক সময় জিজ্ঞাসা করে কে, কে?

সুশীল পর্দা সরিয়ে দেয়।

একটা অবিকল বাঙালী ঘরের মেয়ে। কিন্তু কপালে ক্ষতের দাগ। অনেক দিন শুকিয়ে গেছে।

কিন্তু অমিয়র মার ক্ষতচিহ্নটা তখনো শুকিয়ে যায় নি। শুধু রক্ত বন্ধ

হয়েছে। শোনা যায় প্ল্যাটফর্মের কোলাহল। এই জনসমুদ্রে যেন ভেসে চলেছে মা ও ছেলে। কোথায় যাবে তার কোন ঠিকানা জানা নেই।

বেলা হয়েছে খিদে পেয়েছে অমিয়র। নিত্যকার মত সে মুখ খুলে কিছু বলতে পারছে না। মাও তার দিকে চাইছেন না। অনির্দিষ্ট ভাবে হেঁটে চলেছেন। একটা ট্রেন এসে থামে। হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মায়ের সঙ্গে অমিয় দাঁড়িয়ে সব দেখে। সে বুঝতেই পারেনা মা কেন উঠছেন না।

সব দেখে। সে বুঝতেই পারে না মা কেন উঠছেন না।

বেল্ পড়ে। অমিয় মনে মনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, ইচ্ছা করে মায়ের হাত ধরে টানতে। মা চেয়ে থাকেন। ট্রেনটা চলে যায়। স্টেশনের কলরব কমে যায় ধীরে ধীরে, মা হাঁটতে থাকেন শহরের পথ ধরে।

আজ কত বড় এই বাংলো ছুটো, কত জায়গা অমিয়র কলকাতার ফ্লাটের ছুখানা ঘরে। কিন্তু সেই আশ্রয়প্রার্থিনী মা কোথায়? শূন্যস্থানগুলো শুধু খাঁ খাঁ করে কাঁদে। অমিয় ভাল করে টেবিলের লোভনীয় সামগ্রীগুলো খেতে পারে না।

বালক অমিয় যেন হাত পেতে সমুখে দাঁড়িয়ে।

ওকি বাবু হাত তুলে যে বসে রয়েছেন? মুখে বোধহয় ভাল লাগছে না।

তা নয় সুশীল, বড্ড কাঁকর ভাতে। দাঁত ভেঙে চোখে জল আসছে।

ভাত তো আপনি খাচ্ছেন না।

এই ভাল খাবার মুখে দিয়ে, ভাতের কথাই মনে হচ্ছে।

আমি তো বাবু কম চেষ্টা করিনে—কিন্তু সাদা কাঁকর সব সময় চেনা যায় না।

তুমি দুঃখ করো না, আমরাই বা কতটুকু চিনতে পেরেছি। ভালর সঙ্গে চিরদিনই মন্দ মিশে আসছে। আমাদের মত দু-একজন আছে বলে তবু কিছুটা রক্ষা। নইলে আজ পর্যন্ত একটা দাঁতও থাকত না মানুষের।

সুশীল কতকটা বোঝে, কতকটা না বুঝেই তাকে চুপ করে থাকতে হয়।

বিনয়ের কাছে এসব কথা প্রাধান্য লাভ করে না। তার কান রয়েছে টেবিল থেকে অনেক দূরে। বড় রাস্তার ওপর দিয়ে এখন একটা বিড়াল হেঁটে গেলেও বোধহয় সে টের পায়। কোন লঘু গতি তার অনুভূতিকে এখন এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

মায়ের হাত ধরে অমিয় আবার এগিয়ে চলে। এ টেবিল থেকে তো ক্ষুধার্ত বালককে কিছু দেওয়া সম্ভব নয়—এ কালের পূর্ণতা থেকে সে কালের নিঃস্বকে।

এখানে কি কোনো আশ্রম আছে? অনাথ আশ্রম?

থাকবে না কেন আপনি কি আশ্রয় চাইছেন? ধর্মশালার কথা বলছেন নাকি? ক'দিন থাকবেন, তারপর কোথায় যাবেন?

কোথাও যাবনা। চিরদিনের জন্যই থাকব। ধর্মশালার কথা বলছি নে, জিজ্ঞাসা করছি আশ্রমের কথা। অনাথ আশ্রম হলেই ভাল হয়।

তা একটা আছে বোধহয়। কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েরা—না, না আপনি একটু উত্তরে হেঁটে দেখুন। বেশি দূর নয়, সেখানে অনেক মেয়েই আছে আপনার মত। আমার ট্রেনের সময় হ'ল, নইলে দেখিয়ে দিতাম। হ্যাঁ এই পথটা ধরে সোজা যান। সূর্যের উত্তাপ যথেষ্ট বেড়েছে, ওদের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তবু মা অমিয়কে কোলে তুলে নেন।

মা তোমার কি জ্বর এসেছে? অমিয় কপালে হাত দেয়। বুকের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে মার দেহের উত্তাপ।

ম্যালেরিয়া প্রধান দেশ। অসম্ভব নয় হঠাৎ জ্বর আসা।

মা বলেন, না। বড্ড রোদ তুমি একটু হেঁটে চলো বাবা। ঐ তো দেখা যায় আশ্রম।

অমিয় কোল থেকে নেমে এগিয়ে চলে দ্বিগুণ উৎসাহে। মা এক্ষুনি চাইনে আমি খেতে।

সত্যই আশ্রম, মঠের ভিতর শোনা যাচ্ছে অপূর্ব এক ভজন, চারিদিকে পুষ্পবীথি। মঠের দুয়ারে দুটি অশোক শিশু বাড়ছে যেন পুত্র স্নেহে। যত কাছে ওরা এগিয়ে আসতে থাকে ততই স্পষ্ট হয় সংগীত।

কয়েকজন অতি সুচিক্কন গৈরিক বেশধারী যুবক সন্ন্যাসী মন্দির চত্বরে বসে। শাস্ত্র পাঠে মগ্ন। নিরাভরণী অমিয়র মাকে দেখে অকস্মাৎ তাদের যেন ধ্যান ভাঙে।

ওকে একটু জল দিন। বলেই অমিয়ের মা বসে পড়েন।

জল, শুষ্ক কণ্ঠে জল চায় অমিয়।

গৌরী এক গ্লাস জল এগিয়ে দেয় সুশীলের হাতে।

ওকি?

বাবু জল চাইলেন।

সত্যি? আমি তো শুনিনি।

জলের গ্লাস হাতে পেয়েই অমিয় ঢগ ঢগ করে খেয়ে ফেলে। আঃ।

ধূপ পোড়ে। ফুল হাসে। বিনয় তখনো চেয়ে রয়েছে পথের দিকে।

পঁচিশ

এখন আর কেউ আসবে না। দোকান পাট তুলতে পার বিনয়। রাত প্রায় বারটা। আজকার মত কার্নিভ্যাল শেষ।

সুশীল যেন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। স্বপ্ন দেখছিল গৌরীর। এই রুক্ষ দেহাতী মাটিতে যেন দেশি রাধা ঝুমকা। অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে হলেও বেশ ফিট্ ফাট্ মেয়ে। মশলা বেটে তার হাত দু'খানা-হলুদ রঙা হয়ে গেছে। তবু তার কাপড়-চোপড়ে চোপ ধরেনি।

কিন্তু এ রাধা ঝুমকা কার?

যে খরচ চালাতে পারবে তারই নিশ্চয়ই। কিন্তু সুশীলের তো একটি টাকাও চালাবার ক্ষমতা নেই। তার সমস্ত মাসটাই তো বিক্রি হয়ে রয়েছে বেকার দিনগুলোর দেনায়। গৌরী রাধা ঝুমকার মত দুলে দুলে কাজ করে। ওর মন ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে ওঠে।

আবার কি ঘুমিয়ে পড়লে সুশীল? গৌরীকে খাইয়ে দাও। ওকে তো অনেক দূরে যেতে হবে। কে এগিয়ে দিয়ে আসবে?

ও একাই যেতে পারবে।

না, না—তা হয় না। যে পথ-ঘাট তুমিও সঙ্গে যাবে।

গৌরী কি যেন সুশীলকে শিখিয়ে দেয়। সে বলে, কিন্তু আমি একা ফিরব কী করে?

তাহলে আমরা কেউ তোমার সঙ্গে যাবো। ফিরে এসে আমাদের খাওয়ার পাট শেষ হবে।

সুশীল ও গৌরী হেসে ওঠে। কোরাস গানের মতো শোনায়।

তা লাগবে না বাবু। ও বন-বিড়ালীর মতো একাই যেতে পারবে। হাজার হলেও এই দেশি মেয়ে তো। শুধু একটা মশাল চাই।

তবে তাড়াতাড়ি ওকে যেতে দাও। আচ্ছা যা হক বাপ, একটা টাকার লোভই বড় হল। একটিবার মেয়ের খোঁজ নিলে না। অমিয় মনে মনে ভাবে একথাই বা বলে লাভ কি। সেদিন তো সব নিজের কানেই শুনে এসেছে।

ক্ষিপ্র হস্তে বারান্দার সব গুছিয়ে ফেলে সুশীল। টেবিল ক্লথ, ফুলদানি, ধূপধারগুলো, সন্ত বিধবার বেশ ধারণ করে বারান্দাটা। অমিয় বিনয়ের মুখের দিকে চাইতে পারে না। যেন একটা রিক্তশ্রী, থম থম করছে। সে বারান্দা ছেড়ে উঠে যায়। ছোট বাংলোটার দিকে তার নজর পড়ে। সেখানেরও

উজ্জল স্মৃতি অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। দীপান্বিতা সমাপ্ত।

অমিয় অন্ধকারে পায়চারি করে।

এগিয়ে যায় সমুখের দিকে। কিন্তু যখন সে ঘুরে আসে পিছন দিকে—বর্তমান থেকে অতীতে। মঠের আঙিনায় তার পা পড়ে। তখন এমনি গভীর, রাত্রি, এমনি চারিদিকে আঁধারে ঢাকা। মঠের দীপান্বিতা নিভে গেছে।

ওরা মা ও ছেলে আশ্রয় পায়নি। কিন্তু একেবারেও আশ্রয়চ্যুতও হয়নি। একটা গোয়াল ছিল খালি সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়েছেন মা। জ্বর উঠেছে বেদম।

একজন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কি সন্ন্যাসে বিশ্বাসী?

জটিল প্রশ্ন থতমত খেয়ে যায় মা। তিনি অমিয়কে কাছে টেনে নিয়ে একটু যেন আঘ্রাণ করেন মাথার।

শান্ত কণ্ঠে সন্ন্যাসী আবার বলেন, সমস্ত বিষয় বাসনা ত্যাগ করে তবে এখানে আসতে হবে। ভোগ বাসনার বিকল্প সন্ন্যাস নয়। প্রভুর জীবন চরিত কি আপনি শ্রবণ করেছেন? চিকন গেরুয়া বাসখানি পিঠের ওপর থেকে একটু সরে গিয়েছিল, তিনি তা ভাল করে ছড়িয়ে দেন।

অদূরে মঠের ভিতর দেখা যায় কয়েকটি রূপসী অল্পবয়সী সন্ন্যাসিনী এক বলিষ্ঠ সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র-বিন্দুতে রেখে কী যেন শাস্ত্র হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে আলোচনা করছেন।

তবে ওঁরা কি সন্ন্যাসে বিশ্বাসী?

নিশ্চয়। দেখছেন না ওদের গেরুয়া বাস। ওরা প্রত্যেকেই প্রভুর পাদ-পীঠে প্রতিজ্ঞা করে এ পথে এসেছেন।

আমি তা পারব না। আমার ছেলে রয়েছে। উপোষ করে মরলেও মিথ্যাকথা আমি বলতে পারব না, ওঠ অমিয়, চল বাবা। কিন্তু তিনি টলতে টলতে পরিত্যক্ত গোয়াল ঘরটায় এসে লুটিয়ে পড়েন।

অমিয় কেঁদে ওঠে।

উঠুক—তার জন্য মঠের নিত্য নৈমিত্তিকদের সেবা, ভজন সন্ধ্যারতিতে কোনো বিঘ্ন ঘটে না। দেবতা অর্চনা, অর্ঘ্য, ভোগে মসগুল। তিনি আনন্দে নিমিলীত নেত্র, থর থর করে কাঁপছে তার ব্যাকুল হৃদয় পদ্ম।

জ্বর উঠেছে প্রায় থার্মোমিটারের শেষ সীমায়।

বালক অমিয়র কান্নাকাটিতে গরুর রাখাল আকৃষ্ট হয়। সে কিছু খাবার ও জল দিয়ে যায়, এ কথা যে ওপরে জানাবার মতো নয় বলেই নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতা মতো ব্যবস্থা করে। খেয়ে লে বেটা প্রসাদী আছে। ভয়ো মৎ হামি

আছি। বুখার কাল ছুটে যাবে।

অনেক অনুরোধে অমিয় খেয়েছে। তারপর প্রায় সংজ্ঞাহীন মার কাছে বসে রয়েছে।

মাঝে মাঝে রাখালটা এসে নির্দেশ দিয়ে গেছে কপালে ও মুখে একটু একটু জল দিতে। সে ভরসা দিয়েছে, এক ওঝার কাছ থেকে সে রাত্রে জল পড়া এনে দেবেখন, দিনের বেলা হল না, কারণ সে নাকি নকরি করে। এবং সেখান থেকে কখন ফেরে তার ঠিক নেই, রাত দুপুরও হতে পারে।

সেই গভীর রাত্রি হয়েছে।

অমিয় নিঃশব্দে মঠের চৌহদ্দিতে পা দেয়। সে ধীরে ধীরে মার কাছে যায়। সে ভয়ার্ত বালক অমিয়কে ডাকে না। মাকে ডেকেও তার যন্ত্রণার কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে না। এত নিকটে এসেও যেন এপার ওপার ব্যবধান। সে শুধু নীরব সাক্ষী হয়ে থাকে।

রাত কেটে যায়।

ভোরবেলা রাখালটা যখন জল-পড়া নিয়ে আসে তখন বালক অমিয় মার কণ্ঠলগ্ন। রাখালটা সব দেখে শুনে বলে, উঠে আয় বাপুজী। সীয়ারাম—রামনাম সৎ হ্যায়।

বাংলোর বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে পড়ে অমিয় শুধু বলে মা।

সুশীল গৌরীকে নিয়ে সমুখে এসে দাঁড়ায়। হাতে তার মশাল।

একখানা পাঁচ টাকার নোট অমিয় গৌরীর হাতে দেয়।

সকলে বিস্মিত হয়। সুশীল তো জলে ওঠে ঈর্ষায়।

অমিয় আর একবার গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে বলে নিয়ে যাও রাত হয়েছে। আর দাঁড়িও না বলছি।

সুশীল ভাবে, কী দেখলেন বাবু? নিশ্চই গৌরী ওঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। কেন বাঘের খোরাকি সে নিজ হাতে এগিয়ে দিল সমুখে? সকলের সমুখে বাঘমশাই এখন খেলেন না বটে তবে রেহাই নেই গৌরীর।

সুশীলেরও তো লোভ ঐ পুষ্ট দেহটার ওপর। ধরে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে। সুশীল বাঙালীর ছেলে, গৌরী পশ্চিমা মেয়ে—একটা শক্তির পরীক্ষা হয়ে গেলে পারত। সুশীল মনে মনে মল্লভূমির পটভূমি আঁকে। অহেতুক আনন্দ অনুভব করে ঘর্মাক্ত পরিশ্রমের।

কিন্তু মনটা আবার নিরানন্দে ভরে ওঠে, কেন গৌরীকে নিয়ে এল বাঘের প্রলোভন উগ্র করে দিতে। এদেশে কি ভোলা-ঝি আর পাওয়া যেত না—একটা কুরূপ কুশ্রী? নিশ্চয় যেত—এই কাহারপাড়ায় সোপিয়ার মা, ধপিয়ার

মাগী, তাঁদের দেখলে সুশীলেরই গা ঘিন্ ঘিন্ করে। কী নোংরা চাল-চলন, কী ময়লা কাপড়-চোপড়।

আর কি চমৎকার গৌরীর গড়ন। সুশীলই তো লোভে পড়ে ওকে ডেকে এনেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হলে কি বাবুর মান সম্ভ্রম থাকবে? সুন্দর হাতের সব ভাল। কুটনা বাটনা মায় ঠোনাটি পর্যন্ত।

তেমন হাঁকডাক নেই। সুশীল ধীরে ধীরে খাওয়ার বন্দোবস্ত করে। গুছিয়ে আনে থালা গেলাস বাটি। আর মনে মনে ভাবে, ঠোনা মারলেই হল। দেবে না তাহলে একেবারে একটি বিরাশি মণ কিল বসিয়ে পিঠে। সুশীল রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

গৌরী ফিরে এসে রান্না ঘরের দুয়ারে দাঁড়াল।

সুশীল হেসে জিজ্ঞাসা করে, কিরে?

সরু শুকনো কাঠি। মশালটা না পুড়তেই কাঠিটা জলে পুড়েছে। তাই ফিরে এলাম।

কতদূর গিয়েছিলি?

প্রায় অর্ধেকটা পথ।

অন্ধকারেই তো ফিরে এলি?

কি করব বল? ভয়ে ভয়ে হুঁশিয়ার হয়ে পা বাড়ালাম।

এদিকে না এসে বাড়ির দিকেই গেলেই পারতিস?

আঁধারে বাঘ ভালুক আছে মহুয়ার ঢাঁরে। সেদিন সোনিয়ার মাসী নদীর জল আনতে গিয়ে প্রায় চিতা বাঘের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল। কালো চিতা ভারী পাজি জাত। যতখানি মুখ ভঙ্গি করে গৌরী, কিন্তু ততখানি ভয় যেন পায় না সুশীল। সে চেয়ে চেয়ে দেখে। ভাত বাড়তে ভুল হয়ে যায় তার।

এই দুঃশ্চরিত্রা মেয়েটা কত ন্যাকামিই করছে। রাত-বিরেতে ও নিশ্চই একা একা ফেরে টহল দিয়ে। ওর বাপের কথা ও অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে না। তলে তলে ও ওর নিজস্ব অভিলাস পূর্ণ করে। তবু অবিশ্বাস করতে মন ওঠে না। স্ত্রীলোক—বিশেষ করে জংলী যুবতীর সংসর্গ কি আশ্চর্য! সুশীলেরও একটা জংলা মন আছে। সে চায় বুনো হরিণীর পিছু পিছু চলতে। বিপদ আছে আঁধারে গভীর পাহাড়ী খাদে পিছনে পড়ে যাওয়ার। সে নরালী গরুর মতো পাগলা মনটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধবে। ফুটন্ত সর্ষে ফুলের মধ্যে ঢুকলে গৃহস্থ তাকে ছাড়বে না। পাছায় দাগ বসিয়ে দেবে পাঁচন বাড়ির। এ-বিষয়ে সুশীলের ঠিক দৈহিক অভিজ্ঞতা নেই। তবু তাকে

এড়িয়ে চলতে হবে সর্বে ফুলের সুগন্ধ।

সুশীল অন্যমনস্ক ভাবে একটা কাঠিতে আবার মশাল জ্বেলে দেয়।

গৌরী হাসে। কিন্তু বন-বিড়ালী আর ফেরে না।

ধীরে ধীরে ভাত বেড়ে বাবুদের ডাকাডাকি করে সুশীল ঘুম ভাঙায়। উঠুন, খেয়ে নিন চট্‌পট্‌। রাত কটা বাজল কে জানে!

ধড়মড় করে অমিয় উঠে বসে। এত রাত্রে আর না খেলেই ত চলত।

বিনয় বলে, তাতে লাভ নেই। অন্তত এঁটো মুখ করলেও করতে হবে। মেয়েরা যে আমাদের ওপর টেক্কা দিয়ে যাবে, একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারিনে।

হেরে গিয়েও জোর করার মধ্যে একটা বাহাদুরি আছে।

রানারস্‌-আপের মেডেলটা তোমার পাওনা হয়েছে বটে। সগর্বে বুকে ঝুলিয়ে নিতে পারো।

অমিয় শেষ পর্যন্ত আমরা উইন করবোই। কাল থেকে তুই একটু খেটে খেলে দেখ। একেবারে ভাড়াটে প্লেয়ারের মতো গা এলিয়ে দিস্‌নে। মাইরি তা হলে কলকাতায় গিয়ে আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

আচ্ছা, আচ্ছা—তুই এখন খেয়ে নে তো।

মাথা গরম, ভাল ঘুম হয় না রাত্রে।

অমিয় অনায়াসে পেরিয়ে আসে বারোটা বছর—হয়তো বেশি কিছুও হতে পারে। সে বেঁচে আছে, বড় হয়েছে অনুগৃহীত পরগাছার মতোই মঠের গায়। সে অনুগ্রহ আবার সাত্ত্বিক নয়, রাজসিক।

কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়েও অমিয় এবার মঠে আশ্রয় পেয়েছে। সাধারণ সংসারের যা কিছু সুখ-সুবিধা তার চতুর্গুণ তার ভাগ্যে জুটেছে। জুতা, জামা, টেবিল, চেয়ার। তবে যতদূর সম্ভব বেশভূষা গেরুয়া রঙের।

ছেলের চেয়েও বেশি ভালবাসেন মঠের সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনীরা। মঠের সংলগ্ন চত্বরে অমিয়র একখানা কোঠা। সাজানো গোছানো তকতকে ঝক্‌ঝকে। আয়না আছে একখানা বেশ বড়। তাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে। অমিয় যৌবনে পা দিয়েছে। একটু একটু কচি রেশমের মতো দেখা যাচ্ছে গোঁফের রেখা। চোখে এক অপূর্ব লাবণ্য বিকাশ।

অমিয় হাসছে মৃদু মৃদু। আজ রাতটা সে বাইরে কাটিয়ে আসবে। আই.এ পরীক্ষা খুব ঘনিয়ে এসেছে। কী বলে ফাঁকি দিয়ে যাবে মাধুদিকে তাই মনে মনে ভাবছে। মাধুদি মঠেরই এক সন্ন্যাসিনী। বয়স ত্রিশ কি বত্রিশ, কী বলে যাবে, কিছুই স্থির করতে পারে না অমিয়, তার এক বন্ধুর

বোনের বিয়ে, সুসজ্জিতা মেয়েটিকে সে দেখেছে। কিন্তু বিবাহ আসর অমিয় কোনদিন দেখেনি। সেখানে সলজ্জ নববধূকে কেমন দেখতে লাগে তা দেখার বড় ইচ্ছা।

মাইরি আমি কোনদিন বিয়ে দেখিনি। নিয়ে যাবি তোর বোনের বিয়েতে ভাই?

তুই তো সন্ন্যাসী, যাবি কী করে? যেতে পারবি?

নিশ্চয়ই। আমি ওসব মানিনে। দেখলি তো সেদিন দিব্যি মাংস রান্না খেয়ে এলাম তোর বোনের হাতের। চমৎকার রেঁধেছিল কিন্তু, কবে ছোটবেলা খেয়েছি তা কি মনে আছে!

তোর মাধুদি তোকে তো রোজ চুমো খান—থুড়ি, থুড়ি চিবুক স্পর্শ করেন। সেদিন কী বললেন?

মঠবাসিনীদের নিয়ে ঠাট্টা ফাজলামি করা মহা-পাপ। মধুদি জিজ্ঞাসা করলেন, তোর মুখে কিসের গন্ধ অমিয়? আমি দিব্যি বললাম, ভেজিটেবেল চপের।

তুই একেবারে ডাহা মিথ্যে কথাটা বলে দিলি, আশ্চর্য তাতে পাপ হল না।

পাপ কিসের? যা মুখে ভাল লেগেছে, তা খেয়েছি—ব্যস্ নিত্য নিরামিশ আর কত ভাল লাগে? উঃ কী সে সব রান্না! তুই সাত দিনও বরদাস্ত করতে পারবিনে।

এরপরে দেখবি ব্রহ্মচর্যও নুন কাটা লাগছে। তখন খুঁজবি ঝাল কাসুন্দি, টক চাটনি! দুনিয়ার নিয়ম এই। হয়তো মঠের অনেকেই চাখে, অবশ্য গোপনে গোপনে। আমরা বাইরে থেকে দিব্য চোখে সব দেখি—তুই ভিতরে থেকেও অন্ধ।

অমিয়র মনে মাধুদি সম্বন্ধে একটা সন্দেহ হয়েছে চকিতে, কিন্তু তা মিলিয়ে গেছে নিমেষে।

অমিয় ঘরের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে আর মনে মনে ফন্দি আঁটছে। ব্র্যাকেটে সিল্কের গেরুয়া জামা, আলনায় সিল্কের গেরুয়া ট্রাউজার। পরনে আণ্ডার-অয়ারটা পর্যন্ত গেরুয়া রঙের। দাঁত কটা আর সাদা কেন? এমন যে জুতো জোড়া তাও তো ঐ একই রঙের। এসব পরে স্কুল, কলেজ করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু বিয়ে বাড়ি গেলে লোকে কী বলবে। কে যেন একটি মেয়ে সেদিন ওর বন্ধুর বাড়িতে বসে মন্তব্য করেছিল, স্বামীজী এসেছেন।

আর একটি মেয়ে বলেছিল, এত্ত চট করে চয়েস্ করলি মাইরি, তোর ভাগ্য দেখে হিংসে হচ্ছে। বেশ তাড়াতাড়ি তোর বাপ মা রেহাই পেল কিন্তু।

অপর কে যেন বলেছিল, উনি স্বামীজী নন, শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বালিকানন্দ প্রভু। দেখ দেখ প্রভু কেমন মুরগীর রান্ ওড়াচ্ছেন।

সেদিন লজ্জায় রাঙা হয়ে খাওয়া শেষ করেছিল অমিয়। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল সে, কিন্তু মর্মান্তিক আস্বাদও পেয়েছিল। যেভাবেই হোক্ সে আকর্ষণ করেছিল মেয়েদের সম্যক্ দৃষ্টি। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ফিস্‌ফাস কথা—উঁকি ঝুঁকি চাউনি, চুড়ির আওয়াজ মিষ্টি মিষ্টি।

সমস্ত গেরুয়া রঙে অমিয়র বিতৃষ্ণা জন্মেছে।

বন্ধু শেখর এসে ডাক দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় ছুটো হুইসেল। অমিয় আণ্ডারঅয়ার সু পরেই পাঁচিল টপকায়। কাঁধে ভাঁজ করা রয়েছে ট্রাউজার। মাধুদির চোখ রাঙানি ভুলে যায় বিয়ে বাড়ির আলোকসজ্জার স্বপ্নে।

ছাব্বিশ

ঘুম ভেঙেই অমিয় দেখে বিনয় সমুখে দাঁড়িয়ে, সুপ্রভাত। বন্ধু সুপ্রভাত।

একটা স্বপ্ন দেখেছি ভাই, একেবারে আশ্চর্য স্বপ্ন।

বিনয় বলে, আমি একান্ত মনে প্রার্থনা করি সে স্বপ্ন তোর জীবনে সফল হোক। দূর তা নয়, দেখছিলাম এক বন্ধুর বোনের বিয়ের স্বপ্ন। কী যে সুন্দর লাগছিল তা বলে বোঝানো যায় না। পারি নগরীর আলোকসজ্জাও বোধহয় তার কাছে হার মানে।

সুশীল চা দিয়ে যায় বেড্‌টি। অমিয় ধীরে ধীরে চুমুক দেয়। তার মুখে চোখেও যেন স্বপ্নাবেশ। গত রাত্রে বিনয় যথেষ্ট আহত হয়েছে। কিন্তু তার চিন্তা ছিল অমিয়র জন্য বেশি। ও দিব্বি ধাক্কা কাটিয়ে যে উঠেছে, এটাই আনন্দের কথা। বিনয় নিজের ব্যথাও ভুলে বলে, আপত্তি না থাকলে বল, কোনো তা কাজ নেই—তোর স্বপ্নের কথা শুনি:

তবে একটু বস চোখে মুখে জল দিয়ে আসি। ভেরি ইনটারেস্টিং।

—তুই একেবারে স্পেল বাউণ্ড হয়ে থাকবি। স্বপ্ন নয়, মনে হবে একবারে সত্যি একটা গল্প।

অমিয়র মুখ চোখের ভাব দেখে, বিনয় মন্তব্য করে, তাই নাকি? তা হলে একটু পরেই না হয় ওদিকে যাস।

নো নো মাইডিয়ার ফিজিক্যালি ইম্‌পসেবল। প্রেসর খুব বেশি।

অমিয়, তার বাল্য ও কৈশোরের কোনো কাহিনী দুর্বলতার জন্য বিনয়ের কাছে আজ পর্যন্ত বলে নি। যৌবনের সেই একটি রাত্রির কথা বলবে স্বপ্ন

দেখার মাধ্যমে। সত্য নয় অথচ সত্য। কিছু বলল না অথচ সমস্তই বলল। কেমন লাগে বিনয়ের কাছে সে কথাই বড় নয়, অমিয় নিজে সময় কাটাল বড় মনমরা হয়ে পড়েছে সে।

বিনয় একটু বাদেই হাঁক দিয়ে ওঠে, আর কত দেরি ব্রাদার—আসর যে জুড়িয়ে গেল। একটু চট্‌পট করে সেরে নাও। কিছু না হয় মুলতুবি থাক্।

এইতো এলাম বলে,—ফিনিশিং টাচ্ দিচ্ছি।

অমিয় এসে বলে, চল একটু বাইরে। হাঁটতে হাঁটতে শুনবি সব।

না ভাই হেঁটে হেঁটে নয়, বসে বসেই শুনতে হবে। চা-ও চাই।

সুশীলকে হুকুম করে, ওরা দু' বন্ধুতে চেয়ার টেনে বসে পড়ে।

কতগুলো অযত্ন বর্ধিত ফুল গাছ সমুখের বাগানে। দু' একটা ফুল ফুটেছে চমৎকার। ঠিক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু দেখেই মন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। অমিয় উঠে গিয়ে একটু ভাল করে দেখে আসে। ছেঁড়ে না। একটা মালী আর ঠিক করা হল না।

আর কদিন এখানে? ফুল ফোটাবি কার জন্য?

নিজের জন্য কি মানুষ ফুল ফোটায় না?

ফোটাবে না কেন? কিন্তু তাতে তৃপ্তি নেই।

কেন?

মানুষের ভিতর একটা পরকীয়া প্রীতি আছে। সে যতক্ষণ সেই পরকে আপন করে নিতে না পারছে ততক্ষণ শান্তি নেই। সাধারণ প্রেমের ক্ষেত্র ছেড়ে দাও, বৃহত্তর কল্যাণের ক্ষেত্রেও তাই। সবার ওপর মানুষ সত্য, আবার মানুষের কাছে বড় সত্য হচ্ছে পরকে আপন করে তোলা।

হয়তো হবে। তবু ফুল চাই এবং ফুলের জন্য মালীর দরকার। আমি চলে গেলে তুমি ভোগ করবে, তুমি চলে গেলে যে আসবে। ফুল ফোটাতেই হবে। অত নিরাশ হলে চলবে না।

যাক্ এখন স্বপ্নের কথাটাই শুনি বল।

আমি যেন এক মঠে রয়েছি—মানে, মঠেরই এক সন্ন্যাসিনী আমাকে যেন ছেলের মতো প্রতিপালন করেন। তার নাম মাধুরি। তখন আমার বয়স আঠার কি বিশ। মঠের মধ্যে থাকলেও কলেজে পড়ি। গেরুয়া রঙ হলেও টাই শার্ট ট্রাউজার পরতে বাধা নেই। জীবনে কখনো তো সাধারণ মানুষের সমাজ দেখিনি। একদিন সুযোগ এলো মঠ থেকে পালিয়ে চলেছি বিয়ে দেখতে। বন্ধুর বোনের বিয়ে।

বিনয় এক চুমুক চা খেয়ে বলে, বাঃ বন্ধুর বোন ! চমৎকার রিলেশন। এখন নৌকাডুবি না হয়।

সে দেশে নৌকা নেই, অতএব সে ভয় নেই। কিন্তু মনে আশঙ্কা রয়েছে মাধুদির কড়া শাসনের। তবু তাকে ছাপিয়ে কৌতূহল বড় হয়ে উঠেছে। বিয়ে বাড়ি নহবতখানা, বরকন্যা যেন ঝলমল করছে আমার চোখের সামনে।

করবেই তো সন্ন্যাসী ঠাকুর, একেই বলে পরকীয়া রস। কেবল অর্থ নয়, একটু তলিয়ে বুঝতে হবে। এবং তা বোঝার মতো তখন তোমার যথেষ্ট গোঁফ দাড়ি গজিয়েছে। এই কিছুক্ষণ আগে তাইতো বললাম আমি।

তারপর শোন গেরুয়া পোশাকে আর কী করে বাড়ির ভিতর ঢুকি ? বন্ধু শেখরকে বললাম সে বলল দাঁড়া এই গাছতলাটায় একটা বিহিত করছি। এতটা পথ এসে তুই কি আর ফিরে যাবি। আমি একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছি, দূরে সানাই বাজছে—আলোয় আলোয় নহবতখানা। বন্ধু ফিরছে না।

বড্ড সকরুণ তো !

ফোড়ন না কেটে শোন। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে শেখর ফিরে এল ধুতি পাঞ্জাবি নিয়ে। খুঁজে কি পাওয়া যায় কিছু ! আমার ঘরখানা লণ্ড ভণ্ড করেছে ও বাড়ির মেয়েরা।

ধুতির বদলে আবার সায়া আনেনি তো ? বিনয় মন্তব্য করে। মাইরি ভয় হচ্ছে।

নারে না। তাড়াতাড়ি সব বদলে অর্জুনের মতো সমীবৃক্ষে পোশাক তুলে রাখলাম। অন্ধকারে যে গাছ থেকে পড়ে যাইনি এই যথেষ্ট। দুজনে তরতরিয়ে হেঁটে এলাম। বাড়ির ভিতর ঢুকতেই দেখি একপাল মেয়ে। কারুর হাতে শাঁখ কারুর হাতে মালা, কারুর হাতে পান। বরকন্যা বিয়ের আসরে এসেছে। আমি এসব দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছি। মনে হল যেন ইন্দ্রসভায় এসেছি। এমন আনন্দ বোধহয় আমি জীবনে পাইনি। হঠাৎ মেয়েরা আমার দিকে চেয়ে হেসে ওঠে। কেউ কেউ বলে, ওমা সন্ন্যাসী সাহেব যে। আজ এ বেশ কেন ? নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মরে যাই। এখন ছুটে পালাই কোন্ দিকে ? চারিদিকে মেয়ে ব্যূহ।

এই রে যা বলেছি তাই,মার্ডার করেছিস শায়া পরেছিস নিশ্চয়ই অন্ধকারে।

নারে, না। অমিয় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে যায়। বিনয় হাত চেপে ধরে বলছি, একটু সবুর কর বিনয়। আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

আর আমার যে প্রাণটাই বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। এত সাসপেন্স

তো তাই ক্রাইম গ্লামারও নেই।

শায়া নয়, শাড়ি পড়েছি।

অলরাইট, যখন সখী সেজে ভিড়ে মিশে যেতে চাইছ তখন ধরা পড়েছে এইতো। হাউ প্যাথেটিক এ্যাণ্ড ফানি। বলে যাও বলে যাও খুব মনযোগ দিয়েই আমি শুনছি।

তা তো শুনবিই—আমি অপমান হচ্ছি আর উনি আনন্দে গদগদ। না মাইরি আর বলব না।

আমি তোমাকে খুন করবো।

বিনয়ের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে অমিয় হেসে ওঠে। দু' চুমুক চা খেয়ে বলে, আমি ছুটে পালিয়ে এলাম। আমার পেছন পেছন দু' তিনটা টর্চ ছুটল। দাঁড়া দাঁড়া অমিয়, অন্ধকারে পড়ে গিয়ে একটা অ্যাকসিডেণ্ট করবি। কে শোনে সে কথা, আমি মঠের দিকে ফুল গ্যালনে চলেছি। ভাবছি মাধুদিকে না জানিয়ে আসার এই প্রায়শ্চিত্ত। মঠকে অপমান করার এই দণ্ড। আমি থামছিনে—তাই বুঝি টর্চগুলো হয়রান হয়ে ফিরে গেল।

মাধুদি নিশ্চই তোকে খুব স্নেহ করতেন—না রে?

হ্যাঁ, যেমনি তার স্নেহ ছিল, তেমনি ছিল কড়া শাসন। আমি তাকে যতখানি ভয় করতাম, ততখানি করতাম শ্রদ্ধা। মনে মনে আমি মাধুদির কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলাম। কিন্তু আমার চোখে লেগে রইল বিয়ে বাড়ির সেই রোশনাই, বর-কন্যার স্মৃতি। কানে বাজতে লাগল সানাই।

তবু আমার কাছে এসব জলো ঠেকছে। তেমন আর গল্পের দানা নেই। উঃ কি সাসপেন্সটাই না তুলেছিলি শাড়ি পরে।

তাহলে এখন থাক ভাই আর শুনে কাজ নেই। স্বপ্নের কথা তো তোদের সিনেমা স্টোরির মত ফিফটি পারসেণ্ট লভ, টেন পারসেণ্ট দেঁতো হাসি এবং ঐ অনুপাতে বাইজি নাচ দিয়ে সাজানো যায় না।

না না কোন কাজ তো নেই, বলে যা বসে বসে শুনি। যার বৌ পানসে রাঁধবে সে কি খাবে না?

অমিয় একটু চা খায়, একটু হাসে, তারপর আরম্ভ করে, শাড়ি আর পাঞ্জাবি পরে মঠের দিকে ছুটে চলেছি। খেয়াল নেই যে মঠে গিয়ে যখন উঠব তখন এর ফল কী ফলবে। কারণ ওখানেও তো রয়েছেন মঠবাসিনী নানা বয়সী ব্রহ্মচারিণী দিদিরা।

বিনয় মন্তব্য করে, এ আবার নতুন ধরনের মেয়েব্যূহ। গল্পটা আবার জমেছে। বলে যা। তোর উচিত ছিল জেতো কেরানি না হয়ে ফিলিম

ডাইরেক্টার হওয়া। তোর মাথা আছে, মঠ থেকে বিয়ের আসরে, বিয়ের আসর থেকে আবার মঠে। কিন্তু দিদি ব্যূহ, আই মিন মেয়ে ব্যূহ, ঠিকই খেলিয়ে রেখেছিস।

বিনয় তোর কারুর ওপর শ্রদ্ধা ভক্তি নেই। তোর কাছে কিছু বলাই বৃথা।

অন্তত মেয়েদের বেলা তা বলতে পারবি নে। আবার এঁরা হচ্ছেন মঠের মেয়ে।

অমিয় আবার বলতে শুরু করে, আমি পাঁই পাঁই করে ছুটছি আমার মানসিক অবস্থাটা তখন ভেবে দেখার মতো। একেবারে সোজা এসে আমার কোঠায় ঢুকে পড়লাম। মঠে কেউ জেগে নেই চারিদিক অন্ধকার। শুধু আমার ঘরে একটা আলো। মাধুদি বোধহয় ধ্যানস্থা। আর তাঁর দিকে অপলক নিষ্কাম চোখে চেয়ে মধুকরানন্দ ব্রহ্মচারী। দুজনারই গেরুয়া বাস কেমন যেন এলোমেলো। কে রে, অমিয়? ওভাবে যে? মাধুদির গলা। আমি পিছিয়ে এলাম। গা যেন রি রি করে উঠল আর দাঁড়াতে পারলাম না। ছুটতে ছুটতে স্টেশন, তারপর নতুন একটা টাউন।

তারপর?

আর বলা হয় না। সম্মুখে এসে দাঁড়ায় বহুকাম্য বহু প্রত্যাশিত গত দিনের মেয়ে ব্যূহ। দুঃসাহসিক একেবারে জিনিসপত্র নিয়েই এসে পড়েছে।

সাতাশ

অনেকগুলো মেয়ে। তাদের মধ্যে সেই শ্যামাঙ্গী মেয়েটির ওপর দু'বন্ধুরই নজর পড়ে। বিনয়ের যেমন স্মরণ হয় শিউলিকে, অমিয়র তেমনি মনে পড়ে শেখরের বোনটিকে। সেদিন বিয়ের সভায় সকলে ওকে দেখে ভেঙে পড়েছিল, শুধু সকরুণ সহানুভূতিতে চেয়েছিল সেই মেয়েটি।

দেখুন কালই আমরা আসতাম কিন্তু দীপাদি একটা জরুরি চিঠি পেয়ে চাকরির খাতিরে গিয়েছিল। ওদের মধ্যে যে ফর্সা মেয়েটি পরশু এসেছিল সে বলে, আজ একেবারে সাহসে ভর করেই—বাক্স ভেক্স নিয়ে হাজির হয়েছি জানি আপনার বন্ধু কিছুতেই না করতে পারবেন না, কারণ আমরা বিপদে পড়েছি বিভুঁইয়ে এসে।

অমিয় আশ্চর্য হয়ে যায় নামটি শুনে। সেই দীপাই বটে। ঠিক একেই যেন দেখেছিল সে। তবে বয়স বেড়েছে অনেকটা।

ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু অমিয় রায়। আর ওঁদের পরিচয় তো তুই পেয়েছিস, সবই বলেছি তোকে।

অমিয় ও বিনয় হাত জোড় করে।

মেয়েরাও বলে, নমস্কার।

ওরা সুশীলকে ডাকে। কুলির মাথা থেকে হাতাহাতি জিনিসপত্র নিচে নামায়। বিনয় বলে, বসুন, বসুন।

বারান্দায় দুখানা মাত্র চেয়ার। বিনয় একটু কী ভেবে যেন ঘরের ভিতর ঢোকে। একখানা বেঞ্চ আছে। তা টেনে নিয়ে আসে বারান্দায়, কিন্তু তাতেই বা কজন বসতে পারবে? মাত্র তিন চার জনের জায়গা হতে পারে। সে আবার ঘরে প্রবেশ করে। সুশীলের এত কষ্টের গোছানো বিছানা বালিশ টেনে নিচে নামায়।

ওকি করছেন? ওকি করছেন? সুশীল ছুটে আসে। আবার এক্ষুনি গোছাবে কে? ওঁরা এ ঘরে ঢুকলে বলবেন কি?

বিনয় হতভম্ব হয়ে থাকে। এতক্ষণ ছিলে কোথায়? ডাকলে সাড়া দাও না।

আমি তো বাংলোর সব গুছিয়ে এলাম। ওখানে নিয়ে বসান। দোহাই একটু সরুন দেখি। সুশীল আবার গন গন করে সব পাট করে গোছায়।

তুমি রাগ করছ সন্ত তো একটু বসতে দিতে হয়।

এতো বাড়ি ঘর নয়, বাসা বাড়ি, দুদিনের জন্য চেয়ে আনা। আপনারা যা এনেছেন তাই বা কজন ´আনে। আমি শতরঞ্চি বিছিয়ে রেখেছি সুন্দর করে।

ফুলদানি?

তাও সাজানো হয়েছে।

এত সকালে ফুল পেলি কোথায়?

গৌরী এনেছে।

তোর বন্ধুকে তারিফ করতে ইচ্ছা করে। সময় নেই মুলতুবি রইল। বিনয় ছুটে বেরিয়ে যায়।

আসুন, আসুন—আপনাদের আস্তানায় চলুন। আমরা কথা না দিলেও আপনাদের জন্য সব ঠিক করে রেখেছি। জানি যে আসতেই হবে। অত কষ্ট কি সহ্য হয় বেড়াতে এসে।

যা বলেছেন? বাঙালীর জন্য প্রবাসে বাঙালীর যা দরদ তা বাংলাদেশে বসে কল্পনা করা যায় না। এই তো দেখুন আপনারা কত কষ্ট করে—

কিছুমাত্র নয়, ওকথা বলে লজ্জা দেবেন না।

একটি দুটি নয়, পনের ষোলটি মেয়ে। সকলেই কাঠের বারান্দায় বসে পড়ে। একটু এখানেই বিশ্রাম করে যাই—এখানটা বেশ ফাঁকা। এর মধ্যেই গরম পড়তে শুরু করেছে।

তা হলে বসার জন্য কিছু একটা—

ব্যস্ত হবেন না। কাষ্ঠাসনের চেয়ে সুখাসন জগতে নেই।

সুশীল, তবে চা এখানেই নিয়ে এসো।

তবু দীপা বলে, আমি ভিতরে যাই। এখন আমি কিছুতেই একটু না ঘুমিয়ে পারব না। সারা রাত ট্রেনে ঘুমোতে পারি নি।

দীপার পিছন পিছন অমিয় যায়, চলুন ঘরদুয়ার সব দেখিয়ে দিয়ে আসি। হ্যাঁ ওদিকে—একেবারে আলাদা একটা বাংলো।

বিনয় ছুটে এসে বলে, আপনাদের কোন কষ্ট হবে না। একেবারে ঢালাও বিছানা করে নেবেন, কিছু দরকার হলে আমাকে জানাবেন। আমার বন্ধুটি কিন্তু বড্ড লাজুক এবং মুখচোরা।

আচ্ছা। দীপা বিদায় না দিয়েও যেন বিদায়ের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। এখন হয়তো জামা কাপড় বদলাবে, ওরা দুজন ফিরে আসে।

বিনয় বলে, এমন ঘরখানা দেখেও একটু ধন্যবাদ জানালে না?

অমিয় বলে, সকলে তো আর তোর মতো বাচাল না।

কেন আমি কি দোষ করলাম?

বুঝবি নে।

একটু উচ্ছাস প্রকাশ করেছি—তা অতিথ-বিতিথ এলে অমন একটু না করলে ভাল দেখায় না। কেননা তুই-ই আমায় তুলোধোনা করতিস ত্রুটি হলে। তোর ভাই মনের থেই পাওয়া ভার।

আরম্ভতেই এই। বিনয় যেন একটু মনমরা হয়ে পড়ে। সে তাড়াতাড়ি সমুখের বারান্দায় এসে চপলতায় ডুবিয়ে দেয় নিজেকে।

আমাদের পরিচয় আমরা জজ ম্যাজিস্ট্রেট নই, সামান্য কেরানি। মনের স্বাস্থ্য সামান্য ভেঙে গেছে। তাই উদ্ধার করতে এখানে আসা।

চায়ের পেয়ালা হাতে মেয়েদের মধ্যে একজন বলে, আমরাও রাজকন্যা নই, সাধারণ ঘরের মেয়ে। যে খা হলে বৌ হতাম হয়েছি ইস্কুলের মিসট্রেস। ছুটি ও একটু সচ্ছলতার যোগাযোগে বেড়াতে এসেছি। আমাদের মনের স্বাস্থ্য আপনাদের শরীরের মতোই অটুট আছে—কাল সকালে একবার ঐ পাহাড়টায় বেড়াতে যেতে চাই।

আমরা যদি সঙ্গে যাই দোষ হবে না তো ?

দীপাদিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তিনি হচ্ছেন আমাদের মেয়ে ক্যাপটেন।

বিনয় অমিয়র দিকে তাকায়।

ওখানে থেকেও যেন অমিয় ওখানে নেই। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে এক কোণে সরে গেছে। বিনয় অমিয়কে ডাকতে সাহস পায় না। অগত্যা সে আবার এসে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তায় মগ্ন হয়ে যায়। মাঝে মাঝে হাসির লহর ওঠে। কিন্তু অমিয়র মনটা যেন ওখানে নেই।

বিয়ের রাত্রের ঝলমলানির মধ্যে যে দীপাকে দেখেছিল, সেই দীপাই যেন এসেছে শুধু তার হাতে মালা নেই—আর একটু যেন বয়স বেড়েছে কৃশ হয়েছে জীবনযুদ্ধে। দীপাকে জড়িয়ে অমিয়র জীবনের পরের ঘটনাগুলিও আবার যেন ঘটে যায় নাটকের মতো।

ট্রেন থেকে নেমে শাড়ি পরেই শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে অমিয়। টিকিট কাটেনি। ভিড়ে মিশে গেট পেরিয়েছে। ধরা পড়লেও বলার কিছু ছিল না—ধরা না পরেও বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। কিসে কী হল তাই এখন পর্যন্ত উপলব্ধি করার মতো শক্তি সে ফিরে পায় নি।

সে শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে মোহাচ্ছন্নের মতো।

কিন্তু তার চোখে লেগে রয়েছে দীপার দরদী চাহনি এবং মাধুদির কঠোর দৃষ্টি। সে চোখ বুজে এড়াতে চায় যখনই মনের সম্মুখে ভেসে ওঠে মঠের নৈশ দৃশ্য। সে ভাবতেই পারে না মাধুদিকে এত ছোট করে। যত কাঠিন্যই থাকনা কেন তাঁর ভিতর, স্নেহও ছিল অপর্যাপ্ত। স্নেহের কলসিতে একি গরল ? অমিয় চোখবুঁজে মনের সে গাঢ় দাগ মুছে ফেলতে পারে না। তাই সে ক্ষমাও করতে পারে না মাধুদিকে। কী চোখ যে আজও ভিজে উঠছে। মায়ের স্থান মাধুদির মতো আর তো কেউ পূর্ণ করতে পারেনি অমিয়র।

ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর অমিয় একটা পার্কের কাছে গিয়ে বসে। হাতে পয়সা নেই, বেলা তিনটে, কলেও জল নেই। সে ঠায় অপেক্ষায় বসে থাকে। নিকটেই একটা কারখানা, কী কারণে যেন চালু নয়—অজস্র লোহালক্কর পড়ে রয়েছে এদিকওদিক। মোটর ইঞ্জিন, লোহার পাত, ভাঙা হুইল স্তূপাকার।

গেটে একজন দারোয়ান বসে। দুধে সাদা দাড়ি গোঁফ, চকচকে দুগুক্তি দাঁত।

সন্ধ্যার সময় সে এসে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বাবু কে ? কী জন্য এত সময় বসে রয়েছ এখানে ? ঘরে যাও।

খানিক ঘুরে অমিয় এসে পার্কের অন্য কোণে বসে। তখন রাস্তায় আলো জ্বলছে। আবার বুড়ো আসে। কী যেন ভেবে ডেকে নিয়ে যায় কারখানার ভিতর। এক অবর্ণনীয় অন্ধকার পরিবেশ। যন্ত্রের কঙ্কালগুলো যেন পাহাড়ের মতো পরে রয়েছে।

এখন যদি এখানে আটক করে রাখে অমিয়কে? খবরের কাগজে এমন অনেক সংবাদ পড়েছে সে। বুড়োর মিষ্টি চেহারা মিঠে কথা বদলে যেতে কতক্ষণ? এখনই হয়তো ওর হাত খানা চেপে ধরবে সাঁড়াশির মতন। চিৎকার করেও এখন কোনো লাভ নেই। বুড়ো সৎপ্রকৃতির লোক হলে ওকে কাপুরুষ ভেবে হাসবে, আর ভিন্ন প্রকৃতির লোক হলে গলা চেপে ধরবে। বাইরের কেউ জানতেও পারবে না এসব। এই ভাবেই তো বয়স্ক ছেলেরাও ধরা পড়ে চালান হয়ে যায় বাইরে। কী অবস্থায় যে অমিয় শ্বাস বন্ধ করে চলে।

একটা ভাঙা খোলার ঘরে ভিতরই যেন ওরা ঢোকে।

বৃদ্ধ একটা মোমবাতি জ্বালায়, একখানা বিছানা দেখিয়ে দেয় বসতে। লোহার চওড়া পাতের ওপর ছেঁড়া মাদুর, কোথায় মঠের শয্যা,আর এরা কি? কি করবে অমিয় বসে পড়ে। তার বুকটা ধড়ফড় করছে সাংঘাতিক।

বুড়ো একটা কালো পাথরের গ্লাস সুমুখে ধরে। নেও খাও।

বিষ নাকি? তবু না করতে পারেনা অমিয়। সে কলের পুতুলের মতো গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে নেয়।

এযে পেস্তা বাদাম মিশানো মিশ্রির শরবত। প্রায় তিন পোয়া মাপের গ্লাসটা অনায়াসে খালি করে ফেলে শরীরটা এবার সুস্থ বোধ হচ্ছে অমিয়র। খিদের সময়ে কি কেবল জল খেলে কি পেট ভরে?

নকরির খোঁজে বুঝি শহরে এসেছ? ঘর কোন্ জিলে?

আমার ঘর নেই।

বাপ মা ভাই ব্রাদার?

তাও নেই।

নিরাশ্রয়। অমিয়র সুকুমার মুখের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ একটা নিশ্বাস ছাড়ে। দুনিয়ার কত ওলোট-পালট ঘটছে, তার কবলে পড়েই ত হয়ত সব খুইয়েছে। আর কাঁচা ঘায়ে খোঁচা দিতে সাহস করে না বুড়ো দরোয়ান।

কিন্তু ওকে কী বলে বিদায় করবে কাল সকালে? বিকাল বেলা ওকে বার বার কলের জল খেতে দেখে মায়া জন্মে ছিল। তাই ঝোঁকের মাথায় ডেকে এনে ছিল কারখানার ভিতর। এবং দিয়েছে তার সাধ্যমত নৈশ পানীয়টুকু

ওকে খেতে। আজ রাতটা বুড়োর খালি পেটেই থাকতে হবে। পয়সা হাতে নেই, তাতে আবার মালকাবারের মুখ।

যা হোক একটা বলতেই হবে। হাতে রেস্তো না থাকলে মায়া দেখানো যায় না। বুড়ো আগামী কালের কঠোর ভূমিকায় পায়তারা কষতে গিয়ে দেখে যে অমিয় ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথাটা হেলে রয়েছে এমন ভাবে এক্ষুনি গড়িয়ে পড়তে পারে একটা বোলারের ওপর। বুড়ো ধীরে ধীরে তাকে শুইয়ে দেয় একটু গোছগাছ করে। কিন্তু ওর ভেতরেই যে একটু নাড়িয়ে দেখতে ভুল করেনা এসব আবার বুজরুকি নয় তো!

না সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে।

শরবতের ভিতর যেটুকু সিদ্ধি ছিল তারই ক্রিয়া। এই ছোট বাঙালী বাবুকে সিদ্ধির শরবত খেতে দিয়ে ভাল করেনি বুড়ো। তবে সিদ্ধির পরিমাণটা অত্যন্ত সামান্য ছিল, এই ভরসা।

অমিয়র পরদিন যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখে যে, অনেক বেলা হয়েছে। কিন্তু ঘর বাইরে থেকে শিকল আঁটা, তালা ঝুলছে বেশ বড় একটা। অমিয়র অন্তর শুকিয়ে যায়। সে ইতি উতি চাইতে থাকে। ভাঙা ঘর, ভাঙা বেড়া। কিন্তু মানুষ বার হওয়ার মতো একটি ফাঁকও তো নেই।

অমিয় আসামীর মতো অপেক্ষা করে থাকে। বেড়ার ফালা ফালা বাঁখারি গুলো গরাদের মতো মনে হয়। দূর থেকে বড় রাস্তার মানুষজন গাড়ি ঘোড়ার গমগমানি তার কাছে ভেসে আসে। তার ভেঙেচুরে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মুক্তির উপায় নেই।

প্রায় দুপুর নাগাত বুড়ো ফিরে আসে। হাতে তার প্রকাণ্ড একটা খাবারের ঠোঙা, এই লেও খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে যাও বাবু। লক্কা পায়রার মতো বসে থাকলে কেউ নকরি দেবে না।

অমিয় একটু আশ্চর্য হয়। এ-টিটকারির অর্থ কি? বুড়োই তো বন্ধ করে গিয়েছিল দোর।

যাও দাঁড়িয়ে থেকনা—ঐ তো কল-পাইখানা, এত বোকা হলে তার কি রুটি জোটে?

মুখ ধুয়ে অমিয় ফিরে আসে যথেষ্ট খিদে পেয়েছে। কিন্তু কঠিনতর একটা বক্রোক্তির ভয়ে সে কিছু বলে না।

বৃদ্ধ বলে যে, অতিথি না খেয়ে চলে গেলে অভিশাপ দিয়ে যেতে পারে, তাই সে বেরিয়ে ছিল দোর বন্ধ করে। ধার কর্জ কি কেউ দিতে চায় মাসের শেষে? তিন জায়গায় ঢুঁ মেরে, তবে সে আড়াইটা টাকা জুটিয়েছে।

এখন খেয়ে লেও ঝটপট। আর এমুখো হয়োনা কাল বড় চুঝ (ভুল) হয়েছে হামার তোমাকে ডেকে এনে।

একখানা মৃগ চর্মে বসতে দেয় অমিয়কে। পাথরের থালা ও গ্লাসে পরিবেশন করে খাদ্য ও পানীয়। তাড়িয়ে দেওয়ার আগে যত্নের বহর দেখে আবার বিস্মিত হয় অমিয়। সে ধীরে ধীরে খেয়ে ওঠে।

চললাম দারোয়ানজি—নমস্তে।

এ ধূপমে কোথায় যাবে? একটু বিশ্রাম করে যাও।

অমিয় বাধ্য হয়ে বসে পড়ে।

তুমি রাজার ঘরের ছেলে—না বাবু?

কি করে বুঝলে?

লথ্‌সন (লক্ষণ) দেখে।

অমিয় নীরব হয়ে থাকে।

কেমন নাক, মুখ আউর আখোঁকা রোশনাই।

অমিয় রাজার ছেলেই বটে! নিজের বিগত জীবনটা সে এক লহমায় প্রদক্ষিণ করে আসে। বৃদ্ধের যা খুশি বলে যাক ও চুপ করেই থাকবে। অমিয়র মনে পড়ছে দুঃখিনী মাকে।

বৃদ্ধের নাকি এক ছেলে ছিল। ও তখন ভাল রোজগার করত। সব পাঠিয়ে দিত দেশে। ছেলেকে পড়াশুনা শেখবার জন্য ভাল স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। এবং ছেলে নাকি একজন মাস্টার রেখেছিল। চিঠির পর চিঠি দিত—সে নাকি খুব পড়ছে। কিন্তু সে যখন ধরা পড়ল তখন পড়াশুনার বয়স প্রায় কেটে গেছে। পণ্ডিত না হয়ে ছেলে হয়েছে পাকা ধোঁকাবাজ আর লুচ্চা।

তাই বয়সের ছেলেকে কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না বুড়ো। কিন্তু মায়াও পড়ে এমনি সুকুমার কাঁচ যুবককে দেখলে। যেন প্রাণটা কেড়ে নে জাদুমন্ত্রে।

তবে এবার উঠি দারোয়ানজি।

আচ্ছা যাও; কিন্তু কোথায় যাবে? নোকরি খুঁজতে?

না একটা মাস্টারি খুঁজব। খাওয়া-থাকার সুবিধা হলে আমিও পড়ব।

বৃদ্ধ হাঁ করে থাকে. তুমি কি ধোঁকা দিচ্ছ।

না।

সাচ (সত্য) বলছ?

হ্যাঁ।

কৃষ্ণজির দোহাই ?

সত্যি দারোয়ানজি আমি আবার পড়ব।

তবু বিশ্বাস হয় না বৃদ্ধের। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটে একটা পুরোদিন রাতটাও কাটে অঘোর ঘুমিয়ে। কারণ তখন প্রচুর প্রকোপ রয়েছে সিদ্ধির। কিন্তু সকালের আগে ঘুম ভাঙে অমিয়র।

অনেক কথা মনে পড়ে। দীপা, মাধুদি, মা। অমিয় ভোরের ভজন জুড়ে দেয় একখানা।

দারোয়ানজি মুগ্ধ হয়ে উঠে বসে বিছানায়। আশপাশের বস্তির কুলি কামিনরা ছুটে আসে। দারোয়ানজি সগর্বে আপ্যায়ন করে।

তারপর সেই একটা ভাল ট্যুইশানি ঠিক করে দেয় অমিয়কে। কিছু অনটন হলে কড়া অভিভাবকের মতো হিসেব নেয়, কিন্তু চালিয়ে দেয় দুঃখ কষ্ট করে।

মাঝে মাঝে বলে, বেটা হামার বয়সের সময় কেন এলিনে ? তারপর বিমর্ষ স্নেহে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

অমিয় ছোট ছোট করে চুল ছাঁটে। খাটো মোটা কাপড় পরে একদিন বি. এ. পাশের খবর নিয়ে সে এসে সত্যি সত্যি প্রণাম করে বুড়োকে।

সেইদিন অমিয় বুঝতে পারে, এ বৃদ্ধ কত শক্তিমান। সে বালকের মতো ওকে কোলে তুলে পিঠে নিয়ে বস্তিময় ঘুরে বেড়ায়।

সে এক স্মৃতি।

তারপর অনেক ঘুরে অমিয় চাকরি পায়। ধীরে ধীরে অনেক কিছু হয়। কিন্তু মার মতো এ বৃদ্ধেরও সে মৃত্যুকালে সেবা করতে পারে না। কারণ বৃদ্ধ দেশে, অমিয় কলকাতায়। কিন্তু অমিয় বুড়োকে আজও বসিয়ে রেখেছে পিতার আসনে।

সব স্মৃতি নিষ্প্রভ হয়ে আবার ছাপার ছবি ফুটে ওঠে অমিয়র চোখে। নিঃশেষিত সিগারেটটার আঁচটা এসে হাতে ঠেকে। সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় জ্বলন্ত টুকরোটা। তবু তা ধোঁয়া উড়িয়ে জ্বলতে থাকে। নিচের পাথরটা কি পুড়ে যাবে ?

অমিয় একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

এমনি ভাবে কতক্ষণ কেটে যায় কে জানে !

বাবুজি খাবেন না ?

কে, গৌরী ? যাহ।

দীপাদি ডেকে পাঠিয়েছেন।

দীপা ? কোন দীপা ? অমিয় যেন গুলিয়ে ফেলতে থাকে সব কিছু। দুপুর

বেলা এমন রুক্ষ পাহাড়ী রাজ্যে কি সানাই বাজে?

দূর, দূর একটা সাঁওতালী রাখাল বাঁশি বাজাচ্ছে।

আঠাশ

অমিয় সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে দেখে, সবাই উঠে গেছে। বিনয় পর্যন্ত নেহ। এতগুলো মানুষের খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছে? নিত্য কোন বিষয়ে খোঁজ রাখেনা—আজ হঠাৎ তার ঔৎসুক্য বোধহয় অত্যন্ত। হাটবাজার কি করা হয়েছে? না শুধু ভাত আর ডাল? কিছুই বিচিত্র নয়। সুশীল কাল রাত জেগেছে, সে নিঃসন্দেহে চাইবে রান্না সংক্ষেপ করতে। আর বিনয় তো রয়েছে কোঁপর দালালি নিয়ে ব্যস্ত।

এরা জীবনে কখনো অতিথি দেখেনি—আর যদিও বা দেখে থাকে সেই দারোয়ানজির মতো প্রীতি ও বিনয়ের চোখ নিয়ে দেখেনি। তাই সে বৈষ্ণবীয় আপ্যায়ন অসম্ভব। অমিয় আস্তে এগিয়ে যায়। ভুলত্রুটি থাকলে এখনো হয়তো কিছুটা শোধরানো যাবে।

কী কী রান্না হয়েছে গৌরী?

মাংস, ভাত আর চাটনি।

কেন? দেখছি দিন দিন সুশীল মাথায় উঠছে। তার ইচ্ছা মতো যা খুশি করবে। এ বাড়ির সেই যেন কর্তা।

তা নয় বাবুজী, সুশীলের কোন দোষ নেই।

তা হলে নিশ্চই বিনয়বাবুর কারসাজি?

না।

তবে সুশীলটাই পাজি। তুমি তো তার টান টানবেই।

একটু শিউরে ওঠে গৌরী। একটু যেন মুখ শুকিয়ে যায় ওর। ও বলে, দীপাদিই এ ব্যবস্থা করেছেন।

অমিয় মনে মনে বলে, বড় তো দুঃসাহস। ভাড়াটে হয়ে এসে টেনে নামাতে চাইছে গৃহিণীর সিংহাসন।

মাংসের দাম তিনিই দিলেন।

আর বুঝি তোমাদের বিনয়বাবু ছোঁ মেরে নিলেন? জীবনে তো একবেলা এককাপ চা কারুকে খাইয়ে দেখেনি। হিন্দুর ঘরে অতিথি নারায়ণ। অমিয় থামে। গৌরীর কাছে এতসব বলা তো উচিত হচ্ছেনা। এ সমাজে ব্যক্তি-চরিত্রের ওপর এ কটাক্ষ করে লাভ কি? বরঞ্চ এতে করে তারই অহংকারের

নগ্নতা ফুটে বার হচ্ছে। এই কি বৈষ্ণবীয় বিনয় ও প্রীতি? বন্ধু বিনয় কি ঐ মেয়েদের মতো ওর আজ অতিথি নয়।

রান্নাঘরে ঢুকে দেখে যে মেয়েরা সারি সারি খেতে বসে গেছে। বিনয় তদারক করছে। ছুটোছুটি করে এটা ওটা দিচ্ছে সুশীল। আর কুন্তল আকুল দেহে পরিবেশন করছে দীপা।

বিনয়বাবু বললেন আপনাদের একটু দেরি আছে, তাই বসে গেলাম আমরা।

বেশ করেছেন। লেডিজ ফার্স্ট। আমরা একটু পরেই বসব।

দীপা বলে, না আপনারা শীগ্‌গির চান করে আসুন। আপনাদের দিয়ে তবে আমি বসব সুশীল ও গৌরীকে নিয়ে।

এ যেন ইস্কুলের ছোট ছাত্রের ওপর হেড মিস্ট্রেসের হুকুম। শুধু তাই নয়—প্রচ্ছন্ন মায়ের গলা রয়েছে যেন বাংলাদেশের। কেবল তাও নয়—জায়ার কণ্ঠ রয়েছে যেন সমস্ত ভারতের।

অমিয় পলকে একবার দীপার মুখখানা দেখে নেয় ভাবে, সে জায়া কি বিধবা? বেশবাসে তো মনে হয় না।

এ বুঝি বা অভিশপ্ত চিরকুমারী।

মধ্যবিত্তের ঘর থেকে এমনি করেই বুঝি ধীরে ধীরে বিদায় নেবেন মা।

বিনয় তুই স্নান করবি নে?

এ বেলা আর ইচ্ছা করছে না। একটু আগেই আমি প্রায় স্নান সেরেছি।

তবু আয় বাকিটুকু সেরে যা।

অমিয় বিনয়কে একপ্রকার টেনে নিয়ে আসে।

মেয়েরা খাচ্ছে, অমন হাঁ করে কি গ্রাস গোনা ভাল? ওরা, অস্বস্তি বোধ করছে।

না, সে মেয়ে ওরা নয়। কলেজ, পার্টিতে চপ কাটলেট মেরে ওঁরা পাকা বনে গেছেন। দেখছিসনে পাশের ধাড়িটি কেমন জাঁকিয়ে বসেছেন। যেন ওঁরাই সব, তুই আমি ফালতু।

আমার তো মন্দ লাগল না।

বিনয় ধীরে ধীরে বলে, আমারও তো লাগেনি।

অমিয় তেলের শিশি ও গামছা তুলে নেয়, বিনয় কাপড়। দুজনে পাশাপাশি এগিয়ে চলে ইদারার দিকে। গৌরী যায় ওদের পিছন পিছন জলের বালতি ও ঘটি নিয়ে। কিছু সময়ের জন্য একটা কথাবার্তাহীন শূন্যতা সৃষ্টি হয় ওদের মধ্যে।

গৌরী বলিষ্ঠ বাহুর টানে টানে জল তোলে বালতি ভরে। অন্যদিন হলে ওরা নিষেধ করত। কিন্তু আজ তা ভুলে যায়।

গৌরী বলে, দীপাদিকে দেখলে মন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। নিশ্চয়ই ভালঘরের মেয়ে।

হতে পারে, কিন্তু দু'বন্ধুর মন তো উলটে উত্তপ্ত হয়েছে। এ উত্তাপের হেতু কি ?

ওরা তো জানে এ সংসারে ওদের সংসারি হওয়ার কোনো আসা নেই—কোনো ভরসা নেই একান্ত আপন করে একটি নারীকে পাওয়ার, ওরা গৃহে থেকেও গৃহী নয়। সমস্ত রিপুর উদ্বেল তাড়না নিয়েও সন্ন্যাসী।

শুধু শুধুই অমিয় গেরুয়া ছেড়ে এসেছে।

গৌরী আবার বলে, এমনি যদি দুটি বৌদি হত !

ওরা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে একটু হাসে। মেয়েটার তো খুব ঔদ্ধত্য ! এই কদিনেই যা পরিচয়, ও-ও যেন পেয়ে বসেছে ।

ওরা স্নান সারে তাড়াতাড়ি।

দীপাদিকে দেখলে সত্যি মন ভরে যায়। গৌরী আবার একা একা বলে, এমন মেয়ে পাওয়া ভার ।

অমিয় প্রশ্ন করে, তোর চেয়েও কি সুন্দর ?

কি যে বলেন বাবুজি, আমরা ওদের পায়ের যোগ্য নয়। ওদের কত বিদ্যা ! কত জৌলুস !

তাবও কোনো দাম নেই রে।

এ মন্তব্যের কিছুই রহস্য বুঝে উঠতে পারে না গৌরী। সে বোকার মতো খানিক চেয়ে থাকে। ও-ও হয়ত প্লাস্টিকের খেলনা।

না বাবুজি, একটু ভাল করে চেয়ে দেখবেন। বলেই নত নেত্রে গৌরী ভরা বালতি তোলে।

দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে এ বলিষ্ঠ রূপের বুঝি তুলনা হয় না। গৌরী হয়তো বোঝে না, ওর জন্য কিন্তু কেন যেন অমিয়র হৃদয় দগ্ধে ওঠে।

অমিয় বাংলোতে ঢুকে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে দেখে যে আর্শিতে এসে যেন একটি সদ্যস্নাতা আকুল কুন্তলা মেয়ের প্রতিবিম্ব পড়েছে পিছন থেকে।

দীপা নাকি ? দেরী হচ্ছে দেখে বুঝি নিজেই ডাকতে এসেছে ?

না।

অন্য একটি মেয়ের ছবি পড়েছে।—অমিয়বাবু চিনতে পারছেন ?

কেন পারব না মালতী ?

মালতী সরে যায়। আসে তার ভাই পীযূষ।

কিন্তু ভিড়ের মধ্যে প্রথম চেনাই যায়নি। ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের দীর্ঘ মেয়াদী যাত্রীরা কিছুতেই উঠতে দেবে না এ কামরায়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে এমন ভিড়। সুমুখে গ্রহণের স্নান, যাত্রী চলেছে পাঁঠা বোঝাই হয়ে।

অমিয় নতুন কলকাতা চলেছে চাকরির খোঁজে। তখনো দারোয়ানজি বেঁচে রয়েছে। ছোট ছোট চুল বোকা বোকা চাহনি সে আবার না মার খায় বাইরের ছাতা লাঠি, — এতখানি পথ সে তো প্রায় দাঁড়িয়েই এসেছে।

এমন সময় জানালা গলে একটা ষণ্ডামার্কা ছেলে অমিয়র গায়ে এসে পড়ে। আশ্চর্য, কাদা কোথায় ঠিকই চিনেছে! অমিয় মুখ কাঁচুমাচু করে সরে যেতে চায়। আমি কিছু বলিনি মশাই। আমায় ছেড়ে দিন।

কিন্তু তাকেই সবলে জড়িয়ে ধরে। কোথায় চলেছ সুখলাল? খৈনির চালান দিতে নাকি? তারপর খবর কি—অমিয়?

কলেজে পড়া ছেড়ে সেই যে ডুব দিলি, আর এই। কেমন আছিস পীযূষ? তুই কি অন্য কোনো কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়েছিস?

না তবে পাশের ফল লাভ হয়েছে।

বস্ বস্—কী বললি বুঝলাম না।

তুই তো নেমন্তন্ন করলি বসব কোথায়। আচ্ছা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলছি: চাকরি পেয়েছি একটা।

সত্যি নাকি? আমি তো দরখাস্ত করে করে হয়রান। কি চাকরি? তুই সত্যি মাইরি যোগাড়ে ছেলে। বি. এ. পাশ করে কি লাভ হল? এখন একবারে সরেজমিনে চলেছি, খাস গোলামখানায়।

ওরে সুখলাল পাশ করার একটা অর্থ আছেই পরিশ্রম বৃথা যায় না।

অমিয়র এ কথা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সতর্ক না করে অন্য কথায় চলে যায়। ও নামটা তো তোর ঠিকই মনে আছে।

বা! থাকবে না, রাখলাম স্নেহ করে।

আচ্ছা চুপ কর, বল এখন কি চাকরি করছিস?

সরকারি চাকরি। ক্লার্ক—আপার ডিভিসন।

বলিস কি! ঈর্ষায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সদ্য গ্রাজুয়েটের চোখ। আমরা তো এখন একটা লোয়ার ডিভিসন পাবো না। মিছি মিছি দুটো বছর খুইয়েছি।

তা বটে মামা ছাড়া কিছুই হয় না।

এই ভাগ্যবান যুবকটির দিকে আমরা দু'চারজন ট্রেন যাত্রী হেসে চেয়ে থাকে। যাদের বুক পকেটে রয়েছে অনেকগুলো ডিগ্রি—গরম এবং ঠাণ্ডা।

কিন্তু মামার অভাবে তাদের কিছুই হচ্ছে না। তারা বসতে অনুরোধ করে পীযূষকে।

অমিয় মন্তব্য করে চাকরিটা চমৎকার জুটিয়েছিস যা হক।

পীযূষ গম্ভীরভাবে বলে, তবে ছেলের নাম পদ্মলোচন হলেও কানা। এ ডিপার্টমেণ্টটা স্থায়ী হলেও আমার টেম্পোরারি। অনেকে ষোল সতের বছর ধরেও নাকি পাকা হতে পারেনি।

অমিয় কিছু বলে না, ট্রেনসুদ্ধ সবাই বলে, সে হোক, তবু তো একটা চাকরি। ধরুন না ওকে শক্ত করে। এই হয়ে গেল সাত পুরুষের ভাগ্যির। তারপর অগুনতি টেম্পোরারির চাকরি দেয় সকলে। মনে হয় এ যুগটাকেই কৌশলে সাজানো হয়েছে ক্ষণস্থায়ী করে—

শুধু অমিয় কিছু বলে না। কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে আসে এই নবীন গ্রাজুয়েটের দৃষ্টি। এবার দুজনে জায়গা খালি করে জোর-জুলুম করে বসায় অমিয় ও পীযূষকে। একজন জিজ্ঞাসা করে, অ্যাড্রেসটা বলবেন স্যার?

আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়ে দীপার। কিন্তু কাছে এসে ডাকে গৌরী সদ্যস্নাতা। চলুন ভাত জুড়িয়ে যাচ্ছে।

অমিয় ও বিনয় রান্না ঘরের দিকে চলে যায়।

অমিয় বলে, বড্ড দেরি হয়ে গেছে আমাদের, কি বলিস? ওঁর কষ্ট হচ্ছে

তোর আর কেশবিন্যাস হয়ই না। মুখ মেজেছিস অন্তত দশবার।

দুঃখের বিষয় তোরটা আমি হিসেব রাখিনি। আমার ডিগ্রিতে কুলোবেও না। ভাবছি একজন পাকা অ্যাকাউন্টেন্ট রাখব। তখন দেখা যাবে, এখন চুপ কর।

মাত্র তিন জন। টেবিল চেয়ারেই ব্যবস্থা হয়েছে। সুশীল ও গৌরীকে পৃথক পৃথকই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা কিছুতেই খাবেনা এঁদের খাওয়া না হলে। কারুর কিছু লাগলে কে দেবে?

তোমরা বস ভয় নেই—আমার আন্দাজ আছে। দীপা বলে, আমি একবারেই বুঝে দিতে পারবো।

ওরা অমিয়র মুখের দিকে সকরুণ তাকায়।

এ ব্যাপারে অমিয় কী করবে?

বিনয় বলে, যা বলছেন তাই করো।

দিব্যি মুখোমুখি তিনজন খেতে বসেছে। সকলেই শিক্ষিত চালচালে পাকা কিন্তু তেমন কোনো কথা হচ্ছে না। একটা কেমন যেন অস্বাস্ত বোধহয় অমিয় ও বিনয়ের।

ঝড়ের রাত্রে শিউলিকে তো বিনয় এত সমীহের চোখে দেখেনি। প্রথম

দিনেও সে বাংলোতে বলে একটু চটুলতা প্রকাশ করেছে। আজ তার কি হল? অগত্যা সে বলে, রান্নাটা বেশ হয়েছে কী বলিস অমিয়?

সুশীল তো মন্দ রাঁধে না।

গৌরী বলে, দীপাদি রেঁধেছেন।

অমিয় নিজের ভুলের জন্য একটু কুণ্ঠা বোধ করে। তাই নাকি? আমি তো জানতাম না। সত্যি চমৎকার হয়েছে রান্না।

দীপা বলে, ভাড়া কত তা তো ঠিক করলেন না।

বিনয় বলে, ওর জন্য কি? সে জন্য ভাববেন না।

অমিয় বলে কদিনই বা থাকবেন—আমাদের তো ভাড়া দিতেই হত। আপনাদের জন্য তো বাড়তি কিছু লাগছে না।

তবু আমাদের দিতে হবে। কিছু না দিয়ে থাকায় অনেক অসুবিধা। ধরুন, জল বাথরুম এসব কমন সবাইর পছন্দ হবে না।

আমরা তো অতটা ভাবিনি। অমিয় চিন্তিত হয়ে পড়ে। মাংসের বদলে চাটনি ঢেলে নেয়। না হয়—

একটা পার্টিশনেরও দরকার।

বিনয় বলে, তা তো বটেই।

এসব শুনে অমিয়বাবু নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হচ্ছেন। ভাবছেন, এঁরা সেধে যেচে এসে এসব কি দাবি তুলছে! বলছি আপনাদের দুটি নিরীহ বন্ধুর শান্তির জন্য। কদিন যেতে না যেতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন!

দুজনেই একসঙ্গে বলে, না, না—আমরা তা হব না।

ধরুন একটা দামী ঘড়ি কি পেন ভাঙে যদি কেউ। ওরা তো ছুটির কদিন তোলপাড় করে ছাড়বেন।

দুর দুর আপনি যে কী সব বলছেন। এসব শুনে দু বন্ধুরই মাথা গুলিয়ে যায় আর বেশি কিছু বলতে পারে না।

ঠিক বলছি। একবার নাকি ইলার এক ছড়া হার খোয়া গেল, বড্ড নাচুনে মেয়ে, শেষটায় সবাইর লজ্জা পেতে হবে অবশ্য আমি সেবার সঙ্গে ছিলাম না?

তিন জনেই নীরবে খেতে থাকে। সত্যিই কারুর কিছু চাওয়ার দরকার হয় না। দীপা নিঃসঙ্কোচে তার ভাগেরটা শেষ করে।

অমিয় কেবলই ভাবে, দীপা একটি টাইপ মেয়ে।

শিউলির সঙ্গে কোনো চারিত্রিক মিলই খুঁজে পায় না বিনয়।

দীপা বলে, ঘড়ি পেন না ভাঙল—এই ধরুন যদি একদিন ঘুম থেকে উঠে

দেখেন যে একশ টাকার একখানা নোট নেই, তখন কাকে ধরবেন!

এবার আরো রিমঝিম করে দু-বন্ধুর মাথা।

দীপা, অমিয় মুখ ধুয়ে আসে।

অমিয় হেসে বলে, আমি ভেবেছিলাম আপনারা মা-বোনের মতো এসেছেন—আচ্ছা থাক অনুপাত মতো ভাড়া দেবেন, আর যা যা দরকার আমি করে দেবো।

খুশি হলাম শুনে, ধন্যবাদ। আপনাদের ঝিটি তো বড় সুন্দর। উত্তরের অপেক্ষা না করে দীপা চলে যায়।

ডনাত্র

দেখলি অমিয় এ আর কিছু নয় কাল কেউটে।

অমিয় বলে, দেখলাম—আরো দেখেছি। আজ তাই মনে পড়ছে।

উঃ! আমাদের ওপর কি কটাক্ষ! আর ওরা যেন সব সাধ্বী সতী। জানি সমস্তই। এ জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছি।

তবু কিছু বাকি ছিল, তাই এবার দেখ। খাল কেটে কুমির আনা হয়েছে।

আমরা আনিনি—পায় ধরে এসেছেন। বিনয় হাত ছেড়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। একটা আকাশ ঠেকান পার্টিশন তুলে দেব কাল। আর বিকেল বেলা থেকেই চা জলখাবার রান্নাবান্না সব আলাদা। এইসব ভেবেই বুঝি মাংসের দাম দিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের কিছু ছোঁবেন না, আচ্ছা দেখা যাবে বিকেল থেকে। গোমড়াতে গোমড়াতে বিনয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

অমনি ঘর ঘর করে রেলের চাকার শব্দ অমিয়র কানে এসে ঢোকে।

পীযূষ জিজ্ঞাসা করে কলকাতায় গিয়ে উঠবি কোথায়?

তার তো ঠিক নেই। তোর সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে তখন ভাবিনে। তুই-ই একটা একটা ব্যবস্থা করে দিবি। তেমন কিছু হাতেও নেই।

আচ্ছা চলতো। স্যার অ্যাড্রেস তো বললেন না? শেয়ালদা প্রায় এসে পড়ল।

১৯X রাসবিহারী অ্যাভিনিউ।

কোন্ সময় গেলে দেখা হয়?

তা দশটা পাঁচটা বাদ দিয়ে যখন যাবেন। বালিগঞ্জের তিন কোন্ পার্কের কাছাকাছি। পীযূষ একটু ভেবে বলে চিঠি লিখে গেলে আমি বাড়ি

থাকতে পারি। আর ঠিকানা খুঁজতে অসুবিধা হলে পার্কের ক্লাবে আমার কথা বলে রাখবেন সন্ধ্যার পর দেখা হবে। আমি ওখানকার সেক্রেটারি। ওখানেই দেখা করবেন—সেই ভাল।

ওর চেহারাটার দিকে সকলে তাকায়। পীযূষ তা যেন দেখেও দেখে না।

একটু কিন্তু উপকার করতে হবে। আমি বি. কম পাশ করে ল পড়ছি। আর চালাতে পারছিনে।

তা যাবেন আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। এমন আমাকে অনেক করতে হয়।

নমস্কার।

প্রতি উত্তরে একটু শুধু হাত তোলে পীযূষ।

পীযূষ ও অমিয় শেয়ালদা নেমে আসতে আসতে একেবারে সোজা অনেক দূর এসে পড়ে। অমিয়কে নিয়ে কাঁচা একটা গলির ভিতর ঢোকে। কাঁচা ড্রেন পাইখানা আরো খানিকটা এসে সে একখানা মেটে ঘরের তালা খোলে। দেয়ালে যেমন দশ নম্বর, প্রিন্স কলিমুদ্দি লেন।

এই কি বালিগঞ্জ?

না রে, বালিগঞ্জে তুই থাকবি কী করে?

অমিয় অবাক হয়ে যায়। তবে তুই কি এখন বালিগঞ্জ গিয়ে থাকবি আমায় একা ফেলে?

পিছন থেকে নিঃশব্দে একটি মেয়ে এসে দাঁড়ায়। হাতে তার হ্যাণ্ড ব্যাগ—পরনে একখানা অল্প দামের হলেও ইস্তিরি করা শাড়ি, পায় ছ'সাত টাকা দামের স্যাণ্ডেল, মুখ পানের রসে গাঢ় লাল। বেশ লম্বা কিন্তু বেমানান নয়।

তুই এলি কোত্থেকে?

কেন, বেলতলা থেকে

বাবা, মা?

সে খোঁজে আর তোমার দরকার কি?

নটু?

সে মামার বাড়ি।

কেমন আছে পড়ছে তো?

হুঁ, ভালই আছে। একটা পয়সাও কি দিচ্ছ সে পড়বে?

এই যে সেদিন দশটাকা পাঠালাম তোরা পাসনি?

আর এত মিথ্যা কথাও বলতে শিখেছ! এখন চুপ করো, দোর খোলো একটু জিরিয়ে নি।

অমিয় একেবারে হতভম্ব হয়ে যায়। সে ছুটে পালাবে না কী করবে কিছু ঝতে পারে না।

দরজা খোলা হয়েছে। অমিয় ভিতরে ঢুকছে না। মেয়েটি বলে, ওকি আপনি লজ্জা পেলেন কেন? আমি ওঁর বোন। ভালই হল এসে—দাদাটি আমার এক নম্বর ইয়ে। ওঁকে কখনো বিশ্বাস করবেন না। ভিতরে আসুন।

অমিয় ভিতরে আসে বটে, কিন্তু ওঁর আত্মাটা যেন এই রোদের মধ্যে চিৎকার করে ছুটে পালায়।

একটা স্যাঁতসেঁতে ঘর। দোতলা পর্যন্ত ড্যাম্প উঠেছে। ছেঁড়া মাদুর দু'তিনখানা পরপর বিছনো। সুমুখে একটা তোলা উনান, কিছু ভাঙা কয়লা। তাই হয়ত কখনো আঁচ পড়ে কখনো পড়ে না। নিকটের বাসনপত্রের দিকে চাইলে অন্তত মনে হয়। এই কি আপার ডিভিসন ক্লার্কের বাসা-বাড়ি

অথচ পীযূষের পরনে মিহি ধুতি পাঞ্জাবি।

এই সব কারণেই বোধ হয় ও সেই ছেলেটিকে পার্কের ঠিকানা দিয়েছে। এখন ও ছেলেটি ঠিকানা খুঁজে পেলেই ভাল হয়। অমিয়র ভাগ্যে যা ঘটার তা ঘটেছে।

বস অমিয়, বিশ্রাম কর—আমি আর যাই কই. তোর সহপাঠী—তোর ভয় নেই।

তা নেই বটে, কিন্তু তুই যে মিথ্যে ঠিকানা দিলি ট্রেনে বসে?

সত্যি ঠিকানা দিলে অভাবের কাঁদুনি গাইলে কি বোকা ওরা আমাদের তোয়াজ করে বসতে দিত ভিড়ে? কী খাবি মালতী?

আবার কি, ভাত। চাল-ডাল নিয়ে এসো।

দুটো টাকা দেতো অমিয়?

এই যে, দু টাকাই কি লাগবে?

হ্যাঁ, ভয় নেই। সন্ধেনাগাত দিয়ে দেবো।

মালতী বলে তা হলে একটু মাছ এনো—অনেকদিন ইলিশ মাছ খাইনি

অমিয়র পিত্ত জ্বলে যায়।

কার সঙ্গে এসেছিস কলোনি থেকে?

কুঞ্জর সঙ্গে।

কুঞ্জ কে?

বাবার বন্ধু। বিরাট অবস্থা।

সেই যে তাঁতি ছোকরা? তোর ওর সঙ্গে চলাফেরা ভাল দেখায়না। আর বাবা মায়ও যে কী হয়েছে।

কিছু হয়নি দাদা। কুঞ্জ নইলে এখন আর আমাদের সংসার চলে না। অমন পরোপকারী ছেলে নেই ও কলোনিতে। সেবার বাবার টাইফয়েড হল —কুঞ্জ, এবার পুজোর সময় কারুর কাপড় নেই—কুঞ্জ, মাঝে মধ্যে তো রয়েছেই যখন যা চাও যেন দানসত্র খোলা।

তবু—যারা কলোনি থেকে আসে—

আমাকে নিন্দে করে? সইতে না পারলে একটা হিল্লে করে দাওনা, তোমার তো কত বন্ধুবান্ধব রয়েছে, এখন যাও দেখি বাজারে, খিদেয় ভদ্র-লোকের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।

পীযূষ চলে যায়, অমিয় মুখ নত করে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে মেয়েটাকে। বয়স হয়েছে প্রায় ছাব্বিশ কি সাতাশ। কৃশমুখে একটা দীপ্তি আছে—কিন্তু চোখের কোণায় কোণায় মরা চাঁদের অন্ধকার। তবু দেখতে ভাল লাগে। সব কিছু যেন তলিয়ে বুঝতে অমিয়র কষ্ট হয় না। অথচ এখনো ঠিক সব বোঝা যাচ্ছে না।

এবার অমিয় ইচ্ছা করলে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু জামা খুলে রেখে একটা আধভাঙা পাখা তুলে নেয়। বড্ড গরম।

আমার হাতে দিন—বাতাস করি। দাঁড়ান একটু শাড়িটা বদলে নি। মেয়েটি বিনা দ্বিধায় পীযূষের সুটকেস খুলে একখানা মিহি ধুতি বার করে। নিঃসংকোচেই সে শাড়ি বদলায়। এখন পাখাটা দিন তো।

অমিয় আপত্তি তোলে। এক্ষুনি হয়ত পীযূষ এসে পড়বে। কথাটা বলেই সে নিজে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে—বড্ড যেন খাপছাড়া শোনাল।

আমি তো কারুর ভাতে-কাপড়ে না যে ভয় করব। অন্য কোথাও ওঠার জায়গা থাকলে এমন ঠক-জোচ্চোরের আওতায় এসে উঠতাম না। আপনি মশাই সাবধান।

হুঁশিয়ার হবে কার সম্বন্ধে?

অমিয় মিহি ধুতি পরা এই বয়স্কা মেয়েটির মুখের দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখে। তারপর তার সর্বাঙ্গে চাহনি বুলিয়ে নেয়। অমিয়র মনে কেমন যেন একটা আবছা সন্দেহ হয়। চোখে মুখে কুমারীসুলভ চটুল হাসি আছে—কিন্তু শরীরের সে বাঁধন কই? বয়স ছাড়াও যেন ব্যভিচারের ইঙ্গিত রয়েছে সুস্পষ্ট। ভাল করে কিছু না বুঝতে পেরে সে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

সাবধান হবে কার সম্বন্ধে?

অমিয়!

পীযূষ ডাকে না—ডাকে বিনয়।

চল ওঁদের বিব্রত না করে বরঞ্চ আমরাই একটা বাসা খুঁজে উঠে যাই। যেখানে পরস্পরে বিশ্বাস নেই, সেখানে থাকা উচিত নয়। ধর আমরা যদি বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে চেপে আসতাম, জলেও পড়ত না।

এত অভিমান ভাল নয়—আর অভিমান কোথায় সাজে তাও ভেবে কাজ করতে হয়। তুই আজ একটু যেন বেশি অধীর হয়ে পড়েছিস।

এ কথা সত্য। শিউলি যেন ওকে আঘাত দিয়েছে—কিন্তু সে তো মরে গেছে বহুদিন। আজ সে জীবিত থাকলেও মৃত্যুটাই বিনয়ের কাছে সত্য নয় কি? কিন্তু তা তো হচ্ছে না। একটি রাত্রির পরিচিতা, ভোরে—ঝরে-যাওয়া শেফালি আজ আসছে দীপার দীপ্তিতে। কিন্তু একি নির্মম উক্তি তার।

অধীর হইনি অমিয়। বড় অপমান বোধ হচ্ছে।

এই অপমানের বোঝা নিয়েই ক্লান্ত সভ্যতা আজ পথ চলছে। শোন একটা গল্প বলি—

আবার সেই ভুতুড়ে গল্প নাকি? এখন সে মেজাজ নেই।

না। সত্য ঘটনা আমার জীবনেই ঘটেছে।

গৌরী এসে সম্মুখে দাঁড়ায়।

কি গৌরী? মুখখানা যে কালো দেখাচ্ছে? হঠাৎ গলার স্বর নরম হয়ে আসে অমিয়র কী যেন কী এক স্বর্গীয় স্নেহে।

বাবা এসেছে, পাঁচটা টাকা চাইছে।

ভিতরে আসতে পারি কি?

আসুন, আসুন। অমিয় উঠে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ও।

চা খাবেন না? কারুকে না দেখে আমাকেই ডাকতে আসতে হল। দীপা বলে, কোথায় কোথায় থাকো গৌরী যে ডাকলে পাওয়া যায় না? কাজ রয়েছে রান্না ঘরে, তুমি এখানে, সুশীলের পাত্তা নেই। তারপর একটু বঙ্কিম হাসি হেসে বলে, ঘরসংসার তো নেই, আশকারা দিয়ে এ দুটিকে মাথায় তুলেছেন। চলুন, চা জুড়িয়ে গেল।

গৌরী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এঁর সম্বন্ধেই সে না আজ দাখিল করছিল প্রশংসাপত্র।

অমিয় পাঁচ টাকার নোটখানা পকেটে রাখে।

মাহাতো ঢোকে অন্য দুয়ার দিয়ে।

সেলাম মহারাজ।

অমিয় কটমট করে তাকায়।

মাহাতো তা দেঁতো হাসিতে উড়িয়ে দিয়ে বলে, পাঁচ টাকা দিলে হোবে

না সরকার। মেয়ে আমার বড্ড দুবলা (রোগা) হয়ে গেছে—ছেলেপুলে না খেয়ে রয়েছে, দশ টাকা লাগবে।

নাও ভাগো, অমিয় দশ টাকার নোটই একখানা ছুঁড়ে দেয়। দিয়ে, দীপাকে বলে, চলুন। সত্যি এরা মাথায় উঠেছে।

অমিয়, বিনয় দীপা চলে যায় একে একে—মাহাতোও সেলাম জানিয়ে চলে যায়। শুধু গৌরী যেন অন্ধকারে সাজা খাটে একাকিনী নির্জন সেলে।

ত্রিশ

যা যা বিনয় ভেবেছিল কিছুই করা হয়না। যেন গর্তের থেকে গোমরান সাপকে মন্ত্র পড়ে টেনে এনেছে দীপা। এ মহিমাময় শক্তি কী করে অর্জন করল ঐ নারী? না সব নারীর কোমলতা ও ভঙ্গুরতার অন্তরালে অমনি একটি পুরুষালি তেজ থাকে, যা মাঝে মাঝে শুধু চমক দিয়ে যায়?

বিনয় ও অমিয়কে দেখে মেয়েরা বলে, আর দেরি করলে এসে দেখতেন যে পেয়ালা খালি।

অমিয় বলে সকলি আপনাদের অনুগ্রহ।

দীপা ধীরে ধীরে বলে, বুঝলাম না।

যখন ইচ্ছে, যেমন খালি করেও দিতে পারেন তেমনি পারেন মুহূর্তে ভরে দিতে।

ও! আরো কি চা লাগবে?

আপাতত নয়। তবে যদি আবার গলা শুকিয়ে যায় সুশীলও দিতে পারবে।

কেন সুশীল তো আমায় এগিয়ে জুগিয়ে রান্নার সাহায্য করে। গৌরী রয়েছে।

সুশীল স্থায়ী, গৌরী অস্থায়ী—আপনাদের দরকার না হলে বিদায় করে দিতে পারেন। একটু জল তোলা, কাপড় কাচা নিজেরাও করে নিতে পারবেন।

ভেবে দেখব জিজ্ঞাসা করতে হবে সবাইকে।

দেখুন মিটিং ডেকে সব হয় না। আচ্ছা এখন তবে উঠি।

বাইরের বারান্দায় এসে বিনয় অমিয়র পিঠে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে বলে, ব্রেভো চমৎকার অ্যাকটিং করেছিস।

নিজের থেকে বেরিয়ে এলো—রুখতে পারলাম না।

ও কথা বলিস নি, পণ্ডিতেরা বলবে বুদ্ধি নেই, ভাবের ফানুস—এই যেমন নভেলিস্ট শরৎচন্দ্র।

কিন্তু সেই তো সারা বাঙালির চিত্ত জয় করেছে!

তা হলে অমিয় ওকি জয় করে নেবে এই বাংলোটার সমস্ত চিত্ত। মনে মনে ভয় হয় বিনয়ের। সন্ধ্যার অন্ধকারে অমিয় তার ফ্যাকাশে মুখখানা দেখতে পায় না, ভাল করে।

এক ঝলক হাওয়া আসে বাগানের ওপর থেকে গড়িয়ে। বিনয়ের কাছে যা তপ্ত মনে হয়, অমিয়র কাছে লাগে স্নিগ্ধ! পীযূষের বোন মালতী যেন পাখা চালাচ্ছে।

সেঁতসেঁতে ঘর, বেলা প্রায় দুপুর।

গল্পটা শুনবি বিনয়, একটা ফার্স্ট ক্লাস শর্ট স্টোরি।

বল শুনি।

এমন মরা গলায় কথা বলছিস কেন?

একটি একটি করে যে ছুটির দিন ফুরিয়ে এল।

রাম নামের ভিতর ভূতের কাহিনি। বুঝলাম তোর আগ্রহ নেই—তাহলে আমায় বলেও কাজ নেই। এখানে কি—না আনন্দ পাচ্ছি। ছুটি ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে কান্না। একটু হাসতে চেষ্টা করে অমিয়।

পীযূষের বোন বলে, আপনাকে তো কিছু বলিনি যে চুপচাপ রয়েছেন?

অমিয় হকচকিয়ে তাকায়। একটু যেন আনমনা হয়ে পড়েছিল।

আবার বাংলো থেকে সেই মেটে ঘর—আপার ডিভিসন ক্লার্কের বাসা-বাড়ি এক সন্দেহ দোদুল পরিবেশ।

আপনার নাম?

অমিয় রায়।

যেমন দেখতে, তেমনি নামটি। দাদার কলেজি বন্ধু নিশ্চই?

নিজের চেহারা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল অমিয়, সে রাঙা হয়ে জবাব দেয়, হুঁ।

বিয়ে-থা করেননি বুঝি?

আবার কোনো সম্বন্ধের প্রস্তাব করবে নাকি? কিছুই বিচিত্র নয়। সে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি জবাব দেবে ভাবে, কিন্তু মুখ খুলতে ভুলে যায়।

চাকরির খোঁজে এসেছেন কলকাতায়? তা মুরুব্বিটি ঠিক পাকড়েছেন। চটুল হাস্যে ঘরখানা অনুরণিত করে তোলে মালতী। একটু পাখাটা থামে, একটু চোখ দুটি লীলায়িত হয়। সে ফের বলে, মনে ধরলে আমি একটা

খোঁজ দিতে পারি চাকরির। এখন টেম্পোরারি হিসাবে করবেন, একটা ভাল জুটে গেলে পারটাইম হিসাবে চালিয়ে যাবেন, কি বলেন – পারবেন না?

অমিয় বিস্মিত হয়ে ওর কথা শোনে। মুখের দিকে চায় চুরি করে কয়েকবার। কী খেয়ে মেয়েটা এত রঙ্গ-তামাশা করে? ওর মত যে অবস্থায় পড়লে তো অমিয়র বাক্‌শক্তি রোধ হয়ে যেত অনেক দিন! ভাটা এলেও জোয়ারের পূর্ণ আমেজ এখনো ওর দেহে। ও নতুন এক ধরনের গ্রাম ও নগরের মাটি এবং ইঁটের সংমিশ্রণ।

কি মশাই জবাব দিচ্ছেন না—কেন? আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না? মালতী একটা ঝাঁকুনি দেয় অমিয়র কাঁধে।

বেকারের কাছে চাকরির কথা, চুম্বকের কাছে যেন লোহা। নিতান্ত অবিশ্বাস্য হলেও শিরায় কৌতূহল সঞ্চারিত হয়, কিন্তু তা মালতী স্তব্ধ করে দিয়েছে এক ঝাঁকুনিতে।

দীপাও এমনি দু বন্ধুকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল আজ দুপুরে।

মালতী ফের বলে, আপনি কি বোবা? চাকরি-বাকরি হলেও তো কেউ আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না!

কি চাকরির কথা বলছেন?

একটা এজেন্সি নিতে বলছি।

কিসের?

ঘটকালির। আমাদের মতো মেয়ে আছে আইবুড়ো। যদি একটা মাত্র লাগাতে পারেন, তা হলেই আপনার বরাত খুলে যাবে। কত বাপ মা যে এসে হত্যা দেবে অবিশ্যি আমার বাপ মা সে ধাতের নয়। তাই আমারটা আমিই প্রপোজ করছি। তারপর কণ্ঠস্বর হঠাৎ নিখাদে নামিয়ে মালতী বলে, প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা খরগোশ গিনিপিগের ওপর দিয়েই হওয়া ভাল—কি বলেন? মরলে কেউ বলবার নেই।

অমিয় আর দেরি করতে পারেনা। ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, কী পর্যন্ত পড়েছেন আপনি—।

বাঃ চমৎকার। আপনি ঠিকই পারবেন এজেন্সি নিতে। তেমনি প্রশ্নটি করেছেন।

কিন্তু তবু অমিয়র এ কৌতুকের ঝংকার অসহনীয় হয়ে বাজে সে আবার জিজ্ঞাসা করে।

আচ্ছা আপনি চাকরি পেলে তখন না হয় বলব। এখন একটু ঘরদোর মুক্ত করি। দাদা এসে পড়বে এক্ষুনি।

এই চটুল রহস্যময়ী নারীর ভিতর অমিয় দেখতে পায় একখানা অশ্রু-সজল মূর্তি। কত দুঃখে কত বেদনায় সে যে খরগোশ গিনিপিগের সঙ্গে নিজেকে সমগোত্রীয় করেছে। মা বাবা ভাই—অভিভাবক বলতে সকলেই আছেন কিন্তু তবু যেন কেউ নেই। আকাশে সহস্র নক্ষত্র আছে শুধু যেন চাঁদের আলোর অভাব।

পীযূষ এসে ঘরে ঢোকে। ইলিশ কেন কোনো মাছই পাওয়া গেল না। বড্ড অসময় হয়ে গেছে।

যাক ফিরে এসেছ যে এই যথেষ্ট চাল ডাল পাওয়া গেছে তো?

তোর কেবল বাঁকা কথা—তা পাওয়া যাবে না কেন?

কলকাতা শহর, বললে যে এখন রেশন দোকান খোলা নেই, খুলবে সেই চারটায় বিকেলে। এমন হওয়া আশ্চর্য নয়—চাল ব্ল্যাকে কিনতে হল। এ কুম্ভের দানছত্র নয় যে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে।

ক্ষুধায় সকলেই কাতর—মালতী হয়তো অধিক পরিশ্রান্ত। সে বলে কুম্ভ যা করে, তা পয়সা খরচ করেই করে, আপন-পরও তার ভেদ আছে—তুমি তো বাপ মা বন্ধুবান্ধবকেও রেহাই দাও না। বলতেই বলে, চোরনী মাগীর বড় গলা।

অমিয়র সমস্ত সহানুভূতি উঠে যায়। সে কানে আঙুল দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঘরের বাইরে। সে ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে বেড়ায়। ভাবে অনেক কথা। মনে পড়ে বাবাকে মনে পড়ে মার বাবাকে, মনে পড়ে মাধুদির শেষ চিত্রখানা। এখন দেখল এদের। এই তো পৃথিবী। বিষাক্ত ক্লেদাক্ত শুধু কর্দম। সে ধীরে ধীরে হাঁটে। ঘরের ভিতর ঢুকতে তার মন সরে না। আর পালিয়ে যাওয়ার মতো তার স্পৃহা নেই শক্তি নেই। কি জঘন্য দুনিয়াদারি।

কিন্তু এর ভিতরেই তার মা ছিলেন, আছে দারোয়ানজির মতো মানুষ। হয়তো আরো অনেকে রয়েছে যাদের পরিচয় কেউ জানে না। সেও খোঁজ রাখে না। বেলা গড়িয়ে যায়। ভাতের পর হয় ডাল। গন্ধ আসে সম্বারে। বেশ মিষ্টি এবং উগ্র। এবার ছ্যাক্ ছ্যাক ভাজার শব্দ।

কোথায় গেলেন ভদ্রলোক? মালতী হলুদ-রাঙা হাতেই বেরিয়ে এসে ডাকে। আসুন, রান্না হয়ে গেছে, কলেও জল এসেছে, স্নানটা সেরে নিন।

মুখে সেই গাঢ় পানের রস—প্রসাধন এলোমেলো, তবু একটা টান আছে—হঠাৎ দ্বন্দ্ব জাগে সত্যিই কি এ মেয়ে জঘন্যা?

ওকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চালের খড় গুনছেন নাকি?

না—। ভাবছি এখন স্নান করব, না মাথা ধোব।

ঠিক করতে না পারলে আস্থন বলে দিচ্ছি। দাদা তুমি কি করবে?

কিছু না আগে খেয়ে নেব।

অমিয় বলে, তবে আমাকেও ভাত দিন।

মালতী বলে, সেই ভাল, আমারও পেট জ্বলছে। সেই কোন সকালে বেরিয়েছি! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি অনুগ্রহ করে বন্ধুর ফাঁদে পা দিলেন। চলুন, মুখহাত অন্তত ধুয়ে আসবেন। কিন্তু আমার জন্যে দু মিনিট সবুর সইতে হবে, আমি স্নান না করে পারব না। সেই সন্তস্নাতার ছবি পড়েছিল আরশিতে! আমাকে কি চিনতে পারছেন অমিয়বাবু?

অমিয় ও পীযূষ গিয়ে হাত ধুয়ে আসে কলতলা থেকে। এক সময় ভাত বেড়ে নেয় মালতী। কিছুক্ষণ তিন জনেই চুপচাপ—মুখে সব কিছুই অনবদ্য ঠেকছে। একটু বাদে অমিয় বুঝতে পারে যে বড়ায় অত্যন্ত ঝাল হয়েছে। কারণ তার চোখ মুখ দিয়ে জল ঝরছে উত্তপ্ত।

মালতী প্রশ্ন করে, কেমন রান্না হয়েছে?

ভাল, উঃ! একটু জল।

গেলাস নেই। ডালের পাত্রটা সবে খালি হয়েছে। অর্ধভুক্ত মালতী ওটা নিয়ে উঠে যায়। হাত মুখ ও পাত্রটা ধুয়ে জল নিয়ে আসে। এই নিন। এমন কচি খোকা তো দেখিনি। এমন করলে বড় হবেন কী করে?

উঃ আমি উঠি, আমার পেট ভরেছে। আমি চিরকাল ছোটই থাকতে চাই।

তুমি দাদা মুখ ধুয়ে খোকাবাবুর জন্য একটু মিষ্টি দৈ এনে দাও।

পয়সা?

না, না আমার তা লাগবে না।

আমার ব্যাগে রয়েছে পয়সা, তুমি যাও দাদা, তোমার তো প্রায় হয়েছে। আপনি মশাই ততক্ষণ একটু নুন মুখে দিন। নিরেমিষ এক খায় দুধ ঘিব জোরে আর নুন ঝালে।

পীযূষ চলে যায়।

মালতী বলে, দুঃখের কথা কচি ছেলের ঘরে দুধ নেই!

অমিয় চুপ করে শোনে! একটু কেমন যেন নেশা লাগে। পরমুহূর্তে ভাবে, এ মেয়ে যা খুশি তো বলবেই—এর মনের সব বাঁধনই তো ঢিলে। অতএব তাকে হুঁশিয়ার হয়ে সমঝে বলতে হবে। কিন্তু বল্গাহীন কথার এক অদ্ভুত স্বাদ আছে। তখনি অর্থ পাচ্ছে না কিন্তু ব্যঞ্জনা আছে নিবিড়তম। ঝালের বিষের চেয়েও তার মস্তিষ্ক রি-রি করে ওঠে।

দৈ আসে।

সে খানিকটা ঢেলে নেয়, বাকিটা রেখে দেয় মালতীর জন্যে।

মুখোশ খুলে যাওয়ায় পীযূষ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। সে একটা কাজের অছিলা করে সন্ধ্যার একটু আগে কেটে পড়ে।

ভয় নেই দাদা, রাত্রে আমরা আর কেউ চাল ডালের জন্য তোমায় বিরক্ত করব না। একটু কথাবার্তা বলি। কতদিন বাদে দেখা।

না রে সত্যি কাজ আছে।

তবে যাও। কিন্তু কুঞ্জ এলে আমাকে চলেই যেতে হবে—নইলে ভাড়ার টাকা পাব কোথায়?

আজ আর আসবেন না—এলে না হয় রাত্রে তাকে এখানে নেমন্তন্ন করিস।

কার ভরসায়? তোমার না ভদ্রলোকের?

আমাদের কারুর নয়—ঈশ্বরের ভরসায়।

এবার মালতী ব্যঙ্গ বা রহস্য না করে জবাব দেয়, সে ব্যবসাদার, বড়বাজারের কাজ শেষ হয়ে একটা মুহূর্তও নষ্ট করবেন না এখানে।

তবু তুই ইচ্ছা করলে তাকে এখানে রাখতে পারবি জানি। আমি চললাম।

মালতী নিজের মনেই যেন বলে, তুমি তাহলে কিছুই জান না দাদা, এখনো কিছুই বোঝ নি।

মালতীর এ অর্ধস্বগতোক্তি বিদ্ধ করে অমিয়কে। সব সে বুঝলেও একটু বোঝে কোথায় যেন একটা বিরাট অগ্নিদাহ রয়েছে—যা ভিতর থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার অবকাশ পাচ্ছে না কিন্তু ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে ক্রমেক্রমে।

একটু একটু করে মালতী সন্ধ্যা অবশেষে রাত্রের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। শুধু উনোনের স্তিমিত আঁচটায় একটা গমগমে অংশ অমিয়র নজরে পড়ে। ঐকি মালতীর হৃৎপিণ্ডটা?

অনেকক্ষণ নীরব থেকে মালতী বলে, ঘুমিয়েছেন নাকি?

না।

একটা কথা বলব?

বলুন।

হঠাৎ কি আমার একটা সম্বন্ধ দেখে দিতে পারেন না? আপনি পুরুষ মানুষ কত লোক চেনেন। যে কোনো রকম—যা হক একটা কিছু। কিন্তু এমনি একটা বড় শহর হওয়া চাই। আমার জন্য তার কিছু ভাবতে হবে না।

আমিই বরঞ্চ তাকে কিছু এনে দেব।

অমিয়র মুখে কোনো জবাব আসে না। সে বিমূঢ় হয়ে চেয়ে থাকে।

আচ্ছা আপনিই সাহস করে রাজি হয়ে যান না। আমি রোজ হাজার বিড়ি নামাতে পারি, আমার আড়াইটা টাকা নেয় কে? আপনার পছন্দ না হলে ছোট ছোট মেয়েকে পড়িয়েও মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা আয় করতে পারব। আপনার পায় পড়ি আমায় একটা মাস ট্রায়াল দিন।

পা সরিয়ে নেয় অমিয়। এ আপনি কি করছেন? কিন্তু আসল কথার কিছু জবাব দিতে পারেনা।

মালতীর নামের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে একটা উগ্র টর্চ প্রবেশ করে।—ওঠো ওঠো আর দেরি করা যাবেনা—নটায় ট্রেন।

আগন্তুকের জন্যই যেন মালতী অপেক্ষা করেছিল। সে এমনি ভাবেই ওঠে এবং শুধু একটা শুষ্ক প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

টর্চ জিজ্ঞাসা করে কে?

মালতী বলে, দাদার শিকার।

দুজনেই হেসে ওঠে।

অমিয় দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকে। কত সময় কেটে যায় তা যান্ত্রিক ঘড়ি থাকলেও হয়তো ধরা হত না। মালতী চলে গেছে কিন্তু উনোনের গমগমে আঁচটা একেবারে নেবেনি। বরঞ্চ আরো যেন জলন্ত দেখাচ্ছে জমাট অন্ধকার।

ধর ধর অমিয় এই মোমবাতিটা ধর—পড়ে যাবে।

পীযূষের হাতে চাল-ডালের ঠোঙা, তার ওপর একটা জলন্ত মোমবাতি, অমিয় তাড়াতাড়ি নামিয়ে দেখে—পীযূষ বাজারের সেরা একটা ইলিশও এনেছে।

মালতী কোথায়?

অমিয় এবারও নীরব হয়ে থাকে। সে কি বলবে? আজো তো জানেনা মালতী কোথায় কোন অন্ধকারে তলিয়ে গেছে।

দীপার কথাও ওরই মতো ধারাল। আজ সে রূপই প্রকাশ করুক না কেন, একদিন নির্ঘাত পা ধরে কাঁদবে? আজ যে ঘটনা ঘটেছে গৌরীকে নিয়ে, যে ইঙ্গিত দীপা দিয়েছে তাতে উচিত মুখ তুলে না চাওয়া। কিন্তু অমিয় কেন যেন সে প্রতিজ্ঞা করতে পারেনা।

সব ওলট পালট হয়ে যায়।

একত্রিশ

অমিয় এবং বিনয় যখন সুমুখের বাংলোর দিকে চা খেয়ে চলে এলো—তখন ভিতরের বাংলোতে মেয়েরা প্রসাধনে ব্যস্ত। ব্যস্ত হাসি ঠাট্টায় নানা কথায়। রুজ ক্রিম পাউডার, কাঁটা চিরুনি ছড়ানো টেবিলের ওপর। একটি মেয়ের হাত থেকে কতটুকু নেইল্ পালিশ পড়ে যায় শাড়িতে।

একটা ফিতে দিবি রেণু? আমারটা খুঁজে পাচ্ছিনা। অ্যাঁ—একি করেছিস? শীগ্‌গীর বাথরুমে যা।

উঠবে?

না উঠলে কাঁদবি? প্রথম একবার সববাই কাঁদে।

চুপ কর, তোর মত বেহায়া দেখিনি।

রেণু চলে যায় বাথরুমের দিকে। শীলা তার টেবিল থেকে একটা নতুন ফিতে তুলে নেয়। বেণী দুলিয়ে আসে ইন্দিরা। মুখে তার একটি গানের কলি। কোন শাড়িখানা পড়বে তা ঠিক না করতে পেরে হাঁপিয়ে ওঠে অনিমা। এখনও তার চুল বাঁধা হয় নি।

দীপা এসে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

কোথায় আর যাব ভাবছি ভূগোল নিয়ে বসব।

শীলা বলে, কাল সকালে আমার—

ফাজলামি নয়, জরুরি একটা কথা আছে।

আর একটি মেয়ে বলে, তা আমরা জানি, সুমুখের বারান্দায় আমরা কিছুতেই যাচ্ছিনে। ওখানে ভূত আছে।

দূর, ইয়ার্কি না মেরে সব শুনে নাও—তারপর জবাব দিও। কথা উঠেছে পার্টিশন, বাথরুম, ঝিটিকে নিয়ে। অবশ্য আমিই তুলেছি, কারণ দু দিন থাকতে হবে যখন, তখন সুখ সুবিধা আব্‌রু—বেআব্‌রুর প্রশ্ন দেখতেই হবে আমাকে।

তাহলে আর আমাদের ডাকছেন কেন?

তোমরা অফেনডেড্ হয়ো না। আমি যা কিছু করছি তোমাদের হয়েই বলছি। চাকরি করি নিকটে, মেয়ে মাস্টার—আমাদের সুনাম দুর্নাম পদে পদে। যেন এটা বিলেত কি রাশিয়া নয়। একটা কিছু হলে এক্ষুনি বস্ বলো পেট্রোন বলো সবই টের পাবেন হাওয়ার মুখে।

আমরা তেমন কিছু করব কেন? অনিমা বলে, আমরা কেউ কচি খুকি

নই। এসেছি হৈ-চৈ করতে দুদিন তাই করে যাব—ব্যস। মাথা যা ঘামাতে হয়, তা আপনি ঘামাবেন। পার্টিশন তুলতে হয় তুলুন, কল পাইখানা নিয়ে ঝগড়া করতে হয় তা করুন—আমরা কোনো ঝক্কিঝামেলায় নেই।

বেশ, খরচপত্তর?

যা লাগবে সবাই মিলে দেব।

তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।

শীলা বলে, আমার কিন্তু আছে।

সকলে বিস্ময়ে শীলার মুখের দিকে তাকায়।

এ ক্ষেত্রে শীলা যা বলে, শেলি যা বলে বাইরন তা স্বীকার করে না।

চুপ কর ডেঁপো মেয়ে। সকলে মিলে চুপ করিয়ে দেয় শীলাকে।

কিন্তু দীপা ভাবতে ভাবতে যায় শীলা এ কথা বলল কেন? দু'কবির চরিত্র একেবারে ভিন্নমুখী—এই পর্যন্তই সে জানে। তার সঙ্গে এ কথার সঙ্গতি কোথায়? কারো ব্যক্তি চরিত্রের কথা তো দীপা তোলেনি, তবে শীলা বুঝলই বা কি আর বললই বা কী?

স্থান সংকুলান হচ্ছে না। চাপে পড়ে এখানে আসা। তখন অমিয় এবং বিনয় কেমন মানুষ তা যাচাই করার কথা কারুর মনে আসে নি। এত হিসেবী দীপারও ভুল হয়েছে। এখন দেখেশুনে একটা একটা সন্দেহ জন্মাচ্ছে। অন্য মেয়েদের কাছে কিছু উল্লেখ না করলেও ভাবনা এবং ভয় হয়েছে যথেষ্ট, তাই পার্টিশন, তাই কমন যা কিছু পৃথক করা। পেট্রলের গুদাম থেকে আগুন দূরে রাখা।

এ দুটোর সংযোগে যে কী সর্বনাশ ঘটে, তা দীপা ভাল করেই জানে। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। তার ভয় সে—সর্বধ্বংসী কথা ভাবছে। অথচ এ দুটি বস্তু যখনই নিকটে আসবে তখন কি সে আকর্ষণ পরস্পরের জন্য। একা একা স্বীকার করতে দোষ নেই, তাই বুঝি ওদের দু'বন্ধুকে ভাল লেগেছিল আজ প্রথম সন্দর্শনে। কী মধুর অ্যাপায়ন, কী চতুর বাচন ভঙ্গী! আভিজাত্যের আমেজও আছে চারদিকে।

অথচ এদের রুচি যে কত নিচের দিকে, তা একটু দেখলেই বোঝা যায়। দুটি আইবুড়ো যুবক—একটি চাকরই কি যথেষ্ট নয়?

দীপার এ-বিষয়ে নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। সে তো ওদের বড়দি কি মামিমা নয়। রান্না ঘরের এদিকে চলে দীপা।

যে কদিন দীপা ও বাড়িতে ছিল রান্নায় একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে, এ বাংলো বাড়িতে এসে হয়েছে একেবারে গৃহিণী। সুনীল হিমশিম খেয়ে

যাচ্ছিল, তাই সহানুভূতিতে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল সে, নইলে তার নাক গলাবার অন্য কোন হেতু ছিল না। ঝি চাকর দেখে অন্য মেয়েরা সরে পড়েছে। দীপা সরবে কী করে? সে ওদের মতো বাবু কি আলসে নয়। এ ছাড়া তার একটা দায়িত্ব রয়েছে। না, না ঠিক তা নয়—বলতে হয় এখান পা দেওয়া মাত্র যেন নতুন একটা বোধ জন্মেছে। এক মেয়ে মাস্টারীপনার পর এ যেন গ্রীষ্মের বৈশাখে স্নিগ্ধ স্বাদ বরফ মেশানো পানীয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বরফের প্রতিক্রিয়া তো ভাল নয়। উত্তাপ কমাতে গিয়ে সেই দাহন যদি বাড়ে? বাড়ুক, দীপা অত ভাবতে পারেনা। তার কাজ আছে যথেষ্ট।

সুশীল।

কি বলছেন দীপাদি?

চা পর্ব হয়ে গেল, এক্ষুনি আর রান্না চড়াচ্ছিনে। তুমি প্রথম গৌরীকে ডেকে বিদায় করে দাও।

কেন দীপাদি, কেন?

মিছামিছি খরচ বাড়িয়ে লাভ কি?

তাতো ঠিক, তাতো ঠিক।

তুমি এগিয়ে যুগিয়ে দেবে, তার বদলে আমি বাবুদের রান্না-বান্না করে দেব —বাকি আর যা সবাই মিলে করে কুলিয়ে নেবে। এরা কেউ লাটসাহেবের ঘরের মেয়ে নয়। বরং তোমাকে দুটো টাকা বেশি মাইনে দেব।

সে তো খুবই ভাল কথা। আমার দিক থেকে কিছু বলার নেই। কিন্তু··

কিন্তু কি?

বাবু কি রাজী হবেন?

সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাক—স্বয়ং তোমার বাবুই আমার ভার দিয়েছেন।

বিনয়বাবু কি কিছু বলেছেন?

তিনি আবার বলবেন কেন?

বাবুর সব সময় মাথার ঠিক থাকেনা—এই আর কিছু নয় মন মেজাজ। বড্ড খেয়ালি মানুষ উনি।

না খেয়ালের মাথায় উনি বলেননি কিছু। তুমি না পার গৌরীকে ডাক, আমিই বলে দিচ্ছি।

কিন্তু আপনার কথায় কি গৌরী উঠে যাবে?

কেন যাবেনা—ডাকো তাকে। নিমেষে দীপার নিজেকে মনে হয় এ

গৃহের সর্বময় কর্ত্রী তার অপ্রতিহত ক্ষমতায় যেন আঘাত লেগেছে। গৌরী সরকারি পারমানেণ্ট চাকুরে নয়—একটা ঝি।

মাথা চুলকাতে চুলকাতে সুশীল বলে, ছিঃ ছিঃ দীপাদি, এখানে আপনি নতুন এসেছেন—কেউ শুনলে কী বলবে?

উষ্মার উত্তাপে ব্যারোমিটারের পারাটা অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছিল, সুশীলের কথার শৈত্যে তা সট্ করে শূন্য ডিগ্রিতে নেমে আসে।

সত্যিই তো দীপা কে? কেন বলছে এসব কথা? বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। যারা রেখেছে তারাই তুলুক—ও শুধু শুধু নিমিত্তের ভাগী হতে যাচ্ছে কেন? মাসে ওর ভাতে হয়ত দুআনাও দণ্ড পড়বে না। দীপার পার্টিশন নিয়ে দরকার। সেই ব্যবস্থা হলেই যথেষ্ট। ওপাশে যদি কেউ ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচায়—নাচাক। দীপা গায় পড়ে দেখতে যাবে না।

কারুর শোনার ভয় আমি করি নে। তোমরা যদি রাখতে চাও রাখো—আমাদের এ পাশে না এলেই হল।

তা যা ভাল বোঝেন করবেন, আমি চাকর মানুষ কী বলব?

সুশীলের কথা ভাল করে না শুনেই দীপা চলে যায়। সে কথাবার্তায় সুশীলের কাছে ঠিক হারে নি, কিন্তু বিষম গ্লানিতে যেন ভরে উঠেছে বুক। সে ভাল করে চুল বাঁধে, মুখ মাজে, স্নো পাউডার মাখে যথারীতি, এমন লক্ষ্য সে যে কতদিন দেয়নি নিজের ওপর!

একটু লম্বা হলেও সে সত্যি সুন্দরী। তার মত মুখের ডৌল কজনার আছে? রঙটা গৌর না হলেও সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। এই শ্যামলতার একটা আলাদা শোভা আছে। সে কোন সোনার অলঙ্কারে তাকে অদ্ভুত মানায়। তার সাক্ষী কানের টব দুটি। আরশিটি ভাল করে মুছে বার বার দেখে দীপা। কিন্তু একটা বড় ক্ষতি হয়েছে—তা একান্তই অপূরণীয়। সে তো আর ষোড়শী, কি অষ্টাদশী নেই। যা ফেলে এসেছে, সেখানে যে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

দীপা আবার আঘাত পায়।

সে ফিরে এসে সুশীলকে ডেকে, তার সাহায্যে যা করে, সন্ধ্যার পর সকলে দেখে একটু বিস্মিত হয়।

চট এনে কেটে সমস্ত কমন স্নান পর্দা দিয়ে আলাদা করা হয়েছে।

অমিয় জিজ্ঞাসা করে এসব কি সুশীল?

দীপা বলে, ভেবে দেখলাম এ খরচাটা আপনাদের ঘাড়ে চাপানো নিতান্তই অযৌক্তিক। তাই কোনো রকমে কাজটা করে নিলাম।

বিনয় হেসে বলে, ভাল করেছেন।

অমিয় বলে, ছুটি ফুরিয়ে গেলেও হয়ত আমাদের দিয়েও কাজ হয়ে উঠত না, ভালই হয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে দীপা শুনতে পায় আধুনিক কবিতা নিয়ে ঘোর তর্ক চলছে। সুমুখের পাটাতন ফেটে যাবে বোধহয়। শীলার গলাটাই উঠেছে বেশি উঁচুতে। শুনুন আপনারা, এই কবিতাটি কি উল্লেখযোগ্য নয়, এটা কেবল অর্থের এবং ভাবের যুগ নয়। ইঙ্গিতের যুগ।

কে যেন বলে, যথা—

বলছি চুপ করে শোন। না পত্রিকাটা নিয়ে আসি। কেন, এক লাইনও কোট্ করার মুরদ নেই।

একি অক্ষর, বা ছন্দ মেলাবার কবিতা? এসব হচ্ছে গদ্য কবিতা, নূতন জিনিস।

আমাদের দেশে যেমন মেয়ে পুলিস। অনিমা বলে, চোর ধরবে, না চোখ মারবে এত ট্রেনিং নিয়ে পেনাল কোড পড়েও ঠিক করতে পারলাম না। যে দেশে কালিদাস, রবীন্দ্রনাথের মত কবি জন্মায় সে দেশে কি অভিশাপে এত আগাছার জন্ম হচ্ছে তাই বুঝতে পারছি নে।

বিনয় বলে, শীলাদেবীকে পত্রিকাটা আনতে দিন, নইলে এভাবে একতরফা রায় নেওয়া চলে না।

অনিমা বলে, যাক্ না, নিয়ে আসুক—কে বারণ করেছে ওকে।

অমিয় বলে, সেই ভাল, কবিতা পড়লে কতকটা মেয়ে পুলিসের ভয় কেটে যাবে।

কে যেন মন্তব্য করে, এ নিছক ভেজাল চালাচ্ছে অমিয়বাবু—যাদের কটাক্ষ করছেন তারা কিন্তু বুঝতে পারছে না। তারা মশগুল তর্কে।

শীলা মাসিক পত্রিকা নিয়ে আসে—

চট কলের ধারে তুমি এসো মেয়ে
বিদিশার চুল হায়নার হাসি—
নীল বর্বর আমি, বড় ভালবাসি ডায়না
মেয়েটাকে টেমসের রকেটে।
সকেটে সকেটে···

চুপ কর শীলা। অনিমা বলে, যদি কবিতাটা আগাগোড়া পড়িস তবে উঠে যেতে বাধ্য হব আমি।

অমিয় বলে, বসুন, হতাশ হবেন না। আরো আছে। কবে যেন আমি দুটো কবিতা পড়েছিলাম, বলছি।

বলুন। কানে আঙুল দিয়ে না হয় শুনছি।

একটু স্মরণ করতে দিন। আমি তো আপনাদের মতো ভক্ত নই। একটু সময় লাগবে। কবে যেন কোথায় পড়েছিলাম।

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়।
এবার কঠিন কঠোর আঘাত আনো
পদ লালিত্য ঝংকার মুছে যাক
গন্তের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো?
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়:—
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

(সুকান্ত)

অমিয় একটু বিশ্রাম করে বলে, তারপর দ্বিতীয়টি শুনুন।

তোমার কাছে তো বোনাস চাইনি
শাড়ি একখানা তাও না—
মরা-যৌবন চাইনাকো তাতে ঢাকতে—
আরো চাই না কো দু'ভরি সোনার
কিংকিনী হাতে রাখতে,
ওগো আমার পাওনা-দাওনা আমায়
কথা দিয়ে দাও না।
পেটে ছেলে দিয়ে সোহাগে ভরেছ
মরা-প্রেম দেনা ক'রে
উচ্ছাস দিয়ে ছলনা করেছ কত—
উদাস বাতাস ঝরা পাতা নিয়ে
উঠোনেতে দিন জমিয়ে জমিয়ে
সারা দিন তার শব্দ শোনায় যত।
তোমার কাছে তো বোনাস চাইনি
দু'দিনের টাকা তাও না—
কথা দিয়েছিলে অফিসের থেকে
দিন এনে দেবে রোদ দিয়ে ঢেকে,
তুমি যে বললে অফিসে অনেক পাওনা,
তুমি যে বললে লড়াই করছ

অনেক চড়াই উঠছ নামছ;
তবু কি শিখর পাওনা?
কথা দিয়েছিলে এনে দেবে
ওগো তাড়াতাড়ি এনে দাওনা।
(তারক বন্দ্যোপাধ্যায়)

সকলে অবাক হয়ে যায় অমিয়র তুটি আবৃত্তি শুনে।

অনিমা বলে, এমন কবিতা তো শুনিনি। দেখছি আপনি শুধু কেরানি নন—রসিকজনও বটে। আমি ক্ষমা চাইছি।

বিনয় গম্ভীর হয়ে বলে, এখন দেখছি মেয়ে পুলিসের ভবিষ্যত আছে।

দীপা ভাল করে শুনতে পায় না। তবে বোঝে পর্দার পরিশ্রম মাটি হয়েছে। সেই যেন কেবল একঘরে হয়ে গেছে। শীলা হয়তো তাই বলছিল, শেলি যা বলে, বাইরন তা স্বীকার করে না।

বত্রিশ

বিধাতাই দীপাকে পৃথক করে দিয়েছে। সে এক ইতিহাস। ভাবতে ভয় হয় দীপার কিন্তু আজ আর না ভেবেও উপায় নেই। গত জীবনের শিক্ষাই পরম শিক্ষা। তাই নিয়েই ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলতে হবে।

তাকে একাই কাটাতে হবে জীবন।

এই তো ক'বছর আগে ওরা শীর্ণতোয়া নদীর পার ধরে হেঁটেচলেছে। ওর বাবা তখনো দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারান নি। চাকরির খবর পেয়ে ওপারে চলেছেন। সঙ্গে ওরা তিন বোন। পৌটলাপুঁটলিতে কিছু জিনিসপত্র।

সুনন্দা!

কি বাবা? আজো যেন ডাকটা কানে বাজছে দীপার।

স্যাণ্ডেল খুলে হাতে নাও—তারপর তিনজনে ছাতার নিচে এস। বড্ড রোদ।

না বাবা আমাদের তেমন কষ্ট হচ্ছে না—তোমার অসুবিধা হবে।

গৃহিণী কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তাঁর চিতার ছাইয়ের সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে গৃহস্থের ঘরখানাও। সপ্তাহ কয়েক পূর্বে এই মরানদীর যে কী প্রলয়ঙ্করী মূর্তি হয়েছিল, একটা বাঁধ ছিল মাটির, ফকিরের জোড়াতালি দাওয়া কাপড়ের মতো, তা এক নিঃশ্বাসে ছিঁড়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। যাক, সে সব পুরনো কথা। একটা চাকরি না হলেই চলবে না সুনন্দার বাবার,

জায়গা জমি যেটুকু ছিল তাতে যে কোনো দিন ফসল জন্মাতো তা আর বোঝা যায় না; ধূ-ধূ করছে বালির পাহাড়। ধান ক্ষেত হয়েছে মরুভূমি। মানুষের বসতি অবলুপ্ত।

স্ত্রী মারা যাবার পরও মেয়ে তিনটিকে নিয়ে একরকম দিন কেটে যাচ্ছিল। সুনন্দার বাবার। পল্লীগ্রাম থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে মেয়ে তিনটি স্কুলে কলেজে পড়াশুনা করছিল। সুনন্দা থার্ড ইয়ারে, মেজটি ফার্স্ট ক্লাসে, ছোটটি ক্লাস সেভেনে। সব ভেঙেচুরে গেল।

বন্যার ঝাপটা শুধু মাটির পৃথিবীকে বিগড়ে দেয়নি—মানুষের চেহারা সাজসজ্জাও একেবারে ওলোটপালট করে দিয়েছে। একটা ব্যাঙ্গালোরের ব্লাউজের সঙ্গে সুনন্দা পড়েছে ছেঁড়া শাড়ি। আবার মেজ ও ছোটটির পায়ে স্যাণ্ডেল নেই, অথচ পরনে রয়েছে মূল্যবান ফ্রক তিন বছর আগের, তাই খাটো, ব্রজবাবুর যে এই কিছুদিন আগেও অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, তার কোনো প্রমাণ নেই। দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণই সেজেছেন।

সুনন্দা!

কেন বাবা?

আর বেশি দূর নয়—ঐ তো হরিণবাড়ি ভূঁইয়াদের দালান।

তোমার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে?

না, না—তোমাদের জন্য ভাবছি। ব্রজবাবু ছোট মেয়েকে ছাতার নিচে টেনে নেন। তুই আয় মা আমার কাছে।

বালির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চারটি প্রাণী এগিয়ে চলে। ক্রমে তাদের ছায়া হ্রাস হয়ে আসে। পথের পাশে অনেকগুলো বড় বড় গাছ উপড়ে পড়েছে। দু একটার গোড়ায় এত বালি জমেছে যে সেগুলোর যেন শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়েছে। কয়েকটার পাতা হয়ে গেছে বিবর্ণ।

এখানেও বসতি ছিল, কি বলো বাবা?

হ্যাঁ, তার চিহ্ন আর নেই আজ। সব ধুয়ে মুছে গেছে।

কয়েকটা কঙ্কাল দেখা যায় দূরে। পশুর না মানুষের ঠিক চেনা কঠিন। ব্রজবাবু মেয়েদের নজরে তা আনেন না। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পথ চলেন। তার মনে হয় যেন মহাশ্মশানের ভিতর দিয়ে চলেছেন পাড়ি দিয়ে। নদী ক্ষীণ হয়ে গেছে কিন্তু তার বিশুষ্ক বিস্তার ধু ধু করছে। কোন ঘাসগুল্ম নেই, শুধু বন্ধ্যা বালিরাশি। মাঝে মাঝে ছোট বড় পাথর।

দুটো তাল গাছ রয়েছে যেন জীবন্ত কবরস্থ হয়ে।

ওরা হতবাক হয়ে একটু দাঁড়ায় তারপর এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে।

বাবা সরকার নাকি বন্যারোধের চেষ্টা করছেন।

যতক্ষণ না মহামানবের সরকার হচ্ছে ততক্ষণ সবই বৃথা মা। নিয়তি চিরদিনই দুর্বার, প্রকৃতিকে তবু কতকটা আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে—কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে তা কল্পনা করা যায় না। আমরা বড় অসহায়।

প্রায় চার মাইল পথ হেঁটে এসে এঁরা গ্রামের মধ্যে ঢোকেন।

একজন জিজ্ঞাসা করে, আপনারা কোথায় যাবেন?

ভুঁইয়াবাবুদের বাড়ি।

রিলিফের জন্য বোধ হয়।

না, চাকরির খোঁজে।

এই মেয়ে তিনটিকে সঙ্গে নিয়ে। মনে মনে ভেবে প্রশ্নকারী একটু বিমূঢ় হয়। সে আবার জিজ্ঞাসা করে, কি বললেন?

এখানে মধ্য ইংরাজি স্কুলে নাকি একটি মাস্টারি খালি আছে, তাই এসেছি দরখাস্ত নিয়ে।

ভাল করেছেন। এই সোজা চলে যান। ঐ বৈঠকখানা যে দেখছেন ওখানেই ভুঁইয়াবাবু বসেন। এখনো তিনি আছেন—খেতে যাবেন দুপুরের পর। খুব বড়লোক কিন্তু বড় সৎলোক। প্রচুর আমের বাগান আছে, অনেক ধান জমি আছে—সিগারেট, বই, তেল চিনির ব্যবসা আছে। পটলডাঙার বন্দরে। বাবুর মাত্র এক ছেলে, কলেজে পড়ে, দেখতে যেন যুবরাজ।

সুনন্দা যেন উৎকর্ণ হয়ে শোনে। একটু লজ্জায় যেন সংকুচিত হয়ে পড়ে নিজেদের ভিখারির তুল্য ভেবে।

এখন বেশ গাছপালার ছাওয়া পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নুয়ে পড়েছে বাঁশের ডগাগুলো। এবার পথের দুপাশে সতেজ বেড়া লতার ঝাড়। দু'একটা স্বর্ণলতার কুণ্ডলী কুল গাছের শাখায়। তারপর নানারঙের পাতাবাহার। শৌখিন রক্ত এবং শ্বেতচন্দনের কচুগাছ যেন ফোঁটা কেটেছে। শিউলি কামিনীর বন্ধুত্বও দেখা যায় মাঝে মাঝে।

কাছারির সমুখে বকুল গাছের তলায় যাকে দেখা যায় সেই বুঝি যুবরাজ। চার চোখে দেখা হতেই সুনন্দা মুখ নিচু করে।

দীপাদি আর কি মসল্লা বাটব?

না সুশীল। যা বেটেছ তাই বা কিসে খাটাবো। এবেলা শুধু এই তরকারিই হবে।

তাই নাকি? আগে বললেন না কেন? মসল্লার স্তূপটার দিকে চেয়ে সুশীল মনে মনে তেতে ওঠে। এই শিক্ষিত চেষ্টে আসা মানুষগুলো কেমন?

কখনো বাবু ঝিমান, কখনো বিনয়বাবু, এখন ঝিমোচ্ছেন দীপাদি। এরপর যখন বাংলো সুদ্ধু সব ঝিমোতে আরম্ভ করবে, তখনও বেচারী উপায় কী করবে?

আজ আবার গৌরী এদিকে মাড়াতে সাহস পাচ্ছে না। ওতো কিছু জানে না, তবু গেল কোথায়?

বড্ড গরম দীপাদি, আমি একটু দম নিয়ে আসি।

যাও এসে খাওয়া দাওয়ার জায়গা করো। গৌরী কোথায়?

ডেকে দেবো?

দাও।

সুশীল রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে উঠানের এক প্রান্তে গৌরী বসে মাটিতে আঁক কাটছে, ওর বুকটা ছ্যাঁক করে ওঠে।—গৌরী!

কি?

দীপাদি তোকে ডাকছে।

ভয়ে ভয়ে গৌরী বলে, মারবে নাকি?

এ—যে, মারলেই হল? গায়ে হাত তুলেই দেখুক না—আমি চাকরি ছেড়ে দেব। তখন দেখিস হাজার চেষ্টা করেও তোর আমার মতো লোক জোটাতে পারবে না।

খুব জোরাল প্রতিবাদ নয়—তবু গৌরী যেন ভরসা পায় প্রচুর। সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সুশীলের সহানুভূতিটুকু ওর ভিতর যেন চকিতে ঋতু-পরিবর্তন ঘটায়। শীত গিয়ে যেন বসন্ত আসে। তুই আমাকে খুব ভাল বাসিস সুশীল, নারে?

দীপার কাছে যাবে বলে গৌরী উঠে দাঁড়ায়। সুশীল তাকে সবলে আকর্ষণ করে।

ওকি বেল্লিক! কেউ এসে পড়বে। গৌরী ওর হাত ছাড়িয়ে চলে যায়।

সুশীল ভাবে, ঠিক—বড্ড হালকা কাজ হয়ে যাচ্ছিল। এমন তো কোনো দিন করেনি। ও ছোটলোকের মেয়ে তার ওপর বাবুর আদুরে চাকরানি, নিশ্চয়ই বলে দেবে বাবুকে। চাকরির দফা আজই রফা হবে ওর। সুশীল আবার আক্রোশে টেনে আনে গৌরীকে।

কি বলে দিবি নাকি?

না।

তবে যা। বড্ড ভাল মেয়ে তুই। বলেই ঈষৎ একটা চাপ দিয়ে ছেড়ে দেয় সুশীল।

লাঞ্ছজড়ানো গলায় গৌরী বলে, শালা বেইমান—ঢোঁড়া সাপ।

এবার গোক্ষুরের মতো ছোবল মেরে ছেড়ে দেয় সুশীল।

গৌরী জ্বলতে জ্বলতে চলে যায়। কিন্তু বিষের মধ্যেও পায় যেন চিরন্তন মধুর স্বাদ।

সেদিন দ্বিপ্রহরে বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ঠিক এমনি না হলেও একটা অস্পষ্ট মাদকতার আস্বাদ অনুভব করছিল সুনন্দা।

আপনারা কাকে চান?

ভুঁইয়াবাবুকে।

বাবু তো জেলায় গেছেন কাল।

মুখ শুকিয়ে যায় নবাগত চারটি প্রাণীর। ব্রজবাবু জিজ্ঞেস করেন, এখন উপায়? তিনি কবে আসবেন?

ঠিক কিছুই তো বলে যান নি। আপনারা দাঁড়িয়ে কেন? চলুন ভিতরে বসবেন। আসুন আমার সঙ্গে।

সেদিনের দুর্বলতায় লজ্জায় বড় ভেঙে পড়েছিল সুনন্দা। আজ দীপার তা ভাবতে গিয়ে করুণা বোধহয়। পিতা বৃদ্ধ, কিন্তু সুনন্দাই যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল সে সকলের পিছে পিছে এসে কাছারিতে ওঠে।

মাটির পুরু প্রাচীরের ওপর চুনকাম প্রকাণ্ড ঘর, ছাউনি হলেও দালানের যেন মাথা যায়। প্রকাণ্ড চৌকির ওপর ফরাশ বিছানো—তাকিয়া আছে প্রায় গোটা কুড়ি। সচরাচর ব্যবহারে না লাগলেও ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে সগৌরবে। কয়েকটা আলমারি আছে প্রাচীন কারুশিল্পের নিদর্শন।

চাকর চাকরানিকে ডাক দেওয়ার আগেই হাজির। কি খোকাবাবু?

ওঁদের বাড়ির ভিতর নিয়ে যাও, আর বুড়োমশাইকে দোতলায়। যা যা দরকার সব ব্যবস্থা করে দেবে। খাওয়াদাওয়া বিশ্রামের পর যদি আপত্তি না থাকে কেন এসেছেন আমার কাছে বলতে পারেন।

না বাবা এক্ষুনি শুনলে হয়, নইলে আর এখানে থেকে লাভ কি? মিছামিছি কেন তোমাদের হয়রান করব?

এই দুপুরবেলা না খেয়েদেয়ে যাবেন কোথায়? কী বললেন বলুন। যেন হাতজোড় করে অপেক্ষা করে খোকাবাবু।

এই দরখাস্তখানা পড়ে দেখ তা হলেই সব বুঝবে।

ওরা নিশ্বাস বন্ধ করে খোকাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

খোকাবাবুর কয়েক লাইন দরখাস্ত পড়ে যেন উত্তেজনা বোধ করে। তার মুখে শোণিত-প্রবাহ দেখা যায়।

ওরা আশায় নৈরাশ্যে এক অব্যক্ত অনুভূতিতে কালক্ষেপ করে।

দীপা হঠাৎ যেন সহানুভূতিতে বিগলিত হয়ে বলে, তোমার আর কিছু করা লাগবে না গৌরী, সুশীলই পাত-পিঁড়ি করবে। বরং আমাকে একটু হাওয়া কর। রান্নাবান্নায় অনেকদিন অনভ্যাস।

তেত্রিশ

পার্টিশনের মর্যাদা কেউ রাখুক আর নাই রাখুক, দীপাকে তা মেনে চলতে হবে। সে খাওয়াদাওয়ার সময় পরিমিত কথা বলে। কিন্তু যত্নআপ্যায়ন করে অমিয় ও বিনয়কে নিয়মমতো।

মেয়েরা বেশি কথা বলে না। দীপার কাছে এসে থেমে গেছে কবিতা নিয়ে লড়াই। অমিয় এবং বিনয়ও চুপ করে খেয়ে ওঠে।

কোনো অসুবিধা হয়নি তো আপনাদের?

দীপার প্রশ্নে কলের মতো দুই বন্ধু জবাব দেয়—না।

রাত্রে রুটি, দিনে ভাত—

আমরাও তাই ভালবাসি।

সুশীল একটু অবাক হয়ে বাবুদের দিকে তাকায়।

দীপা আবার বলে, একবেলা আমিষ অন্যবেলা কিন্তু নিরামিষ।

খুবই ভাল ব্যবস্থা।

এতে দেখবেন খরচও কম পড়বে।

চেঞ্জে এসে আপনার মতো এতটা হিসেব করে কজন?

অমিয় চুপ করা মাত্র বিনয় বলে, তাইতো শেষকালে ফিরতি পথে টিকিট কাটার পর্যন্ত সম্বল থাকে না। শুনতাম আমাদের মা দিদিমারা এমনি হিসেবী ছিলেন। তাইতো তাঁরা কিছু জুড়ে গেঁথে রেখে গেছেন। আমরা হয়েছি উড়নচণ্ডী। খুবই লজ্জার বিষয় দীপা দেবী।

ইন্দিরা বিষম খাওয়ার জোগাড়। পেট ফেটে তার হাসি বের হতে চাইছে অতি কষ্টে। বিনয় গাম্ভীর্য বজায় রাখে।

দীপা একটু ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

ওরা দু বন্ধুতে পর্দা ঠেলে বেরিয়ে যায়। দূরে গিয়ে প্রাণ খুলে হাসে। কিন্তু কতক্ষণ আর হাসা যায়? কতক্ষণ আর নিজেদের মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা চলে অনুপস্থিত একজনকে নিয়ে? এক সময় দুজনের মাঝখানে এসে একটি বয়স্কা তরুণী দাঁড়ায়। যার অপার গাম্ভীর্যের নদী পারাপার হওয়া যায়

না। কিন্তু ইচ্ছা করে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ওরা কেউ কারুকে কিছু বলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বারান্দায় রেলিংয়ে হেলান দিয়ে।

বিদায় হওয়ার সময় গৌরী বলে, সুশীল, একটা মশাল জ্বালিয়ে দে।

একটু দাঁড়া— আমি হাত ধুয়ে নি।

তুই ত কতবার হাত ধুয়ে ফের এঁটো হাত করলি।

দাঁড়া এ বাসন কখানা মাত্র মাজা বাকি।

আমার কাছে দে— তুই মশাল জ্বাল। রাত হল অনেক বাবা কি বলবে?

আমি এগিয়ে দেবখন।

না, তোর যেতে হবে না।

কেন গৌরী?

এমনি।

আচ্ছা না গেলাম। রাস্তায় বাঘে ধরলে আমি কিন্তু ছুটে যেতে পারব না।

বাঘ পথে নেই, ঘরে। ফের ধরলে বাবুদের ডাক দেব।

দিস ততক্ষণে পগার পার। ঘরের ভিতর দিয়ে গিয়ে একটা মশাল তৈরি করে নিয়ে আসে সুশীল। হ্যাঁরে, তখন তুই আঁক কাটছিলি কেন মাটিতে?

সুশীল ঘরদুয়ার বন্ধ করে। বাইরের বাংলোটার সুমুখে চলে আসে দুজনে। বারান্দায় কেউ আছে কিনা তা ওরা লক্ষ্য করে না।

হ্যাঁরে কিছু তো বললি নে, আঁক কেন কাটছিলি?

নসিব খুঁড়ে দেখছিলাম।

সুশীল একটু বিচলিত হয়ে দাঁড়ায়, কি বললি?

নসিব খুঁড়ে দেখছিলাম।

একথা বলছিস কেন গৌরী?

আমাকেই চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হবে। বাবার বড্ড খাঁই।

কি চায় সে?

রোজ দশ টাকা।

বাপস্। সুশীল মাথায় হাত দেয়। এতো রাক্ষুসে খাঁই! অবাক করলি তুই।

আর একজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের কথা শোনে।

সুশীল জিজ্ঞাসা করে, তারপর তুই কি করব?

বাড়ি বসে মার খাব।

অমিয় ভাবে, তবু উপায় নেই, কেউ পারবে না এ রাক্ষুসে খাঁই নির্বাণ

করতে। কোনো আইন নেই, কোনো শিকল নেই যাতে এ পাগল বাঁধা যাবে

একবার বাবুর কাছে বলে দেখবি নাকি? হয়তো তিনি একটা বুদ্ধি বাতলে দিতে পারেন।

বাবু কেন স্বয়ং বিধাতাও পারবেন না—বলে ভিতরে চলে যায় দ্রুত পদে।

ওরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সুশীল বোঝে যে গৌরী নিষ্কলঙ্ক। ইতিপূর্বে এর সম্বন্ধে সে কি-ই না ভেবেছে!

গৌরীর জন্য দীপার হৃদয় নরম হওয়ার আর কোনো হেতু ছিল না। —সে দিনের কাছারির ছবি সে আজো ভুলতে পারেনি। এক জনের অনিষ্ট করা যত সহজ, ইষ্ট করা তার চেয়েও অনেক কঠিন। সে যে ভাবে করে খায় খাক না। ওরা এখানে আর কতদিন! অমিয় এবং বিনয়ের সঙ্গে এমন কী ওর সম্পর্ক যে সমস্ত তলিয়ে দেখতে হবে—ঘুলিয়ে?

শুধু মেয়েদের একটু ইশারা করে দেবে। না তাও দেবে না। ওরা এখন আর কেউই এতটুকু নেই। দীপা যেটুকু বলার তা পূর্বেই বলেছে। আর পর্দাগুলি তো নিষেধের জলন্ত দৃষ্টান্ত। ওরা যা-ই করুক দীপা থাকবে ঘর-কন্না নিয়ে ব্যস্ত। "কার ঘর সে করবে?"

কারুর নয়—একদল পিক্‌নিক যাত্রীর। দিন ফুরাবে যে যার ঠিকানায় চলে যাবে, সারাদিনের কলরব পরিচয় শেষ হয়ে যাবে, পরিচয় শেষ হয়ে যাবে সন্ধ্যা না ঘনাতে।

সত্যই দীপার বয়স হয়েছে। মা, মাসির মতো সে অর্জন করেছে অভিজ্ঞতা। আর অতিরিক্ত তিক্ততার স্বাদও সে পেয়েছে—একেবারে কঠিন মর্মান্তিক। তাই সে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকতে চায়। কলরব উচ্ছলতা তাকে দাগা দিয়েছে—সে ক্ষত জীবনে কখনো মোছার নয়। সেই জন্য তার পর্দার প্রয়োজন। সে জগতের হাসি চাঞ্চল্য থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে উন্মুখ। কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, নইলে সে আজ চুল বাঁধল কেন পরিপাটি করে, কেন যত্ন করে মাজল মুখ? একি প্রকৃতির নিয়ম—যেখানে পুরুষ সেখানেই নারীর আকুতি? যেখানে যত নিষেধ, সেখানেতেই প্রবেশের তাগিদ। একবার পাখা পুড়েছে, তবু পতঙ্গ-মন বার বার ছুটে যেতে চাইছে।

খোকাবাবুর কথাই স্মরণ হয় দীপার। আর সে দেখতে পায় সুনন্দা ও ও তার বোন দুটি বাবার সঙ্গে সমান উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

খোকাবাবু বলেন, এই সমান্য ব্যাপার বাবা এলে নিশ্চই বলব—আপনি যখন ওঁদের নিয়ে এসেছেন, তখন একটা কিছু হয়ে যাবে খাওয়া-দাওয়া করুন। আপনার দরখাস্ত টপ প্রাওরিটি পাবে।

ওরা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে।

তোরা মা এখন ভিতরে যা।

সুনন্দা নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করে, এগুলো কোথায় রেখে যাবো ?

কেন এখানে। তার বাবা বলেন, রাখনা এই তক্তপোষের ওপর।

একটু ইতস্তত করে সুনন্দা এখানেও যেমন বেমানান, তেমনি বেখাপ্পা দেখাবে ভেতরে নিলে। অন্দর মহলের একটা মার্জিত রূপ ফুটে ওঠে ওর চোখের সুমুখে।

কিন্তু খোকাবাবু যে চেয়ে রয়েছেন।

একটু অপেক্ষা করে খোকাবাবু বলেন, ওগুলো না হয় এখানেই রেখে যান ভজুয়া যা হয় করবে। ভিতরে গেলে কোনো অসুবিধা হবেনা। মা রয়েছেন।

মেজটি বলে, আমার ফ্রকটা আমি নিয়ে যাব দিদি। আবার কারটা পরতে হয় !

তা বেশ, বেশ—যা ভাল হয় করুন। ভিতরে গেলে কিন্তু কাপড়-চোপড়ের অভাব হত না।

তবু পোঁটলা খুলে ফ্রকটা হাতে নেয় মেজটি।

সুনন্দার যেন মাথা কাটা যায়।

এতক্ষণ বাদে প্রথম কথা বলে ছোটটি। মেজদি যেন আইবুড়ো গিন্নি। বিদেশে বিভুঁইয়ে কি অত বাছ-বিচার চলে।

চুপ ছুটকি।

আচ্ছা আচ্ছা চুপ করলাম।

ঝির সঙ্গে খোকাবাবুই মেয়েদের নিয়ে ভিতর বাড়িতে প্রবেশ করে।

কাছারি থেকে অল্প একটু দূরে, পাথর ঢালা সরু পথ। সামান্য হেঁটেই অন্দর মহল। সিঁড়ি পথে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে। তাঁর পরণে আধময়লা কিন্তু বেশ দামী কাপড়। উজ্জ্বল কালোপাড়ে বয়সটা অনেকখানি ঢাকা পড়েছে।

এরা কারা ?

এক কথায় জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

মহিলা একটু স্মিত মুখে বলেন, রিলিফের জন্য নিশ্চয়ই—তা—

না, মা—এঁদের বাবা আমাদের স্কুলের মাস্টারি করবেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক, অনেক দিনের অভিজ্ঞ।

ছোটটি বলে, শুধু তাই নয় বাবার হাতের লেখা মুক্তাক্ষর।

মেজো বোনের একটা চিমটি খায় ছোটটি।

মহিলার তেমন মুক্তার ওপর আকর্ষণ দেখা যায়না। কিন্তু তিনি বারবার

তাকিয়ে দেখে মেয়েদের দিকে। তুমি খোকা স্নান করে খেয়ে নাও—আমি এদের সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি নিধিরাজকে ডেকে। হেডমাস্টারের বাসাটাই তো খালি পড়ে রয়েছে। ওরা গিয়ে জায়গা মতই উঠুক। কোনো কষ্ট হবে না, সব পাঠিয়ে দেব আমি। তুমি চাকরি দিতে মনস্থ করেছ, উনি কি আপত্তি করবেন।

আশাতিরিক্ত ব্যবস্থা—বলার কিছু নেই, তবু যেন পূর্ণ প্রশান্তি পায়না কেউ। কিন্তু নির্দেশ মতো যেতে হয় নিধিরাজ এলে।

ছোট খাটো একখানা দরমার ঘেরা বাড়ি।

শরতের একেবারে প্রথম। দোপাটি ফুলের গাছে ফুল ফুটেছে নানা রঙের। কয়েকটা গাঁদার চারা জন্মেছে জংলা ঝাড়ের মত। শীতের হাওয়া লাগলেই ফুলে ফুলে আলো করবে গাছপালা। শুকনো উঠোন, একেবারে জল-কাদার চিহ্ন নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা তিন বোনে একত্র হয়ে উঠান পরিষ্কার করে। পূর্বাহ্নেই ঘরখানা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে ঝি-চাকর এসে। কাপড়-চোপড় কিছু বিছানা-পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন মহিলা। এখন সব ফিটফাট পরিপাটি। বাইরে একটা বকুল গাছের শাখা প্রশাখা এ বাড়ির ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত।

ওরা তিনজন একটা মাদুর এনে এখানে বসে। তিন জনের হাতে তিনখানা বই। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং ঠাকুরমার ঝুলি।

কিছুক্ষণ বাদে ছোট বোন বলে, দেখেছিস বড়দিদি বুড়িটা কি পাজি—আমাদের একটু দাঁড়াতে দিল না ভাবলাম ভিতর মহলটা একটু দেখব; কতসব জিনিসপত্তর।

সুনন্দা বলে, ছি! ও কথা বলতে নেই। ওঁরা কত ভাল মানুষ।

আচ্ছা বাবা নাই বললাম। আমাকে একখানা দশ হাত শাড়ি দিয়েছে; এরপর বুড়ির গায়ের একটা ব্লাউজ কেন না দিলেন!

মেজটি বলে, খুব ফাজিল হয়েছিস যা হক।

বইতে মুখ ডুবিয়ে ছোট বোন হাসে। কিছু বাদেই একটা পেঁপে গাছের দিকে নজর পড়ে। ও একটা কঞ্চি নিয়ে ছুটে যায়, এবং একটা কাকের মুখ কেড়ে পেড়ে নিয়ে আসে একটা পাকা পেঁপে। তারপর কাটারি এনে কাটতে বসে। খাবি দিদি, কবিতা থেকে মিষ্টি।

দুই ভগ্নিতেই হাত পাতে, কিন্তু দুজনারই মন বইতে।

সমস্ত মনসংযোগ গোলমাল হয়ে যায় বাবার ডাকে। ব্রজবাবু উঠে বসেছেন বিছানায়; ওরে তোরা এদিকে আয়রে। দেখে যা কে এসেছে।

ভুঁইয়াবাবুদের দেশে তখন বিকাল, কিন্তু বাংলোতে দূর থেকে ঢং ঢং আওয়াজ এল দুটো। দীপা ভাবে, আজ আর নয় এখন আর নয় এখন ঘুমোতেই হবে। নইলে সকাল সকাল ওঠা যাবে না।

চৌত্রিশ

যথা নিয়মে পর্দা ঝুলছে। কিন্তু সকাল না হতেই অনিমা শীলাকে নিয়ে এ বাংলোর বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। বিনয় ও অমিয় ঘুম থেকে ওঠে নি।

শীলা বলে যত আইবুড়ো পুরুষগুলোই আলসে। কাল বলে কয়ে রাখলাম এখনো ঘুমাচ্ছেন!

অনিমা বলে, বাজে কথা রেখে এখন ডাক দেখি। এরপর দীপা দেবীটি উঠে পড়লে সব মাটি হবে, হয়ত পর্দার ওপাশে টেনে নিয়ে একখানা ডিক্‌সনারি মুখে দিয়ে বলবে, মুখস্থ করো তো।

কিন্তু চুলগুলোও তো একটু সমান করতে দিলি নে।

সাজবি পরে আগে ডাক।

আমি তা পারব না। তুই যা।

এই জন্য তোর সঙ্গে আমার যখন তখন ঝগড়া হয়। আওড়াবি আধুনিক কবিতা, কিন্তু একটু স্মার্টনেস নেই। উপস্থিতবুদ্ধি নেই একেবারে। অনিমা বেণী দুলিয়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু সেও কেন যেন ডাকতে পারে না। পর—আপন, কোনো পুরুষের ঘুম ভাঙাবার অভ্যাস নেই। ঘর-সংসারে যখন ছিল, তখন হয়ত ছিল—আজ একেবারে ভুলে গেছে. যেমন করেই একজন শুয়ে থাকুক না কেন, যে শ্রদ্ধা, প্রেম কি স্নেহে নিরপেক্ষ থেকে ডাকা যায়—তা এদের ভিতর থেকে জলের অভাবে টবে গাছের মতো মরে গেছে। অমিয় লজ্জায় শীলার কাছে ফিরে আসে।

এই বুঝি তোর প্রাচীন কবিতার জোর? হাসালি।

সবাইর শোয়া তো এক রকম নয়।

শীলাও থতমত খায় এবার।

ওদের কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে অমিয় ও বিনয় উঠে পড়ে। তাড়াতাড়ি গেঞ্জি গায় দিয়ে বেরিয়ে আসে:

ডাকছেন?

দুজনে মুখ হাত ধুয়ে চটুল হাসি হেসে বলে, ডাকছি বইকি! কী কথা ছিল আজ?

বিনয় বলে, চটপট তৈরি হয়ে নিন। এখন বেশি হলে পাঁচটা বেজেছে।

শীলা বলে, কিছু সঙ্গে নেওয়া লাগবে না?

অত ভেবেচিন্তে বেড়াতে যাওয়া হয় না।

কোথায় যাবেন?

তা আপনারাই ঠিক করবেন। নইলে যে দিকে দুচোখ যায়।

অনিমা বলে, বেশিক্ষণ কিন্তু তা পারবেন না।

কেন বলুন তো?

দম ফুরিয়ে যাবে। নইলে অন্তত খানায় কুপোকাত।

দম ফুরিয়ে গেলে দিয়ে দেবেন। খানায় পড়ে গেলে তুলে ধরবেন। রক্ষা করুন তা আমরা পারব না।

অমিয় বলে, বিনয় এ ঠাট্টা নয় এইটা আজকার দিনে সত্যি কথা। উলটে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমিও অমনি অস্বীকার করতে। কোনো দায়িত্ব আজ নিতে চাইছো না। দম ফুরিয়ে গেছে সমস্ত দুনিয়াদারীর।

অমিয়র মন্তব্যে হালকা হাওয়াটা নিমেষে কেটে যায়। সকলে সকলের দিকে এক অসহায় সকরুণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে।

একটু বাদেই দীপা এসে হাজির হয়। ঘুম জড়ানো চোখ মুখ। রুখু রুখু অবিন্যস্ত চুল। আঁচলটা সম্পূর্ণ সামনে দেওয়া হয়নি বুকের ওপর টেনে, শিক্ষয়িত্রীর এ এক রূপ।

বিনয় ও অমিয়র হৃৎপিণ্ডের ঘড়ি দুটো পুরো দমে চলতে থাকে: মেয়েদেরও যেন কেটে যাওয়া হেয়ারস্প্রিং দুলতে থাকে কী আঘাতে।

গৌরী?

সে এখনো আসে দীপাদি। শীলা বলে, হয়তো একটু পরে আসবে।

অমিয় বলে, হয়তো আর মোটেও না আসতে পারে।

দীপা জিজ্ঞাসা করে, তুলে দিয়েছেন বোধ হয়?

না। তার পোষায় না হয়ত, তাই সে আসবে না।

কত দিতেন?

রোজ এক টাকা।

শীলা বলে, রোজ এক টাকা! আশ্চর্য করলেন! তাতেও পোষায় না।

কত সে চায়? দীপা জিজ্ঞাসা করে, কী পর্যন্ত তার খাঁই?

রোজ দশ টাকা।

এ আপনাদের মিথ্যা কথা। এস তোমরা। দীপা বলে, নিতান্ত বোকায় এ কথা বিশ্বাস করবে না। একটু হাসে দীপা। তার পর যে গাম্ভীর্য নিয়ে

সে এসেছিল, তাই নিয়েই বেরিয়ে যায়। সঙ্গে যায় শীলা ও অনিমা।

ভিতরে এসে দীপা বলে, এত সকালে কোথায় গিয়েছিলে?

শীলা জবাব দিতে গিয়ে বলে, এইরে আমার মানিব্যাগটা ফেলে এসেছি, বারান্দায় যাই নিয়ে আসি। তুই বল না ভাই অনিমা দীপাদিকে সব বুঝিয়ে।

শীলা দ্রুত পদে ছুটে আসে। অমিয় এবং বিনয় মুখ ধুতে যাওয়ার জন্য সব গোছাচ্ছে।

—গামছা টুথ ব্রাশ, পেস্ট। তারা উৎসুক চোখে তাকায়।

আমি দীপাদিকে কিছু বলিনি অনিমাকে ভিড়িয়ে দিয়ে এসেছি, আপনারা চট্‌পট্ রেডি হয়ে নিন। সঙ্গে ক্যামেরাটা নেবেন। বলেই শীলা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ফিরে যায়।

দীপা অনিমাকে বলে, বেড়াবার নামে দেখি পাগল হয়েছ—যাও, হুঁশিয়ার হয়ে পাহাড় জঙ্গলে ঘুরো। সঙ্গে কে কে যাচ্ছে? তা আগে তো আমাকে একটু বলতে হয়।

আপনি ঘুমোচ্ছিলেন।

ওদের ঘুম ভাঙাতে পারলে আমাকেই যত ভয়।

আপনি যাবেন? এবার দুজনেই অনুরোধ করে, চলুন না, তা হলে খুবই ভাল হয়।

না। তোমাদের খাবার তৈরি করে গুছিয়ে দিতে পারতাম। কোন সময় কী করবে তার তো ঠিক নেই। অনেক রাত হওয়াও আশ্চর্য নয়।

আমরা কী ছেলেমানুষ?

তা নও বলেই এত ভয় এবং তাই এত হুঁশিয়ারি।

দীপা যখন একা, বাংলোতে কোনো কাজকর্মই নেই, খাওয়া দাওয়ার হৈ-চৈ বন্ধ, সে সুশীলকেও যেতে বলে, একজন শক্তপোক্ত লোক সঙ্গে থাকা ভাল, স্থানীয় পথঘাট ও যেমন চিনবে, তেমনটি আর কেউ পারবে না।

আবার সরগরম হয়ে ওঠে বাংলোটা। আবার চুলের ফিতে, খোঁপা, শাড়ি-ব্লাউজ নিয়ে হৈ-হুল্লোড়। কোনটা কে পরবে, কোনটা কে চয়েস্ করে না—এমনি নানা কথার তরঙ্গ। কখনো বা একটা দুটো গানের ললিত কলি। সেণ্ট, আলতা, ক্রিম-পাউডারের গন্ধ। হাসির ঝংকার শোনা যায় বার বার।

শীলা বলে, দেখতো অনিমা এ শাড়িখানায় আমাকে মানিয়েছে কি না? ব্লাউজটা বোধ করি গাঢ় রঙের হলে ভাল হত। ডিপ কালারের একটা ছিল, কিন্তু কাট্ ভারী বিশ্রি, হাতা খাটো।

বাবা আমি খাটো লম্বা বুঝিনে। ও টেস্ট ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলায় কালার

কন্ট্রাস্টটা এলেই হল। ওটা স্থায়ী, আর তোরটা অস্থায়ী—সিনেমা স্টারদের প্রেমের মতো।

ইন্দিরা আঁচলটা গোছাতে গোছাতে বলে, খুব হিট দিল যা হক, একেবারে বাউণ্ডারি।

হিট নয়—সত্যি কথা, আমরা হচ্ছি গৃহস্থের মেয়ে, আমাদের মাথার ঘাম পায় ফেলে পয়সা রোজগার করতে হয়—আমাদের চালচলনে একটু বনেদিয়ানা না থাকলে কি চলে? ঘণ্টায় ঘণ্টায় সিনে-সিনে আমাদের ড্রেস পালটানো পোষায় না। এই লারেলাপ্পা এই মানে-না-মানা করেই প্রাণ গেল।

কিন্তু খুকি বুড়ি যুবতী সবাই মিলে তাই তো করছে।

বাড়ি ঘরও তাই হোটেল-মেস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জান বেরিয়ে যাচ্ছে রোজগারে পুরুষের। কে যেন মন্তব্য করে, ওলো আমার বিশ্বদরদিনী।

লীলা বলে, একি আমাদের দোষ! চল এখন।

অনিমা বলে, ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ নয়। আবার সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি নয়। ও দুটোর সঙ্গে নখে-মাংসে সম্পর্ক। তাই আমার মনে হয়, তোর আমার চরিত্রের ওপর সমাজটা যথেষ্ট নির্ভর করছে।

এখন তর্ক রেখে চল দেখি চড়াই উতরাই ভাঙতে ভাঙতে হাতাহাতি হবে'খন।

চঞ্চল চোখে কাকে যেন খোঁজে সুশীল।

ওরা সামান্য চা রুটি খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। স্থির হয় নিকটের একটা পাহাড়ে যাবে সবাই। বেশি উঁচু নয় কিন্তু বেশ জঙ্গল আছে শাল মহুয়ার। আর আছে এক দিকের বিখ্যাত ঝর্না—তৃষা। ময়ূর-ময়ূরী নাকি নাচে তৃষার কিনারে। আসে হরিণী শিশু হরিণ সঙ্গে নিয়ে।

পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত ওরা রিকশা করে যাবে। নিচেই কোন এক স্থানে রান্নার ব্যবস্থা হবে। নইলে ঝর্নার ধারে। সেটা স্থির হবে ভোটে। প্রেয়াব কানাই সর্দারের নেতৃত্বে কয়েকখানা রিকশা পাওয়া গেছে।

দীপা জানালা খুলে দেখে সর্পিল গতিতে রিকশা এগিয়ে চলেছে। দূর থেকে সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে ওদের কাপড়-চোপড়। মাঝে মাঝে সবাইকে চেনা যাচ্ছে, কিন্তু কেন জানি ধরা দিচ্ছে না অমিয়। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে দীপা এসে শুয়ে পড়ে বিছানায়। একার জন্য রান্না করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। একটু ঘুমিয়ে নেবে নাকি। সে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ে।

খোকাবাবু এসে ব্রজবাবুর পাশটিতে বসে পড়েছে। ধোপ-দুরস্ত পাঞ্জাবি পায়জামা—পায়ের নিচে হরিণের চামড়ার চটি। মুখে লজ্জারুণ দীপ্তি।

আপনাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে নাতো? কোনো অসুবিধা?

ব্রজবাবু বলেন, না, না কিছু হচ্ছে না বাবা।

খোকাবাবু সুনন্দার দিকে তাকায়। আপনাদের?

ছোটটির মনে মনে হিংসা হয়।

সুনন্দা বলে, আপনাদের যে চমৎকার ব্যবস্থা।

ব্রজবাবু সরল হাস্যে বলেন, তোদের কথা তোর মুখ দিয়েই শুনতে চায়।

না, না আমি তা বলিনি। মায়ের আমার বড় কড়া শাসন, সামনে একটা পরীক্ষা, সবদা আসতে পারি না কিনা তাই খোঁজ নিতে এলাম। বাবা এসেছেন, আপনার কথা শুনেই রাজি—আমার আর বিশেষ কিছু বলতে হয়নি।

ব্রজবাবু আনন্দে অধীর হয়ে বলেন, কি আর খোঁজ নেবে—সব চমৎকার।

ছোট বোনটি আর থাকতে পারে না, সে বলে, কিন্তু আমার শাড়িটা বড্ড খাটো হয়েছে। বলেই সে দিদির মুখের অবস্থা দেখে ছুটে পালায়।

খোকাবাবু একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। না হয়তো বুঝতে পারেন নি—হয়তো ওর মাপের ফ্রক ছিল না তাই—

ওর কথা ছেড়ে দাও, ও অমনি মেয়ে—অর্থ না বুঝেই কথা বলবে ঠাস্ ঠাস্ পটাংপটাং। তাই তো কত মার খায়।

এই তো চাই। না, না—ও বড্ড সরল। ওর অসুবিধা হয়েছে, গোপন করতে পারেনি।

সেই দিনই দর্জি আসে। এবং যার যা প্রয়োজন তৈরি হয়। সকলেই মনে মনে একটু কুণ্ঠা বোধ করে। এতটা বাড়াবাড়ি যেন উচিত হচ্ছে না। আজকের দিনে গায়ে পড়ে এতটা উপকার করাও যেমন বিসদৃশ নেওয়াও তেমনি। শুধু ব্রজবাবু কিছু মনে করেন না। তিনি বলেন, এখনো পৃথিবীতে মানুষ আছে। তাই তোমাদের আর কিন্তু কিছু করা উচিত নয়। গ্রহণ করতে উদার মনের দরকার।

কিছুদিন খোকাবাবু আর আসেন না।

কি হল দিদি? ছোটকি প্রশ্ন করে, একি ভাল দেখাচ্ছে?

সুনন্দা বলে, আমি জানব কী করে? কেবল আমার কাছে প্যান প্যান। ও বিরক্ত হয়ে উঠে যায়। কিন্তু একটু কিছু আওয়াজ হলেই দরজার ফাঁকে চেয়ে দেখে। হয়তো সময় সময় বাইরের দিকে এগিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে চোখ বুলিয়ে নেয়।

ঘণ্টা খানেক বাদে হয়ত ছোটকি জিজ্ঞাসা করে একখানা চিঠি লিখে দেব? কেন অনেকক্ষণ বুঝি মার খাওনি আমার হাতে?

একটু নাগালের বাইরে গিয়ে ছোটকি বলে, তবে তুমি মার খাবে বাবার হাতে সব বলে দেব বাবার কাছে। তুমি পড়ার বই মুড়ে কেবল ছাইভস্ম কবিতা পড়ো—

ছাইভস্ম কবিতা কিরে? এটা তো চয়নিকা। তুই তার কদর বুঝবি কি? শুয়োরে চেনে কচু আর ঘেঁচু।

আর একটু সরে গিয়ে ছোটকি অঙ্গভঙ্গি করে জবাব দেয়—

ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সুমুখ পথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহ কাজ লয়ে রহিব বলো কী মতে।

এ বুঝি একটা ভাল কবিতা হল? এর জন্যই তো ভাল পোড়া লাগে, ঝোল-নুন-কাটা হয়, এ পথ দিয়ে রাজার দুলাল এলে ঠেঙিয়ে দেব। আমার চুলের ফিতে আজও দিয়ে গেল না।

সুনন্দা কৃত্রিম ক্রোধ চেপে রাখতে পারে না। সে হেসে বলে, আসবে রে, তোর জন্য চুলের ফিতে চিরুনি সব নিয়ে আসবে।

ছাই আসবে! সুনন্দার হলে এসে যেত।

দেখ এত বাড় ভাল নয়। তুই একনম্বর নেমকহারাম। সেদিন কার জন্য দর্জি এলো?

তোমার জন্য—মেজদির জন্য। আমার ফ্রক দুটোর ছিট দেখেছ—ছাই।

সুনন্দার সর্ব দেহ জ্বালা করে ওঠে, কিন্তু এই মা মরা আদরের বোনটাকে তখন কিছু বলতে পারে না।

এমন সময় খোকাবাবুর গলা শোনা যায়। এই যে, ফিতে কাঁটা চিরুনি।

আমার লাগবে না। দিদিকে দিন। বলে জলভরা চোখে চলে যায় ছোটকি।

জিনিসগুলো হাতে দেবে বলে, খোকাবাবু অনেকক্ষণ বসে থাকে। তাই চা জলখাবার নিয়ে আপ্যায়ন করতে হয় সুনন্দাকে। আর মাঝে মাঝে কথার চানাচুর। কখনো নরম কখনো গরম—কিন্তু খুবই মুখরোচক।

অনেকক্ষণ কেটে যায়।

দীপা উঠে বসে বিছানায়। একা হলেও তার একটা পেট আছে। কিছু তাকে আহুতি দিতেই হবে সে উঠে যায় রান্নাঘরের দিকে।

সত্যি গৌরী আজ এলনা—এখন আর আশা নেই। না—আসে না—আসুক—দীপা কী করবে? সে তো নিজে কিছু বলে নি। যাক তাকে নিজের হাতেই গুছিয়ে সব করতে হবে, মন্দ হবে না, দিনটা কাজেকর্মে কেটে যাবে। এ বেলা নিজেরটা ও বেলা সবাইরটা।

এদিক ওদিক সে জলের বালতি ও চালের গামলা নিয়ে বার হয়। ইদারা

থেকে জলে চাল ধুয়ে আনবে। ঘরে ভাল জল নেই। আর থাকলেও কেন যেন ইদারার পারে যেতে ইচ্ছা করে।

বড় বাংলোটার সুমুখে দীপা আসা মাত্র, অমিয় বেরিয়ে পড়ে। কোথায় যাচ্ছেন? আমি এনে দিচ্ছি জল।

রক্তাক্ত মুখে দীপা বলে, আপনি বুঝি যান নি? তবু ভাল দেখা দিলেন—নইলে তো চালই নেওয়া হত না। যাই আর এক কৌটো নিয়ে আসি। এখানে আছেন তবু জানান নি।

কি করে জানাই—সব জায়গায়ই যে নিষেধ ঝোলানো। শরীরটা ভাল নয় তাই আর গেলাম না।

শরীর নয় বলুন মন।

হ্যাঁ, হয়তো তাই হবে। সব সময় ও দুটোকে পৃথক করে ভাবা যায় না। সত্যই গৌরীটার জন্য দুঃখ হচ্ছে। আর আপনাদেরও বিশেষ করে আপনার কম কষ্ট হবে না, এতগুলো মানুষের খাটুনি তো কম নয়।

খাটুনিকে আমি ভয় করিনে—ভয় হচ্ছে আপনার জন্য। পাছে না অসুস্থ হয়ে পড়েন।

শারীরিক হয়ত হব না। কিন্তু মনকে বাগ মানানো কঠিন। ওর একটা করুণ কাহিনী আছে।

কি? জিজ্ঞাসা করেই দীপা অমিয়র মুখের দিকে চেয়ে থাকে। নগ্ন সত্য একজন কত নগ্ন করে বলতে পারে তাই সে শুনবে বলে প্রস্তুত হয়।

মা দুটি ভিক্ষা। একজন অন্ধ—সঙ্গে একটি বালকে নিয়ে উদয় হয়।

সখিরে গৌর কেন আমার হলো না'
গৌর যদি আমার হত, এ জনমের মতো
  হিয়ার বাহির হতে দিতাম না॥
তারে মুখোমুখি রাখিতাম, দিবানিশি দেখিতাম
  আঁখিতে পলক দিতাম না।
এই যে গৌর গুণমনি
  কোন রমণীর মাথার মনি গো
সে ধনি তার যতন জানে না।
যদি মরে থাকে সে ধনি
তবুও সে পাষাণী
আমার হলে থুয়ে মরতাম না।
গৌর কেন আমার হল না।

এই একটি গানে সমস্ত আবহাওয়াটা পালটে যায়। মধু ও বিষাদে ভরে ওঠে তাপদগ্ধ গিরিভূমি।

দীপা প্রায় এক সের চাল এনে দেয় ; অমিয় দেয় এক টাকা। এই নাও—ভাল করে বেঁধে নিও। এই যে ধরো।

দীপা জিজ্ঞাসা করে, এ দেশে কেমন করে এলে ?

অন্ধ জবাব দেয়, যেমন করে আপনারা এসেছেন। তবে কেউ জাহাজে, কেউ ফুটো নায় এই যা তফাত। জয় হোক আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর।

দীপা আপত্তি করতে গিয়ে দেখে অন্ধ ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

অমিয় বলে, এই, এই শুনছ ? একটু দাঁড়াও—উনি—

দীপা বলে, তুমি যা ভেবেছ তা কিন্তু সত্যি নয়, ওঁর সঙ্গে আমার—

আর বলতে হবে না মা। অমি অন্ধ হলেও আমার বুকে রয়েছেন যিনি সব দেখতে পান।

উত্তেজিত হয়ে দীপা বলে, না না—

পঁয়ত্রিশ

অন্ধ হেসে চলে যায়। দীপা কথা শেষ করতে পারে না।

অমিয় যে সময় মতো এমন বেঁকে দাঁড়াবে তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি বিনয়। তখন ঝগড়াতর্ক করাটা শোভন নয় বলে সে চলে এসেছে। মেয়েদের এ অভিযানে সেই বেশি উৎসাহ দেখিয়ে ছিল, তাই তার অস্বীকার করা, কিংবা শারীরিক অসুস্থতা সবিনয়ে জানানো একান্ত অসম্ভব ছিল। সে যদি অমিয়র মতো মুন্সিয়ানা করে যুক্তহস্তে মাথা নাড়াত, মেয়েরা মনে মনে বলত—এরা দুটোতেই অমায়িক পাজি। আর পরোক্ষ দীপাদেবী এদের কাছে হয়ে যেত অনেকখানি খাটো। দীপাদেবী এলনা বলেই তো ওরাও এল না। কারুর সম্মান এত সহজে নষ্ট করা উচিত নয়। কারণ তা অর্জন করা অতি কঠিন। বিনয় তা বেশ ভাল করেই জানে। জীবনটা তার ইয়ার্কির এবং ঠাট্টার মনুমেণ্ট। কিন্তু তার একটা চারিত্রিক ভিত্তি আছে। সেই জন্যই বন্ধু মহলে সে যতটা সম্মান পায়, অমিয় তা পায় না।

অমিয়র অনেক সঙ্গতি আছে, আছে এদিক ওদিক ছড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ এবং ক্ষমতা—তবু সে বিনয়ের তুলনায় অনেক খেলো। তাই দীপাকে হালকা করা চলেনা।

রিকশায় শীলার সহযাত্রী বিনয়। একান্ত সান্নিধ্যে বসে রয়েছে দুটি নর ও

নারী, বয়স এদের চুপ করে বসে থাকার কোঠায় নয়—অন্তত মনোবিজ্ঞানী তা বুঝবেনা। কিন্তু এরা চুপচাপ। বার বার উঁচু-নিচু পথের সংগ্রামে এরা এর গায়ও এসে পড়ছে, তবু হর্ষ স্ফূরণ হচ্ছে না দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রতি রোমকূপে। যাও বা হচ্ছে তাও যেন কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছে। শীলা যদিও বা কিছু টের পাচ্ছে, বিনয় যেন কিছুই পাচ্ছেনা, সে যেন পজেটিভের কাছে পজেটিভ—চুম্বকের কাছে চুম্বকই। সে যেন হারিয়ে ফেলেছে বিপরীত ধর্ম। কারণ মনটাই যে তার এখানে নেই। সুমুখে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে আজকের গন্তব্য শ্যাম অরণ্য, বৃক্ষের বেপথু হিল্লোল, গিরি ঝর্ণার নর্তন, কিন্তু পিছনে পড়ে রয়েছে মন। দীপাকে ছেড়ে বাংলোর সীমা উত্তরণ করে সে আসতে পারেনি। তার দেহের সমস্ত বিপরীত ধর্ম রয়ে গেছে ভূতের মতো ওখানে।

একটি নূতন ধরনের পাখি দেখে সমস্ত রিকশার মেয়েরা হৈ চৈ করে ওঠে।

কানাই সর্দার বলে এরপর আরো কত কি দেখবেন—কিছুটা যেতে দিন। হনুমানজিরা শাড়ির আঁচল টেনে ধরবে—আউর—মুখভঙ্গি করে প্যাডেল করে সর্দার।

শীলা মন্তব্য করে, শুনছেন, বলে কি কানাই সর্দার।

শুনেছি। বলতে দিন ওকে—তবু সময় কাটবে।

আউর কাল চিত্তির, মোটা মোটা বোরা আছে।

সাপ নাকি ?

হ্যাঁ।

ওমা বলে কি।

এমনি বলাটাই সত্য নয় কি ? চাঁদে যেমন কলঙ্ক আছে, পাহাড়েও তেমনি জন্তু-জানোয়ারের ভয় আছে। একটা সইতে পারলে আর একটাও হবে। নইলে বেড়ানো হবে না।

শীলা একেবারে চুপ করে থাকে। তার মনে হয় একটা কিছু এখনই লাফিয়ে উঠবে রিকশায়।

বিনয় ভাবে অমিয় নিশ্চই চুপ করে শুয়ে নেই বিছানায়। দীপাও নেই পর্দার অন্তরালে বসে। ওরা হয়ত এতক্ষণ গল্প জুড়ে দিয়েছে দু পেয়ালা গরম চা হাতে নিয়ে। গম্ভীর মেয়ে দীপা হয়ত ভেঙে পড়েছে হেসে। একেবারে নির্জন দুটি শুধু কপোত-কপোতী। চঞ্চুপুটে চঞ্চু মেলালেই হল। কে বাধা দেবে, পাজি দেখে গৌরীটাও আজ সরে পড়েছে। এখন সকাল তারপর দুপুর তারপর বিকাল অবশেষে সন্ধ্যা। যেন অন্তহীন অবকাশ, এর মধ্যে শুধু দুটি প্রাণী। ভাবা যায় না, ভাবা চলে না আর মাথার ভিতর টনটন

করে। দীপার যে সম্মানে রইল ভেবে আত্মতৃপ্তিতে মশগুল ছিল বিনয় তা বুঝি আর রাখতে পারল না দীপা। মানুষ যে পথ ভাবে,ভবিতব্য সে পথে চলে না।

কানাই যত মরিয়া হয়ে প্যাডেল করে, বিনয়ের মনটা তত পিছিয়ে যেতে চায়। বার বার সে শিউলিকে দেখতে পায় দীপার ভিতর। নইলে দীপার ওপর তার কোন আধিপত্য এবং কী আকর্ষণ।

রিকশাগুলো পাহাড়ের পাদদেশে থামে।

সবাই নামে কলরব করে।

শুধু বিনয় নীরব।

ওরা এখন বাংলোতে কী করছে?

এত সময় বাদে পাহাড়ের দিকে চেয়ে হাসির ঝংকার তোলে শীলা। বাপস্! কি ভয় দেখিয়েছিলেন উনি!

বিনয় ভাবে, এতক্ষণ কী চুপ করে শিউলি বসেছিল তার পাশটিতে? সেই ঝড়ের রাত্রে ভয়ার্ত মেয়েটি? সে তাকায় সবিস্ময়ে। তার শিউলি ফুল কি ছড়িয়ে গেছে বিশ্বময়।

বিনয়ও কলরবে যোগ দিয়ে পাহাড়ে সর্পিল পথ বেয়ে উঠে যায় ওপরের দিকে।—সুশীল, রান্না কোথায় হবে?

মেয়েরা বলে, যেখানে জল।

পুরুষসঙ্গীরা অনুমোদন করে এক বাক্যে।

ওরা কিছু দূর বেশ সজোরে হেঁটে চলে। সময় সময় ছুটে। কেউ কেউ বলে যে দীপাদি না এসে ভালই হয়েছে। হয়ত এখানেও মেনে চলতে হত তার নির্মম রুটিন।

শীলা বলে, ওকি, পিছনে পড়ে রইলেন কেন বিনয়বাবু? হাত ধরব?

অনিমা বলে, ধর—আমরা কিছু বলবনা।

আর একজন বলে, আমরা উৎসহাই দেব—তবু একটা টেম্পোরারি মিসস্ট্রেস স্থায়ী হল বলে জানব।

বিনয় কোন জবাব দেয়না। একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসে। এ হাসির অর্থ একমাত্র অন্তরদেবতায় বোঝে।

আর কিছুটা পথ এগিয়ে ওরা জিজ্ঞাসা করে, ঝর্ণা কতদূর?

কেন জলতেষ্টা পেয়েছি বুঝি?

না, আপনি ঠাট্টা করছেন!

ঠাট্টা করতে যাব কেন—আপনাদের জন্য সত্যিই সহানুভূতি হচ্ছে তখন ছুটতে নিষেধ করা হয়েছিল, দুঃখের বিষয় বারণ শোনেন নি। ঠিক

হয়ে দাঁড়ান—ঐ দেখুন একটা ভাল্লুক যাচ্ছে। ঐ যে বড় শাল গাছ একটা তার নিচেই কাল পাথর—ঐ যে ঝর্ণার গা দিয়ে—

ক্যামেরায় শট নেওয়ার শব্দ হয়।

ওকি, ওকি?

একখানি ছবি। বিনয় প্রোডাকশনের প্রথম অর্ঘ—কটি তৃষ্ণার্ত মেয়ে।

মেয়েরা ক্ষুব্ধ হয় এ আপনার ভীষণ অন্যায়।

বিনয় বলে এপিকের যুগের কথা ভেবে দেখুন, কোন হিরো না অন্যায় এবং জবরদস্তি করেছে হিরোয়িনদের ওপর? এ যুগে তেমন দাঙ্গাবাজ হিরো নেই, সবাই র‍্যাশনাইজড্—তাই এসেছে ক্যামেরায়—তাই যেটুকু রোম্যাণ্টিক অন্যায় করা হচ্ছে ক্ষমা করে নিন। কি বলেন মিস রয়? চণ্ডীদাস বলে—

রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম

কাম গন্ধ নাহি তাহে?

এতো ধোপার মেয়ে নয়, বিশুদ্ধ ইংরাজ কোম্পানির নিষ্প্রাণ ক্যামেরা। হিরোর হাতের বর্ষণ নয়—ঐষিকবাণ নয় এমন কি তার কটাক্ষও নয়। মৃত ক্যামেরায় একটি মাত্র অচমৃতশট। আপনারা ক্ষুণ্ণ হচ্ছেন কেন?

সকলে নতুন উদ্যম বোধ করে। আর একটু এগিয়েই ঝর্ণা পাওয়া যায়। সেখানে রান্নার ব্যবস্থা হয় খিচুড়ি। ওরা জল খেয়ে যে যার গা এলিয়ে বিশ্রাম করে।

বিনয়ের কাছে শীলা এগিয়ে যায়।

সত্যিই কি ফটো তুলেছেন?

বিশ্বাস না করলে এখন তেমন কোনো প্রমাণ দেখানো যাবে না। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। প্রিণ্ট না তুললে আপনি বুঝবেন না।

কি জানি কী ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম! বড্ড লজ্জা করছে কিন্তু।

সকলকে সাজা দেবার জন্যই তো এইটে তোলা। জল জল করে চোখ ছানাবড়া। অমিয়কে দেখাব, দেখবেন আপনাদের দীপাদি, আপনার পোজটাই সাংঘাতিক প্যাথেটিক হয়েছে।

রক্ষা করুন বিনয়বাবু—ও ফোটোটা নষ্ট করে ফেলুন।

শীলার এই দুর্বলতার অবকাশে ভাল করে মুখখানা দেখে নেয় বিনয়। আরক্ত মধুর—কিন্তু ও যেন বড় ছেলেমানুষ। ওকে কথার হুল ফোটাতে বড় যেন ব্যথা লাগে। দুর্ধর্ষ দীপার বেলা তা হয় না। তাকে জব্দ করে, কিংবা তার কাছ থেকে জব্দ হয়ে যেন আরাম আছে প্রচুর। বিনয় যদি হয় তুলা-দণ্ডের ডান পাল্লা, সে হচ্ছে বাঁয়েরটা। ফের নেই এতটুকু। হয়ত কথার

ঘায় সে দুলতে পারে, কিন্তু বিপরীত পাল্লাকে দোলাতেও সে পিছনে হিসেব করলে এখন এখন পর্যন্ত দীপাই বেশি নাড়া দিয়েছে—তাই জন্ম এত আকর্ষণ ?

আজ অমিয়টা কি ধোঁকাই না দিলে।

অনেকক্ষণ ধরে জলতে থাকে বিনয়।

মেয়েরা বলে ঝর্ণার জল খেয়ে মাটি করেছি। পাকস্থলি পুড়ে যাচ্ছে। আর না খেয়ে এক পাও চলা যাবে না। আসুন বিনয়বাবু কয়েক বাজি তাস খেলি। নইলে সময় কাটবে না।

আমার ইচ্ছে করছে না।

অনিমা বলে ছাড়ছে কে? আজ আপনার স্বাধীনতা নেই। বেশি দাপাদাপি করলে আজ কুরুক্ষেত্র হবে—মেয়ে বূ্যহে অভিমন্যু বধ। অনুগ্রহ করে নতুন এপিক করবেন না। কে লিখবে বলুন ?

কেন বাংলা সাহিত্য তো অনেকজন ব্যাস বাল্মিকী জন্মেছেন শীলা বলে, নামকরা দৈনিক মাসিক-গুলোর সাহিত্য সমালোচনা পড়িস নে? অতএব প্রচারের যুগে মাভৈ শুধু তাঁরা ঘটনা চান—তোমরা নিশ্চিত মনে ঘটাও।

সকলে টানাটানি করে বিনয়কে তোলে। মল্লবীর বীরাঙ্গনাদের পাল্লায় পড়ে কতক্ষণ আর মাটি আঁকড়ে থাকবে? কিন্তু চিড়েতনের গোলামটার দিকে নজর পড়লেই ও কেবল দেখে অমিয়র কাঁচুমাচু মুখ। দুল দুল চাহনি। হরতনের বিবি শুধু সহানুভূতি কুড়িয়ে নিতে উন্মুখ। একি লোলুপতা একি সত্যি? ঘৃণা জন্মে বিনয়ের।

ওকি তুরুপ করলেন না, ছেড়ে দিলেন এমন পিটটা ?

সত্যি ভুল হয়েছে অনিমাদেবী। আর হবে না।

কিন্তু আবার হয়—আবার।

দূর! আপনাকে নিয়ে তাস খেলা যাবে না।

বিনয় বলে, যা বলেছেন—সত্যি।

শীলা একান্তে সরে গিয়ে বলে, দীপাদি এলে কিন্তু খেলিয়ে নিত।

কী করে বুঝলেন ?

কিছু না বলে শীলা উঠে যায়। একা একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসে পিঠ ফিরিয়ে।

কিছু সময় বিনয় অপেক্ষা করে। কী যেন ভাবে। তারপর সে উঠে গিয়ে শীলার কাছে দাঁড়ায়। দেখুন দূরের ঐ পাহাড়গুলো কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে রোদে। এ শান্ত নীলাভার তুলনা হয় না।

শীলা কোনো জবাব দেয় না। সে হয়ত দেখতে পাচ্ছে না কিছু।

বিনয় ওর পাশটিতে বসে। দীপাদি খেলিয়ে নিত, কী করে বুঝলেন!

জহুরী যেমন করে সাচ্চা ঝুটা পাথর চেনে। শীলার গলা কেন যেন মেদুর হয়ে ওঠে।

সবিস্ময়ে বিনয় ভাবে, সব মেয়েদের মনই কি এক একটা জহুরীর বাসা-বাড়ি? তারা কী সত্যি সত্যি আসল-নকল চেনে? বিনয় কিন্তু নতুন একটা অভিশপ্ত পাথর। সাচ্চা হয়েও মেকি আসল হয়েও কার্যত নকল। একে বাছা কঠিন। এর আকর্ষণ-বিকর্ষণ সবই হয়তো ফাঁকি। ভগবান, এর জন্যও দুর্বলতা বোধ করে কোনো নারী!

একটা শট নেওয়ার শব্দ হয়?

বারে—একি! একি করলেন অনিমা দেবী!

একখানা মেয়ে পিক্‌চারের অতর্কিত নিবেদন—শীলা রায়ের মানভঞ্জন।

খিচুড়ি সম্বারের গন্ধ আসে সুমধুর।

ছত্রিশ

কিন্তু তখনো রান্না নামেনি দীপার, অথচ খাইয়ে মাত্র দুজনে।

অন্ধ চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ দীপা আবোলতাবোল ভেবেছে। যে চক্ষুষ্মান নয় সে একটা কিছু বলেছে, তার জন্য দীপার উচিত হয়নি অতটা উত্তেজনা প্রকাশ করা, তার গাম্ভীর্য যে স্বাভাবিক নয়, তা হয়ত আজ অমিয় অনায়াসে ধরে ফেলেছে। মিছামিছিই দীপা পর্দার আড়ম্বর বাড়িয়েছে।

মিনিট খানেক বাংলোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে দীপা ইঁদারার দিকে চলে যায়। ইঁদারার পাড়ে বালতি গামছা নামিয়ে শাড়িখানা গাছকোমর করে পরে। বাংলোর দিকে সে চোখ তুলে তাকায় না। অমিয়র উপস্থিতি সে স্বীকার করে না। সে বালতি নামিয়ে দেয় সশব্দে। জল তোলে টেনে টেনে। কোথা থেকে যেন দুটো পায়রা এসেছে উড়ে। তাদের বকবকুম ডাকে দুটো চাল ছড়িয়ে দেয়। কেমন সুন্দর দেখতে—কী চমৎকার রঙ! ও দুটো বোধ হয় এক জোড়ের পায়রা। তাই তো কেমন ভাবে! দুটিতে মিলেমিশে খাচ্ছে। আবার খানিক চাল ছড়িয়ে দেয়। আর দীপা লক্ষ্য করে তাদের সখ্য। খাওয়া শেষ হলে ওরা উড়ে চলে যায়। পুরুষটির পাশাপাশি ডানা মেলে ভেসে যায় স্ত্রী-বিহঙ্গনী। ওরা বাংলোর আলিসায় বসে। স্বামী আদর করে—নারী চঞ্চুপুটে তা গ্রহণ করে। সভ্য কোনো আইনের নিষেধ নেই, আর্থিক কোনো বাধা বিপত্তি নেই—ওরা মেনে চলে শাশ্বত নিয়ম।

মানুষের বেলা যত প্রতিবন্ধক !

বুদ্ধির শিকল দিয়ে সে ভেবেছিল নিবোধ পশুটাকে বাঁধবে, কিন্তু উলটে সেই পড়েছে বাঁধা। এই তো বর্তমান পৃথিবী জোড়া প্রহসন।

দীপা কাজকর্ম সেরে পায়রা দুটির দিকে চেয়ে চেয়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে আসে। ওরা যেন এখন সোহাগে আদরে বেপথুমান। দীপা লজ্জায় চোখ নামিয়ে বাংলোর ভিতর ঢোকে। তার সব শরীর পুলকে লজ্জায় আচ্ছন্ন। আবার মুখোমুখি দেখা হয়ে না যায় অমিয়র সঙ্গে।

ওরা স্বামী-স্ত্রী হওয়া অসম্ভব ছিল না।

আজ অমিয় না থেকে বিনয় থাকলেও অন্ধ হয়ত একই মন্তব্য করত। ওদের মধ্যে কেউই অপাত্র নয়। শুধু অপাত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে দীপা। পুরুষ জাতটার ওপর সে আর কিছুতেই আস্থা স্থাপন করতে পারছে না।

তবু না পাওয়ার দাহ কেন কমে না ?

সে আবার আসে ইঁদারার পারে। গ্রামের মেয়ের মত স্নান করে উন্মুক্ত স্থানে। এখানে সে হেড মিস্ট্রেস নয়, কোনো সামাজিক কি কর্মজীবনের বন্ধন নেই তার এখানে—তবে আর তার ভয় কি ? এবার যদি দেহের উত্তাপ কমে। বড় বেলা বেড়েছে।

দীপা অমিয়র সুমুখ দিয়ে ভিজে কাপড়ে চলে যায়। হয়তো ইচ্ছা করেই সে ইঁদারার পাড়ে শাড়িখানা নেয়নি অথবা ভুলও হতে পারে। কিন্তু গামছা দিয়ে নিজেকে সামলায় যতদূর সামলান চলে। কিন্তু ধীরে ধীরে পা ফেলে।

সমস্ত ছবিটা চলমান। ক্রমে ক্রমে পর্দার অন্তরালে চলে যায়। তবু বুঝি অমিয়র বুকে চিরকালের মত শিলীভূত হয়ে এ সিক্ত-বসনা নারী হাঁটবে। সে একটা নিশ্বাস ছাড়ে।

দীপা গিয়ে শাড়ি বদলায়, মাথা আঁচড়ায় - গোছগাছ হয়ে রাঁধতে আসে।

রান্নাঘর খোলা। কে খুলল কপাট ?

চিৎকার করে ওঠে দীপা।

অমিয় ছুটে আসে।

তাকে দেখেই দীপা সবলে জড়িয়ে ধরে। ঐ দেখুন রান্না ঘরে -

একি ! দেখতে দিন, কী হল ?

লজ্জায় দীপা অমিয়কে ছেড়ে দেয়।

কানাই সর্দারের কথিত দুটি জীব পথ ভুলে এখানে এসে উঠেছে। মহা আনন্দে লেজ নেড়ে তারা ধোয়া চাল চিবুচ্ছে এবং ছড়াচ্ছে এদিক ওদিক। দীপাকে দেখে খিঁচিয়ে উঠছে দাঁত।

অমিয় ছুটোছুটি করে। দেখি, একটা লাঠি কোথায়?

দীপা তার সান্নিধ্য একেবারে ছাড়তে ভরসা পায়না সে থাকে সঙ্গে সঙ্গে।

শোরগোলে সেই বুড়ো, যার ছেলে মারা গিয়েছিল ইঁদারায় পড়ে, সে এসে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে সরকার।

সাজ্ঘাতিক ব্যাপার একেবারে লঙ্কা কাণ্ড—রান্নাঘরে হনুমান।

অধীর হবেন না হুজুর—আমি ভোগ নিয়ে আসছি মহারাজের জন্য।

বুড়ো দৌড়ে বাইরে যায় এবং কোথা থেকে যেন গোটা কয়েক পাকা কলা নিয়ে আসে লাঠি-সোঁটার দরকার হয় না। মহাবীরদ্বয় পাকা কলার লোভে বেরিয়ে আসে। বুড়োর হাত থেকে যেন স্মিত মুখেই তা গ্রহণ করে। তারপর বাংলোর মাথায়, অবশেষে গাছের মগডালে গিয়ে ওঠে।

অমিয় বলে, বাঁচা গেল।

দীপা বলে, হয়ত আবার আসতে পারে। বুড়োকে একটু থাকতে বলুন। নইলে আমার রান্নাবান্নায় মন বসবে না।

বুড়ো বলে, যে সে এক্ষুনি এক বালতি জল কোথায় যেন দিয়ে আসবে। ততক্ষণে অমিয় বসুক। কিন্তু এর দরকার নেই মোটেই মহাবীরজিরা আর আসবে না। কারণ তারা যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বুড়ো চলে যায়।

অমিয় দীপার মুখের দিকে চেয়ে কী যেন শুনবে বলে অপেক্ষা করে।

দীপা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে অনেকটা বুদ্ধি দিয়ে। সে কোনো অনুরোধ জানায় না। অমিয় পর্দার দিকে এগিয়ে যায়। কী যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। তারপর পর্দাটা গুটিয়ে তোলে। এখন বাইরের থেকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা চলবে।

না, না—ওর দরকার হবে না অমিয়বাবু। মিছামিছি আপনি কেন কষ্ট করছেন। তার চেয়ে যান একটু বিশ্রাম করুন, আমার রান্না হল বলে। রাসকেল দুটো এলো নইলে অনেকখানি কাজ আমার এগিয়ে যেত।

অমিয় বলে, আচ্ছা তাহলে থাক। মনে মনে বলে, এরপর কিন্তু জাম্বুবান এলেও সে সাড়া দেবে না।

সে স্যাণ্ডেল জোড়া খুঁজে পায়ে দেয়। হাত-পায়ের ধুলো মোছে গামছা টেনে। একটা সিগারেট ধরায়, এই সামান্য ব্যাপারেই বেশ পরিশ্রান্ত হয়েছে। উত্তেজনাটা তো প্রায় নাটকের সীমান্তে পৌছেছিল। কী যে ভাল লেগেছিল তখন। একটা যেন অদ্ভুত ভাঁড়ামি। কিন্তু তার ভিতর যেন বিস্ময়কর জীবন স্পন্দন অনুভব করেছিল সে।

অনেকক্ষণ বাদে অমিয় নিজের মনে মনেই আবার বলে, তবু এ প্রহসন !

সিগারেটটা নিভে যায়। সে হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পায়চারি করতে থাকে। সুমুখে ফুটে ওঠে দীপার লিপ্তশ্রী। ইচ্ছা করে অচপল বয়স্কার চটুলতা প্রদর্শন।

কিন্তু বিনয় এবং অমিয় তো কম হাল্কা নয়। কেন তারা এত হাল্কা—এত চপল ? তাদের জীবনে ভার কেন্দ্র নেই। থাকলেও সেখানে কোনো ভারী বস্তুর স্থির আকর্ষণ নেই,নেই গ্রহ জগতের মত তাদের মনোজগতে পারস্পরিক নিবিড় বন্ধন। তাই কেবল উড়ে যেতে চায়। কক্ষচ্যুত হয়ে ধ্বংস হতে। এ চটুলতা রোধ করা সুকঠিন। অনেকগুলো গভীর কথা ভেবে অমিয় আবার শ্রান্ত হয়ে পড়ে। আবার প্রয়োজন হয় সিগারেটের। সে বাংলোর ভিতর প্রবেশ করে।

দীপা ভাবে সেও কম দুর্বলতা প্রকাশ করেনি। দুর্বলতা নয়, একেবারে ছ্যাবলামি। তার গা কেমন করে ওঠে যেন। বিরক্তির চেয়েও লজ্জা হয় ভয়ানক। সে রান্নায় জোর করেই মন বসায়।

অবশেষে তন্ময় হয়ে রাঁধে। বাজার হয়নি, তবু বাসি তরকারি দিয়ে কতরকম কাটাকুটি করে নেয়। এ যেন দেব সেবার আয়োজন।

কিন্তু অমিয় না এসে, রান্নাঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়ায় খোকাবাবু। সন্ধ্যা হতে না হতেই রান্না চাপিয়েছেন যে ? খুব বুঝি খিদে পেয়েছে ?

কাঠের উনোন। মাঝে মাঝে ঝলকা আগুন। লজ্জা না আঁচের আভা ঠিক বোঝা তখন কঠিন। তবু চেয়ে দেখে খোকাবাবু। পরিণত কিশোরের সুমুখে এক যুবতীর দীপ্তি। ভয়ে ভক্তিতে খোকাবাবু মুহ্যমান।

বসুন। তাড়াতাড়ি একখানা সামান্য জলচৌকি এনে দেয় মেজ ভগ্নি। খোকাবাবু যেন টের পায় না। বসুন ভদ্রলোক।

সুনন্দা বলে, এখানে দোর গোড়ায় বসবে কি ? ভিতরে নিয়ে যা। না এখানেই বসি একটু—বেশি দেরি করলে মা খোঁজে লোক পাঠাবেন পড়াশুনার তাগিদ আছে।

পরীক্ষা কবে ?

সতেরই।

কি পরীক্ষা ? হাফইয়ার্লি।

একটা উইক্লি—এমনি নিচ্ছেন ইংরেজি প্রফেসর। বড্ড কড়া মানুষ।

আপনি বুঝি ইংরেজিতে খাটো ? সুনন্দা জিজ্ঞাসা করে, তাই বুঝি উইক্লির জন্যও এত ভয় ? কোন ইয়ার।

সপ্রতিভ খোকাবাবু জবাব দেয়, না, না—ইংরেজিতে আমি মোটেও খাটো

নই। পরীক্ষা না দিলে মা টের পাবেন তাই…।

কে জানাবে আপনার মাকে? তেমন ভাল না লাগলে দেবেন না। সপ্তাহে কচি ছেলের মত পরীক্ষা দিতে হবে এর কোনো মানে নেই।

মা যদি খোঁজ নেন?

ওটা আপনার ভয়। নিছক দুর্বলতা।

তা ঠিক নয়, তা ঠিক নয় সুনন্দাদেবী।

সুনন্দার ইচ্ছে নয় যে খোকাবাবুকে পরীক্ষা দিতে বারণ করে। ক'দিন ধরে যার সম্বন্ধে অহেতুক দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ করছে, তার বিরুদ্ধে এ বিপ্লব। অত বড় ছেলে, কেন করবে প্যান প্যান? চলুন, ঘরে গিয়ে বলবেন। আমার অনুমান মিথ্যা হলে তো খুবই ভাল। পুরুষ মানুষের জীবনে তো কত বড়-ঝাপটা আসে, তখন তো মা থাকবেন না।

কোনো ঝড় বাতাস খোকাবাবুর জীবনটাকে কখনো এক গন্তব্য থেকে অন্য গন্তব্যে ধাক্কা মেরে নিয়ে যায় নি। সে ঠিক অনুমান করতে পারে না একথার অর্থ, তবু সে বুদ্ধি খাটিয়ে একটা কিছু কল্পনা করে নেয়। ছোট্ট একটু জবাবে বলে, তা ঠিক। তারপর বলে, মাস্টারমশাই তো ঘরে নেই, এখানেই একটু বসি। আবার তাড়াতাড়ি খোকাবাবু নিজেকে সামলে নেয় চট করে। বাবা মাস্টারমশাইকে একেবারেই পারমানেণ্ট করে নিয়েছেন। মাইনে একশ পাঁচ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বাবা আমাকে খুব ভালবাসেন।

সুনন্দার হাসি পায়। নিজেকে সংযত করে অতি কষ্টে।

কিছু আমার বলতে হয়নি।

পাছে সুনন্দা নিজেকে সামলাতে না পারে তাই জিজ্ঞাসা করে, আপনার কোন ইয়ার।

থার্ড ইয়ার?

আমিও থার্ড ইয়ারের ছাত্রী ছিলাম।

তাই নাকি! সত্যি? বড় আনন্দের কথা তো! তা হলে আমাদের কলেজে ভর্তি হন না। আমরা দুজনে একসঙ্গে যাবো। এখান থেকে দুটো স্টেশন। মান্থলি করে নেবেন আমার মত। ফার্স্ট ক্লাসে মাত্র দশ টাকা বার আনা।

এখন ভর্তি হলে পারসেণ্টেজ থাকবে না।

আপনি কোথায় পড়তেন? হিসেব করে দেখেছেন? হয়তো থাকবে।

আমিও আপনাদের কলেজেই পড়তাম। মর্নিং সেকশনে। বলেই সুনন্দা

মনে মনে হিসেব করতে থাকে। বলে, হয়ত থাকতে পারে। এই তো সেদিন নাম কাটা গেছে। বাবা এলে বলব।

শুধু বললেই হবে না—কালই যেতে হবে।

জানেন তো গরীবের সবদিক চিন্তা করে কাজ করতে হয়। এখন আমাকে পড়াবেন, না ছোট দুটোকে পড়াবেন, তা বাবা এলে ঠিক হবে। আমার তবু কিছু হয়েছে—ওদের তো কিছুই হয়নি। যদি কুলোয় বাবা কিছুতেই না করবেন না।

কুলিয়ে যাবে। সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। মা আমায় কত হাত খরচ দেন! সব টাকা কি আমি নিজের জন্য খরচ করি।

কথাগুলি অতি সরল। কিন্তু এত সারল্যও যেন ভাল লাগে না সুনন্দার কাছে। সে বলে, একটু বসুন আমি ভাত নামিয়ে নি।

একটা লম্ফ জ্বলছে। ধোঁয়া উঠছে যেন বগবগ করে। কয়েকটা মেটে হাঁড়ি এবং সামান্য বাসনপত্র। কোথায় কী করে গালবে ফ্যান? উনোনের ধোঁয়াও কম হয়নি। সুনন্দা হিমশিম খেয়ে যায় ভাত নামাতে। সুমুখে আবার খোকাবাবু। মনে মনে কী ভাবছে কে জানে! অভ্যস্ত কাজেও সুনন্দার গোলমাল হয়ে যেতে থাকে। সে চোখের জলে নাকের জলে একশা হয়ে কোনো প্রকারে কাজ সেরে বেরিয়ে আসে।

বড্ড কষ্ট তো আপনার? এরপর মাস্টারমশাইকে একটা চাকর রাখতে বলব। নইলে এ করে পড়া হয় না।

সুনন্দা বলে, এ করে যে পড়তে না পারে, আমাদের বাপ মা তাকে পড়ায় না।

বলেন কি? এভাবে কি স্বাস্থ্য টেঁকে, না পড়াশুনা হয়? আমাদের রান্নাঘর একটিবার দেখে আসবেন, কেমন খাসা বন্দোবস্ত। সেখানেও তো মা আমাকে কক্ষনো তাঁকে খুঁজতে যেতে দিতে চান না। আপনার তো ঠাণ্ডা গরমে সর্দিগর্মি লেগেছে।

ও একটু বাদে সেরে যাবে। আমরা মোমের পুতুল নই। সুনন্দা নাক-মুখ আঁচলে মুছে হাসে।

সত্যিই তো দিব্যি চেহারা—কোথায় গেল সর্দিগর্মির আক্রমণ?

খোকাবাবুকে বিস্ময়ে অভিভূত করে সুনন্দা। আর সুনন্দাকে অভিভূত করে দুটি শ্রদ্ধাভরা চাহনি। সুনন্দা ভাবে সংসারে অনভিজ্ঞ যুবক ছাড়া কে চাইত ওর দিকে এমন সম্ভ্রমে? আজ পর্যন্ত কেউ তো তাকায় নি। সে অনেক নাকের জলে চোখের জলে একশা হয়ে তবে এত বড় হয়েছে। আর

ওর দিকে তাকাবার মত এমন কি নৈপুণ্যের সঙ্গতি আছে? না একটা ভাল গান জানে—না আছে একটা কবিতা লেখার ক্ষমতা? জানে শুধু হাঁড়ি ঠেলতে। কিছু লেখাপড়া শিখেছে। তার বার আনা উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা ভাল বিয়ে, তারপর কয়েকটি বিয়ান, ব্যস শেষ।

খোকাবাবু বলে, যদি একান্তই পারসেন্টেজটা না থাকে, নন-কলজিয়েট হবেন ভাবনা কি? কিন্তু কাল যেতে হবে। আজ উঠি।

বাবা আসুন—যাব।

আচ্ছা নমস্কার।

সাঁইত্রিশ

খোকাবাবু সুনন্দার কাছ থেকে বিদায় হতেই দীপার দুয়ারে এসে দাঁড়ায় অমিয়। ভিতরে আসতে পারি কি?

আসুন।

রান্নার একটু দেরি আছে নিশ্চয়।

না, না—তেমন নেই। খুব কি খিদে পেয়েছে? আজ আমারই দেরি হয়ে গেছে দেখলেন না কত সব বাজে ঝামেলা হল।

আমি ভাবছি গৌরীটার একটু খোঁজ নিয়ে আসব। সে তো এলনা আজ। বুড়ো এসেছে—উঠোনের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আপনার কোন ভয় নেই। আর একটা কথা, ও কিন্তু খাবে এখানে। যদি অসুবিধা না হয় ওর জন্য চারটি চাল নেবেন। বড্ড গরীব মানুষ। ওর একটি ছেলে ছিল, মারা গেছে ইঁদারায় পড়ে।

তা চারটি চাল তো—নেওয়া যাবে। ছেলে বাঁচা-মরার কাহিনী না শোনালেও আমি আপত্তি করব না।

না, না একটা অদ্ভুত গল্প আছে দয়ালু মেমসাহেবের। গল্পটা আবার এ বাড়িটাকে জড়িয়ে। এক সময় এ বাড়িটা ছিল নাকি স্কুলের রানী মহল। জিজ্ঞাসা করুন—ওই সব বলবে। আচ্ছা আমি তবে চলি।

শুনুন—

অমিয় বেরিয়ে আসে। একটু দাঁড়ায়। ডাকছে নাকি দীপাদেবী? না, সে তাড়াতাড়ি জামা টেনে নেয়। পায়জামা পরেই যাবে। সিগারেট দেশলাই খোঁজে। ভয় করছে রোদের দিকে চাইতে। তবু একটিবার যেতেই হবে। যে সাংঘাতিক মানুষ মাহাতো।

কেবলমাত্র সিঁড়িতে পা দিয়েছে অমিয়, দীপা আবার ডাকে, শুনুন।

অমিয় ঘুরে দাঁড়ায়। কি, ডাকছেন কেন? আবার কি—

না, তা নয়, গৌরীর খোঁজ নিতে যাবেন, আপত্তি করছি—না কি এই দুপুর একটা যদি অসুখ-বিসুখ করে তখন দেখবে কে? নিশ্চয়ই গৌরীকে দিয়ে তখন চলবে না। টাকা ঢেলে নার্স আনতে হবে। তা-ও বোধহয় এখানে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু সে ভেবে বসে থাকলে তো চলবে না—একেবারেই অমানুষ গৌরীর বাপটা। অমিয় সংক্ষেপে মাহাতোর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে। চোখে না দেখলে শুধু কানে শুনে এমন বিশ্বাস করা যায় না। লোহা পুড়িয়ে মেয়েকে ছ্যাঁকা দেয়।

এতো মধ্যযুগীয় বর্বরতা। আপনার কথা কী অবিশ্বাস করছি? ঐ বুড়োটাকে আপনার ভাত আপনি দেবেন, সেখানেও আবার বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না শুধু বলছি এখন যাবেন না। এ রোদ্দুরে খেয়াল ছাড়ুন, এতক্ষণ যদি গৌরী মরে গিয়ে না থাকে সন্ধ্যার আগেও মরবে না। রোদ কমুক, বিকেল নাগাদ যাবেন।

যথেষ্ট শক্তি ও যুক্তি থাকতেও ফিরে আসতে হয় অমিয়কে।

আসুন দেখি, আমার সঙ্গে রান্না ঘরে চলুন। আজ তো কেউ এগিয়ে জুগিয়ে দেওয়ার লোক নেই, তার ওপর একজন বাড়তি খাইয়ে, একটু সাহায্য করবেন, জগতের সকল পশুপাখির জন্য যার মায়া, সে যে কেন অন্ধ তা বুঝি না। দীপা বোধহয় এই প্রথম ব্যঙ্গ কটাক্ষে একটু হাসে।

মরুভূমির ভিতর একি সহস্রধারা গিরি নির্ঝরিনী—কিছু বুঝতে পারে পারে না অমিয়। সে সম্মোহিত ব্যক্তির মত তার সমস্ত সত্তা বিকিয়ে দিয়ে দীপার পিছন পিছন রান্নাঘরে চলে আসে। অমিয় বুঝতে পারে গৌরী কিংবা বুড়োর কাহিনী সম্পূর্ণ দীপা বিশ্বাস করেন নি। অন্তত ষোল আনা বিশ্বাসের সুর তার কথায় নেই। তবু তাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না অমিয়।

ঐ বাসনগুলো তুলে রাখুন। টেবিলটা ঝেড়ে ফেলুন, আপনি আলুর চপ না আলুর ঝাল পছন্দ করেন? আগে এক মগ জল দিন আমাকে।

কিন্তু খোকাবাবুকে কোনো হুকুম করতে হয়না সুনন্দার। পরদিন অতি প্রত্যুষেই উঠে আসে, পথে, এক মুঠো বকুল কুড়িয়ে নেয়, সুন্দর গন্ধ।

মাস্টারমশাই!

কে—? এসো, এসো, তুমি তো খুব সকালেই ওঠো।

একটু দেরি হলে কি আর উপায় আছে—যাক গে, একটা কথা আছে

তাই এত সকাল সকাল এসেছি। খোকাবাবু একটু থামে, কাকে যেন খোঁজে একটু। বকুল ফুলগুলো এক হাত থেকে নিয়ে অন্য হাতে ঢালে অহেতুক প্রতীক্ষায়।

ছোট বোনটি ছিল যেন ওত পেতে শিকারী বিড়ালের মত। সে লাফিয়ে পড়ে অতর্কিতে। লণ্ডভণ্ড করে কেড়ে নেয় ফুলগুলো, রোজ সব জিনিস কেবল দিদিকে দেওয়া, আমরা বুঝি কেউ নই?

খোকাবাবু এবং বুড়ো মাস্টারমশাই অপ্রস্তুত হয়ে যান, সুনন্দা ছিল একটু অন্তরালে। সে ছুটে আসে, একি গেছোপনা এত বড় মেয়ের, সে ওর হাত মুচড়ে ফুলগুলো কেড়ে নেয়। দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে, এখন হল তো!

ছোটটিও ছাড়ার পাত্রী নয়। সে খামচা-খামচি করে। শেষ পর্যন্ত মারামারিতে ঐ অঙ্কটার পরিসমাপ্তি ঘটে।

তুমি বাবা আবদার দিয়েই ওর মাথাটা খেয়েছে।

এর জন্য মা আমরা সকলেই সমান দায়ী—তবে বড় হলে এ স্বভাব থাকবে না।

দেখো ও বুড়ি হলেও এমনি থাকবে।

খোকাবাবু ছোটটির মুখের দিকে চেয়ে হাসে। জিজ্ঞাসা করে,সত্যি নাকি?

অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে ছোট বোনটি চলে যায়।

সুনন্দা বলে, বসুন—আজ চা খেয়ে যাবেন।

কিন্তু দেরি হয়ে যাবে না তো? বরং কথাটা শেষ করে এখন যাই, সময় মত এসে একদিন চা খেয়ে যাব।

সেদিন চা জুড়িয়ে যাবে।

মেজ বোন হেসে ওঠে।

আমার তেমন চা খাবার অভ্যাস নেই। একটু কুণ্ঠিত চিত্তে খোকাবাবু বলে, সকালে আমার জন্য বরাদ্দ আধ সের দুধ। না খেলে কৈফিয়ত দিতে হবে। সে এক ঝামেলা। শুনুন কাকাবাবু—উনি নাকি থার্ড ইয়ারে—

আমি সব শুনেছি। ভাবছি মাইনে পেয়ে ভর্তি করে দেব। তুমি চা এক কাপ খাও নইলে কোনো কথাই জমবে না। পাতলা চা, ওর পর দেখবে দুধ আধ সের খেতে একটুও কষ্ট হবে না। সুনন্দা চা আন মা।

খোকাবাবু হাত ঘড়িটায় দিকে চেয়ে একটু উসখুস করে ভাল হয়ে বসে। একটি ছোট্ট টেবিল আসে। একটা প্লেটে সামান্য কটি মুড়ি। তেল ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজা। তারপর গরম চা। সকলের জন্যই পৃথক পৃথক মুড়ি চা আসে। ছোট্ট টেবিলে স্থান সংকুলান হয় না। তাই রাখতে হয়

তক্তপোষের ওপর। গোল হয়ে বসে সবাই। শুধু বাঁকা হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে একজন। তাকে অনেক সাধ্য-সাধনে সোজা করতে হয়।

মেজ ভগ্নি বলে, না, ওকি আমাদের বোন নয়—আপনারা কেন ওকে বলবেন বিট্ নুন। সেকি মুখে ছোঁয়ান যায়।

সকলের হাস্য পরিহাস করে বটে, কিন্তু ছোটটিকেই খাতির ও আপ্যায়ন করতে হয় বেশি। কারণ ও ইচ্ছে করলেই পারে এই আনন্দের আসরে সহসা একটি বিছে ছেড়ে দিতে।

মেজ বোন জিজ্ঞাসা করে, পেঁয়াজে তো আবার আপত্তি তুলবেন না, হিন্দুস্থানী যাবে বলে? আমাদের ভয় হচ্ছে।

না, না সে সব বালাই নেই। তবে মা একটু স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলেন।

তা তা খুবই ভাল—দুধ ফলের রস থুয়ে কি আর চা ভাল।

কিন্তু পেয়ালায় চুমুক দিয়েই খোকাবাবু মন্তব্য করে—বাঃ! চমৎকার হয়েছে তো চা-টা, দুধের চেয়ে এর ফেভার যেন সহস্র গুণ বেশি।

এতক্ষণ বাদে সুনন্দা বলে, আপনার মুখে এই প্রথম রেভলিউশনের সুর: আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি—রোজ আসবেন।

মেজটি বলে, তা হলে যে মার কথা ভুলে যাবেন উনি! বরাদ্দ দুধের রোজ রোজ কি কৈফিয়ত দেবেন?

ব্রজবাবু বলেন, ঠাট্টা নয় মা—প্রতিবাদ বিপ্লব এমনি করেই শুরু হয়। ভাল যদি না লাগে তবু কি মেনে চলতে হবে গতানুগতিক নিয়ম? পুষ্টিটা যে দেহের তুষ্টিটা যে একান্তই মনের। শেষ পর্যন্ত কোনটা বড়? কার জন্য এত আয়োজন কার জন্য এত যুদ্ধ? চা খেতে ভাল লাগলে তুমি এসে রোজ খেয়ে যেও। আমাদের পর ভেবনা।

খোকাবাবু এত সময় কিছু বলেনি। সে মনে মনে গ্রহণ করেছে সুনন্দার অভিনন্দন। নিজেকে একটু নতুন ভাবে পেল সে। একটা কিসের স্রোত যেন বয়ে গেল ভিতরে ভিতরে। এ ঠিক চায়ের উত্তেজনা নয়, ইলেকট্রিক শক। এই কি নিজের সত্তাকে মুক্তি দেওয়ার স্বাদ? সে যথেষ্ট রোমাঞ্চ অনুভব করে।

কাকাবাবু তাহলে ওঁর পড়ার কী হবে?

এই তো বললাম, মাইনে পেলে যা হয় করব।

এখন যদি আমি চালিয়ে দিই—

তা কি ভাল দেখাবে? তোমার মা বাবা রয়েছেন, তাঁরা কী ভাববেন শুনলে?

কেউ জানতে পারবে না।

সেও তো চুরি—সে তো আরো খারাপ।

আমার হাত খরচের টাকা আমি ব্যয় করব,তা চুরি হবে কী করে? আমি তো অন্যায় কিছু করছিনে? যদি তা করতাম তবু ভয় ছিল, বলতে পারতেন। আপনার দু বোন কী বলেন? বলেই খোকাবাবু সুনন্দার মুখের দিকে তাকায়।

মেজবোন বলে, আমরা বাবার কথা ছাড়া চলিনে। তিনি যখন বলেছেন তখন দুদিন অপেক্ষা করাই ভাল, কী আর হবে একটা দিন পরে গেলে?

অনেক ক্ষতি হতে পারে। আপনারা বাবার কথা ছাড়া চলেন না, কিন্তু মার কথামত যে চলে তাকে দেখে হাসেন—আশ্চর্য!

সুনন্দা লজ্জা ঢাকবার জন্য বলে, উনি যখন এত আগ্রহ করছেন, তুমি আপত্তি করছ কেন বাবা?

না কোনোই কারণ নেই। তারপর ব্রজবাবু শুধু বলেন, নারায়ণ নারায়ণ! তোমার ইচ্ছা বোঝা ভার।

ঘণ্টা কয়েক বাদে দুজনে স্টেশনের দিকে রওনা দেয়, ব্রজবাবুর মুখ তেমন প্রসন্ন নয়।

সেদিন এমনি দুপুর।

দীপা ভাবে, না গেলেই কি চলত না? কিন্তু আজ তো অমিয় তেমন জবরদস্তি করলনা। কেমন সুন্দর হুকুম তামিল করে চুপচাপ বসে রয়েছে, কত যেন নম্র, কত যেন ভালমানুষ। খোকাবাবুর কথা ভেবে ভিতরে ভিতরে দীপা জলে ওঠে, একমগ জল দিতে দশ জায়গায় ফেললেন, নুনের পেয়ালায় তেলের বোতলে জল পড়েছে।

এখন সামলান।

পেয়ালাটা কাত করে নুনখানি কোনোক্রমে রক্ষা করতে পারে অমিয়। কিন্তু তেলের জল কী করে আলাদা করবে? এ-ও এক সংসার অনভিজ্ঞ যুবক। দীপার করুণা, অমিয়র রকম সকম দেখে। সে মনে মনে হাসে, কিন্তু মুখে পরম গাম্ভীর্যের মেঘাড়ম্বর। তার রান্নার দেরিটুকু ওই মেঘের আড়ালে ঢাকতে চায়। আবার কেন ভাললাগে ওমনি একটি অপ্রস্তুত পুরুষকে সার্কাসের ক্লাউনের মত নিজের কাছে রাখতে, ধরবে না, ছোঁবে না—কিন্তু দূরে ঠেলেও দেবে না।

এ তেলটাকে ফেলে দেব? বুড়ো রয়েছে ওকে দিয়ে না হয় আর এক সের আনান যাক, কত আর দাম।

আমরা কিন্তু দণ্ড দেব না।

আপনার শুধু হিসেব! আমি নষ্ট করেছি, আপনি কেন ক্ষতিপূরণ দেবেন

—এটুকু বোঝার মতও কি আমার বুদ্ধি নেই। মাস্টারি করে করে আপনি জগৎসুদ্ধ লোককে কেবল ভাবেন বোকা—এ এক ট্রাজেডি দীপাদেবী।

ক্ষতি করে কী সত্যি সত্যি ক্ষতিপূরণ করা যায়?

যাবে না কেন? আইনে সমাজে এ ব্যবস্থা রয়েছে, অহরহ মামলা মোকদ্দমা মীমাংসা হচ্ছে—সালিশী ব্যবস্থা চলছে। ঘরের গণ্ডীর বাইরে এসে একটু চেয়ে দেখুন।

ভাল করে ভেবে জবাব দিন। আর্থিক ক্ষতিটাই বড় ক্ষতি নয়।

কেন? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে অমিয়। তার চিন্তা এখনো তেলের অঞ্চল ছাড়িয়ে দূরে যায়নি। আবদ্ধ রয়েছে দু টাকা বার আনার মধ্যে।

দীপা একটু ক্রুর কণ্ঠে বলে, আপনি কি আমার মনের ও শরীরের ক্ষতি করে দু টাকা বার আনা দিয়েই নিষ্কৃতি পেতে চান? পুরুষমানুষগুলো কি এমনি পাষণ্ড! যার সঙ্গে দেখা হবে সে-ই কি এক ছাঁচে গড়া? আমরা কোথায় লুকোই বলুন তো?

ক্ষমা করবেন দীপা দেবী। আমি তো সে কথা ভাবিনি। আমি তো শুধু তেলের দামটা—দিতে চেয়েছেন এই তো? ও দিতে হবে না। তেলে জলে কোনো দিন মিল খায় না। তাই আপাতত ও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। রান্না প্রায় হয়ে গেছে, আপনি বুড়োকে ডাকুন।

ও এদিকে আসবে না—অচ্ছুৎ।

দীপা বুড়োকে এক লহমার জন্য দেখে নেয়। ঠিক ঘরের ছায়াও দাঁড়াতে সাহস পায়নি—রোদেও দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু যেন ঝলসে যাচ্ছে গরমে অথচ একেই এই একটু আগে প্রয়োজন হয়েছিল আশঙ্কা ও মর্যাদার হাত থেকে রক্ষা পেতে।

দুজনে মিলেমিশে ওকে যত্ন করে খাওয়ায়। ও এঁটো খেতে অভ্যস্ত, আগে খেতে অনেক আপত্তি তোলে। তা নাকচ করে দেওয়া হয় নির্মমভাবে। বুড়ো আবার বলে, কুল পরিবারের ইতিবৃত্ত। আবার কৃতজ্ঞতা জানায় মেমসাহেবকে—যে দিয়েছিল একশ টাকার নোট। কিন্তু কেন যেন তার বুক পুড়ে ওঠে।

ওরা চুপ করে শোনে।

বুড়ো আহারান্তে চলে যায়।

তারপর সারাটা দিন কিন্তু তেলে-জলে সত্যি মিশ খায় না। পর্দার এ পাশে যখন দুখানা হাত সেলাই নিয়ে ব্যস্ত, এ পাশে পোড়ে সিগারেট। সন্ধ্যার একটু আগেই অমিয় বেরিয়ে যায় দিলরুবার উদ্দেশ্যে।

আটত্রিশ

সারাদিন ঘুরে অনেক উঁচু নিচু পাহাড় জঙ্গল ভেঙে বিনয় এবং মেয়েরা শ্রান্ত হয়ে বাংলোয় যখন ফিরে আসে তখন রাত আটটা। ময়ূর, ঝর্ণা, হরিণ এমন কি বাঘের পায়ের দাগও দেখেছে, বোধহয় বাকি নেই বিষধর সাপ এবং দাঁতালো শুয়োর দেখা। ফটো তুলেছে হরেকরকম। খেয়েছে যদিচ্ছা। তবু কিছু সেল হয়নি। কী যেন বাকি রয়ে গেছে। কী যেন ওদের মৃগতৃষিকার মত ফাঁকি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সারা দিন। শীলার চোখ ভিজে উঠেছে, বিনয় তা মোছাতে পারেনি। বিনয়ের পরিশ্রমে সারা দেহ মন অবশ হয়ে এসেছে—তা দূর করতে পারেনি অনিমা। আর অনিমার মুখে যে কালির প্রলেপ পড়েছে তা মোছাতে পারেনি কেউ। ওরা শুধু পাগলের মত নিষ্ঠুর তৃষ্ণায় ঘুরেছে।

ফিরতি পথে বিনয় এর মধ্যে এক গুচ্ছ ফুল পেয়েছিল—পাহাড়ী ফুল: কড়া রৌদ্রের মত চড়া সৌরভ।

শীলা ভেবেছিল সেই পাবে, অনিমা ভেবেছিল হয়তো সেও পেতে পারে—ইন্দিরার প্রলোভন ছিল অত্যন্ত কিন্তু পেল আর একজন—যে আশা করেনি কখনো।

দীপাদেবী এই নিন। আপনি যাননি, কখনো হয়ত যাবে না বেড়াতে—এটা আপনারই প্রাপ্য। জঙ্গলের মধ্যে ফুটে ছিল, খুঁজিনি চেষ্টা করিনি—যেন হাতে ঠেকল। একেই বলা চলে ঈশ্বরের ইচ্ছা, কিংবা অদ্ভুত যোগাযোগ।

ধন্যবাদ। রেখে দিন—এখন আমার হাত এঁটো। একটু পরে দেখবখন: আগে আপনাদের খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ করে নি। কত পরিশ্রম করে আপনারা আসছেন।

মেয়েদের সারা মুখে হাসি ফোটে। ওরা কাপড়-চোপড় বদলাতে চলে যায়।

কি আর করবে বিনয়, অগত্যা বলে, আচ্ছা একটু বাদেই দেখবেন না হয়। এই এখানে রইল টেবিলের ওপর।

বিনয় চলে যায়। কাজকর্মের ভিতর আকুল করে দীপাকে। কে সে ওদিকে ইচ্ছা করে ফিরে তাকায় না। কী ফুল সে তাও লক্ষ্য করে জানতে চায় না।

কোনো রকমে সবাইকে ভুলে দিয়ে সুশীল না বলে কয়ে ছুটি নেয়। এতক্ষণ সে তাদের সঙ্গে ঘুরেছে, তাদের চেয়ে তার ভাগ্যে নতুন কিছু ঘটেনি। সেও অনেক খেয়েছে, অনেক হেঁটেছে, কিন্তু সবই যেন গেছে বিফলে।

কতক্ষণ গৌরীকে দেখেনি, কতক্ষণ ও হাসি ঠাট্টা করেনি, ওর বুকটা পুড়ে ওঠে, ছাই এ চাকরি, মিথ্যা এ দুনিয়ারদারি। ও পড়ে কি মরে ছুটে চলে।

অন্ধকার পথ। দৌড়ন দুষ্কর। তবু যতদূর সম্ভব দ্রুত পা ফেলে। ও জীবনে যে আস্বাদ কোনো কালে পায় নি, কাল তা পেয়েছে। কী তীব্র মর্মান্তিক অনুভূতি। এখন তার সারা দেহে ধিকধিক জলছে। এ জ্বালা বোঝান যায় না, বুঝেও বোধ হয় কোন বিহিত করা চলে না। এর ওঝা-বৈদ্য জানা নেই সুশীলের মন্ত্রতন্ত্র সে দাওয়াই করবে। এর একমাত্র ওষুধই হচ্ছে গৌরী—যেন তপ্ত তাওয়ায় তাতান দেহাতি মেয়ে! ইচ্ছা করলেই বিষে বিষক্ষয় করে দিতে পারে।

কয়েকটি মহল্লা পার হয়ে সুশীল দিলরুবা কেবিনের কাছে থামে। গাছের তলায় সিগারেট জলছে। পাশে একটি আবছা মেয়ে। কথা বলছে। সুশীল থমকে দাঁড়ায়। হয়ত আর এগুনো উচিত হবে না। এতটা এগিয়েও ভাল করে নি।

গৌরী ঠিকই টের পেরেছে, কে?

আমি সুশীল। শুকনো মুখে সে অমিয়র সুমুখে এগিয়ে যায়। ভেবেছিল চুপ করে থাকবে কিন্তু ধরা পড়ে গেছে যেন হাতে-নাতে।

সবাই ফিরেছে? কেমন দেখলি?

আমার কাছে তো সব পুরনো। তবে মন্দ নয়—ওঁরা খুব ঘুরেছেন। হৈ-চৈ ইচ্ছা মতো।

তাই নাকি। আচ্ছা এখন যাই গৌরী। চল সুশীল এগোও।

ভাল কথা। এই জন্যই কি সুশীলের শুধু এতটা পথ হয়রান হয়ে আসা? সারাদিনের পরিশ্রমের পর এ যেন মারাত্মক প্রহার। তার বাংলোর দিকে ফিরতে যেন পা উঠছে না। কিন্তু কী বলবে বাবুকে? যদি জিজ্ঞাসা করে কেন এসেছিল সুশীল এখানে? এর মধ্যেই তোমার এতখানি পাখা গজিয়েছে।

দেওয়ার মত কোনো উত্তর নেই। সুশীল ভয়ে দুঃখে লজ্জায় অধীর হয়ে এগিয়ে চলে। পিছন ফিরে তাকাবার মতও তার সাহস নেই। তার মনের অবস্থা তখন ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

কিছুটা পথ এগিয়ে এসে অমিয় জিজ্ঞাসা করে, আমাকে বুঝি ডাকতে পাঠিয়েছে?

সুশীল চট করে জবাব দেয়, হ্যাঁ, দীপাদি বসে রয়েছেন।

অমিয় বলে, থাকতে পারেন—তবু বিশ্বাস হচ্ছে না, হয়ত বিনয়টা তোকে এখানে পাঠিয়েছে।

তাই বাবু।

তবে যে বললি দীপাদির কথা?

এমনি। রেহাই পেয়ে সুশীল হাসে। ভুল বুঝেছি বাবু।

অন্য দিন হলে এ কৈফিয়ত দিয়ে সুশীল হয়ত এড়াতে পারত না, আজ তা পারে। গৌরী সমস্ত দিনটা ঘরে নজরবন্দী ছিল। ভাল মন্দ যথেষ্ট শুনেছে—মার খেতে যা বাকি। তাও হয়ত সে খেত। রক্ষা পেয়েছে অমিয়র দরুন। সে এসেই মাহাতোকে প্রণামী দিয়েছে পাঁচ টাকা। সে হেসে ডগমগ হয়ে সরকারকে বড়া কুর্ণি দিয়েছে। সেলাম করেছে।

চা লেআয়—বেলাক্ ক্যাটকা উমদা টিন। টোস্ট লে আয় ডব্বল ডব্বল। জানি যে হুজুরকে আসতে হোবে এখানে। আমি দিনের বেলা হাত দেখিয়েছি এক গণক পণ্ডিতজীকে।

কার হাত দেখালে মাহাতো? তোমার?

না হুজুর গৌরীর। বললে যে ভাল হাত আছে তোমার বেটির। বুড়া বয়েসে ও তোমাকে খাওয়াবে। কোনো তকলিফ হোবে না।

ভাল কথা। এর চেয়ে আসল সংবাদ আর কি থাকতে পারে!

এর মধ্যেই মাহাতো একটা মন্দ কথা বলে, এই শালা লোভা এক গেলাস পানি নিয়ে আয় হুজুরের জন্যে।

বালকের দল সন্ত্রস্তে ব্যস্তে ছুটে যায়। ওদের নিষেধ করে গৌরীর নিয়ে আসে জল, সিগারেট ফেলে দিয়ে হাতখানি ধুয়ে নেয় অমিয়।

কাঁটা-চামচে দেব বাবু? গৌরী জিজ্ঞাসা করে, দেব?

পেয়ালা ও ডিশের দিকে চেয়ে অমিয় বলে, নতুন আর পুরনো—যা হয় একটা দাও, না দিলেও চলে, কিন্তু ওরা কি হাঁ করে থাকবে? ওদের বরাদ্দটা নিয়ে এসো আগে।

গৌরী ইতস্তত করে একটু।

মাহাতো চটে ওঠে। হুজুর বলছে আর ও দাঁড়িয়ে রয়েছে আসমান জমিন হাঁ করে। দে দে ডব্বল ডব্বল—হামাকে ভি দে। তুই ভি খা চা টোস্ট। বাবু খিলাচ্ছে আর রাণ্ডিকি যেন কলিজা ছাই হয়ে যাচ্ছে। ঘরমে আটা নেই যে রাতে রুটি বানাবি।

অমিয়র খাওয়া নিমেষে বন্ধ হয়ে যায়। তার মাথায় কে যেন একটা মুগুরের ঘা মেরেছে দুর্দান্ত জোরে। তার দৃষ্টি ঘুলিয়ে যায়। অমনি গৌরীর ভিতরে সে দেখতে পায় মায়ের ছায়ামূর্তি। কপালের ক্ষত চিহ্নটা এখনো শুকোয়নি।

সুস্থ হতে তার বেশ একটু সময় লাগে। ততক্ষণে উলঙ্গ অর্ধনগ্ন রঙ-

রুটদের খাওয়া হয়ে যায়। মাহাতো দিয়েছে একটি বারেই পুবে। এখন সে গোঁফে চাড়া দিয়ে হয়ত মনে মনে হিসেব করছে।

অমিয় ভাবে, ও বেটা কোনো ইংরাজি কি উর্দু অথবা দেবনাগরী জানে না। পড়েনি কোনো ডিটেকটিভ কাহিনী। কিন্তু অমিয়কে বেশ একটা কাঁচি কলে ফেলেছে—ফলে ওর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ক্রমেই যেন চাপটা আসছে বিষম।

এ চাপ এড়ানর উপায় কি? অমিয় তো অনায়াসে সরে পড়তে পারে, কিন্তু তখন গৌরীর অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? শক্ত পরীক্ষায় পড়েছে অমিয়। এ আর কিছু নয়—নিছক হৃদয়ের পরীক্ষা, টোস্টের বদলে তার রীতিমত হাত পা চিবুতে ইচ্ছা করে।

মাহাতো বলে, যে একটা টাকাই সম্যক চেয়েছিল গণতকার। তাকে সে দুআনা দিয়েছে। তাও নগদ দিতে পারে নি—অর্থাৎ ইচ্ছা করেই দেয় নি। পারিশ্রমিক বাকি রেখেছে। এক বাবু নাকি পেয়ার করে গৌরীকে—একথার সত্যতা যদি দীর্ঘদিন ধরে প্রমাণিত হয় তবে গণক যখন নানা দেশ-বিদেশে ঘুরে এই পথে ফিরবে তখন মাহাতো তার পাওনাটা নাকি কড়ায়-ক্রান্তিতে চুকিয়ে দেবে। সে কারুর 'হক' মারবে না।

অমিয় অবাক হয়ে শুনে বিলের টাকা চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে। মাহাতো দু হাত তুলে আশীর্বাদ করে। আর চোখ দিয়ে ইশারা করে গৌরীকে সঙ্গে যেতে। রুখে দাঁড়ায় বালক রঙরুটদের পথ। হাড্ডি ভেঙে তব কুর্তালোক বাবুকে জ্বালালে।

কথা বলবেনা ভেবেছিল অমিয়। বাবুজি ডাক শুনেই থামতে হয়। কেন যেন টানে থামিয়ে দেয় তার গতি। অমিয় বিস্ময় বেদনায় অধীর হয়ে ভাবে এতো গৌরী নয়।

—যেন নাড়ীর টানে পূর্ণ আহুতি।

কবে আমায় নিয়ে যাবেন?

জানিনে—তুমি যাও। তুমি ফিরে যাও।

যত তাড়াতাড়ি পারেন ততই মঙ্গল।

জানিনে আচ্ছা দেখব। আমার ক্ষমতায় কুলোলে তো।

মুখে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় নি অমিয়। কিন্তু হৃদয়টা তার বড্ড বেহিসেবী। সে আয়ব্যয়ের হিসেব দেখতে চায় না। সঙ্গতির প্রশ্ন তার কাছে অবান্তর। সে অসংযমী।

একটা লোক ঠিক করতে হবে সুশীল।

কেন?

তোমাদের দীপাদি গৌরীকে মোটে পছন্দ করেন না।

আমিও তো বাবু তুলে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি কি ভাবেন তাই আর বলিনি।

ভালই করেছ। তোমার এসব কথায় না থাকাই ভাল। সুন্দরী হয়ে ছোটলোকের ঘরে জন্মেও রেহাই নেই—এ এক অভিশাপ। নইলে গৌরীর আর কী দোষ বলো! ওকে আমরা এখানে যে কদিন আছি রাখব—ওদের তুমি একজন লোক ঠিক করে দেবে, আর ভাবছি বাসাটাও বদলাব। এ কথা তুমি কারুকে বলতে পারবে না। চলো কানাই সর্দারের সঙ্গে দেখা করে যাই। সে একটা ছোটখাটো বাসার সংবাদ হয়ত দিতে পারবে। কাল উঠে যেতে পারলেই ভাল হয়।

আমিও কিন্তু যাব।

তাতো যাবেই—সেই জন্যই তো লোকের দরকার। আবার এমন লোক দিতে হবে যাতে ওঁদের না অসুবিধা হয়। সে হয়ত কানাই পারবে।

আচ্ছা বাবু একি ভাল দেখাবে? ওঁরা কি ভাববে বলুন তো?

তবু গৌরীর জন্য তা করতে হবে আমাদের।

যেটুকু সন্দেহের ছবি পড়েছিল সুশীলের মনে তা পদ্ম পাতার জলের মত গড়িয়ে যায়, সে বলে আপনি বাবু দেবতুল্য পুরুষ।

কখনো দেবতা দেখেছ?

না।

তবে যে তুলনা করলে?

লোকে বলে, লোকে ভাবে—আমিও তাই বলেছি।

কিন্তু দেবীকে ত দেখেছ।

সুশীল বিমূঢ় হয়ে অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করে,সকলি বুঝতে পারে অমিয়। সে বলে, দেবী এখানে নয়—বাংলোতে। দশভুজা নয়—মিস্ট্রেস দেবী খাণ্ডারধারিণী।

তা নয় বাবু তা নয়—দীপা দিদি কি করিৎকর্মা মেয়ে,তাঁর কাজ কাম সেলাই আপনি কখনো লক্ষ্য করে দেখেন নি। দেখলে এ কথা বলতে পারতেন না।

সত্যি?

হাঁ বাবু—একেবারে সূর্য চন্দ্রের মত সত্যি।

অমিয় তা বিশ্বাস করে, কিন্তু এখনো ষোল আনা স্বীকার করে না মন

থেকে। হতে পারে সেলাইতে নিপুণ দীপা, দক্ষ চিকন সুঁই দিয়ে রিপু করতে—কিন্তু এমন দুপুরটা যে আজ অবহেলায় খুঁটোয় বেঁধে ছিঁড়ে চৌচির হয়ে গেল, তা মেরামত করবে কে ?

অমিয়র মনে যখন এই প্রশ্ন, দীপা তখন ওদের অপেক্ষায় বসে রয়েছে রান্না ঘরে। সকলের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে, বিশ্রাম করতে গেছে যে যার নির্দিষ্ট স্থানে। দীপা টেবিল থেকে ফুলের গুচ্ছটা আনমনে তুলে নেয়। তখনি আবার রেখে দেয় টেবিলের ওপর। একটা যেন আঘাত পেয়েছে। বিনয় আবার কেন নিয়ে এলে ফুল? সে কি চায়? কি তার অভিপ্রায়? দীপা কি এখন মারা যাবে পাশাপাশি আপ্ এবং ডাউন গাড়িতে পা দিয়ে। আর আদৌ গন্তব্য নেই—আর কোনো আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, দীপা চুপ করেই বসে থাকবে। তার ভিতর মাঝে মাঝে স্পন্দন জীবিতের না, মৃতা কোন নারীর।

বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা চলে না—খোকাবাবু বলে, এই গাড়িখানায় উঠে পড় সুনন্দা। এখানে বেশি সময় দাঁড়ায় না। ঐ হুইসেল শোন। এসো, এসো এগিয়ে চলো।

আজ ইচ্ছা করে দীপার সুনন্দাকে টেনে নামাতে, কিন্তু উপায় নেই—উপায় নেই। ওর হাহাকার করে প্রাণটা।···

প্রথম শ্রেণী কামরা—গদি ফ্যান বৈদ্যুতিক আলো—রঙে জৌলুসে অপরূপ। প্যাসেঞ্জার বলতে মাত্র ওরা দুজন এবং আর একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা ডিটেকটিভ্ বইতে মুখ ও দৃষ্টি ডোবান। সৃষ্টি রসাতলে গেলেও তার চোখ ফেরাবার উপায় নেই। মহিলা যে প্রান্তে তার বিপরীত প্রান্তে ওরা গিয়ে বসে। কিন্তু সুনন্দা ও খোকাবাবুর মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান।

সুনন্দা আর প্রথম শ্রেণীর বাসে কখনো ওঠেনি। এত চাকচিক্য ও আরামের উপাদান দেখে সে কেমন যেন হকচকিয়ে যায়। হাসে, চুল গোছায়, এদিক ওদিক চাহনি ফেলে সলজ্জ। বাইরের চলন্ত দৃশ্যগুলি ওর মনে আঁকাবাঁকা স্কেচ আঁকে। তখনি কিন্তু বোঝো না—কিন্তু বিশেষ একটা ছাপ ফেলে ঠিকই? বন্যার ধ্বংসলীলা যেন কতকটা সামলে নিয়েছে চির সংগ্রামী মানুষ একটু আড়ালে দেখা যাচ্ছে নতুন ছাউনি, মরসুমী ফসলের বুনাট। গাভী প্রসব করছে সন্তান। নদীর বালিয়াড়ির খাদে খাদে নবীন অস্পষ্ট আলিঙ্গন।

দেখুন, ধ্বংসকে মানুষ স্বীকার করে না।

খোকাবাবু জবাব দেয়, কিন্তু ধ্বংসইতো নিষ্ঠুর সত্য।

কি বললেন' শুনতে পাচ্ছিনে?

এগিয়ে আসুন ফের বলছি।

সুনন্দা এগিয়ে যায়। প্রায় পাশটিতে এসে কম্প্রমান হয়ে থাকে। বার কয়েক চেয়ে দেখে মহিলাটির দিকে। সে পূর্বেই মতই মুখ ডুবিয়ে আছে বইতে। হয়তো খুনোখুনির অধ্যায়, এর বাইরে যে কিছু আছে, তা ভাবতে বা দেখতে হয়ত অভ্যস্ত নয় সে। সুনন্দা স্বস্তি বোধ করে। কি যেন বলবেন?

তুমি আমি একদিন থাকব না—এই তো প্রকৃতির এবং বৈজ্ঞানিক সত্য। তাই বলছি উপভোগ করে নাও কানায় কানায়।

হাসালেন আপনি। এ ধ্বংসের নির্মম স্বরূপ উপলব্ধি নয়—এ নিছক রোমাণ্টিক কাব্য-বিলাস। জন্মমৃত্যুর মাঝখানে একটা অপূর্ব ম্যাজিকের কার্ড আছে। সত্য নয়, কিন্তু এর চেয়ে বড় সত্য কিছু নেই। সমস্ত জীব জগৎ এই কথাই উপলব্ধি করে। তাই সংগ্রাম, তাই আসা। বেঁচে থাকা এত মনোরম। আজ তো গন্তব্যে পৌছবে যাবই, তবু এই জার্নিটা ওই জন্যই ভাল লাগছে, সব শেষ হয়ে যাবে এই মন নিয়ে কি পাশাপাশি চলা যায়? ভাল লাগে এই ছুটে চলা জার্নি?

সুনন্দা থামে। একটু আঁচলটা সামলায়। বাঁকা চাঁদের মত হাসে। জিজ্ঞাসা করে, সত্যবাদী মন নিয়ে কি পূর্ণাঙ্গ উপভোগ সম্ভব!

না।

তারা দূরের সত্যকে ধরতে গিয়ে, নিকটের সত্যকে অবহেলা করে।

আমি তাতো করিনি। আমি ত ভোগকেই স্বীকার করে নিয়েছি। বাসনাকে বড় বলেছি।

আমি যা বলেছি তা কি আপনার মনে নেই?

তা হলে আপনি দুঃখবাদী নন, মিথ্যাবাদী। নিজের মনে জটিল গ্রন্থির পাকে পাকে নিজেই হারিয়ে গেছেন। যতদিন কেটে বেরিয়ে না আসতে পারছেন ততদিন বুদ্ধির মুক্তি নেই। ভোগে নিষ্ঠা নেই। এক ধরনের দুর্বলতা, এখানে কিন্তু আপনার মার শাসন নেই জানবেন।

আমি মার শাসন অস্বীকার করেছি সুনন্দা।

বাহুল্য বর্জিত প্রথম সম্বোধনে একটু শিউরে ওঠে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করে, কি করে?

পরীক্ষাটা দিইনি এবার।

আপনি ভাল ছাত্র, দোষ হয়নি, ডিসিপ্লিন যখন নালিশ হয়ে দাঁড়ায় তাকে রুখতে হবে। আর যখন অভাব হবে, তখন কঠোর হাতে তা চুকিয়ে দিতে হবে। এখন আপনার মনের দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে উঠুন।

উঠব সুনন্দা—তোমাদের সংসর্গ আমাকে নতুন পথ দেখাচ্ছে। এতদিন যেন মায়ের আঁচলে বাঁধা ছিলাম। নিজের পৃথক অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারিনি। পরীক্ষাটা না দিয়ে যে কি আনন্দ হচ্ছে।

এ তরুণ বিপ্লবীর দিকে স্নেহ ও প্রীতির চোখে তাকায় খোকাবাবু। ট্রেনে শব্দায়মান গতির সঙ্গে দুটি হৃদয় কাঁপে—কাঁপে চোখের তারা ও পলক?

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলার এদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। ভ্রূকুঞ্চন করে শুধু হয়ত খুনখারাপি রাহাজানির ভিতর ডুবে যাচ্ছে।

গাড়ি দুটো স্টেশন পেরিয়ে এসে থামে। ওরা নেমে পড়ে।

দীপা ডেকে বলতে চায় ওরে ফিরে আয় সুনন্দা—কিন্তু তার গলার স্বর বের হয়না। কেন যেন ভিতরে আটকে থাকে।

উনচল্লিশ

অমিয় এবং সুশীল কানাই সর্দারের খোঁজে রিকশা স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে দাঁড়ায়। অনেকটা রাত হয়েছে—স্ট্যাণ্ডে বেশি রিকশা নেই। এখন কানাইকে পাওয়া গেলে হয়।

সুশীল বলে, যাবে কোন চুলোয়? ওর তো ঘর সংসার নেই। খায় হোটেলে ঘুমোয় রিকশায়, বড় জোর আড্ডা মারে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে। একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে ওকে।

ওরা স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি যাওয়া মাত্র রিকশাচালকরা ওদের দিকে এগিয়ে আসে।

সুশীল বলে, একটু আস্তে, চাপা দিওনা। আমরা ভাড়া যাব না! বলতে পার কানাই সর্দার কোথায়? একটু জরুরি দরকার ছিল।

ক্যাপটিন? একজন জিজ্ঞাসা করে, তোমার নাম? কানাই সর্দারকে চাও? কেন বলত?

আরে জ্বালা, টিকটিকি পুলিস নই—ভয় নেই সর্দার কোথায় খবরটা দাও সে কি ভাড়া খাটতে গেছে? সে খুব ভালই করেই চেনে।

ওরা কোনো জবাব দেওয়ার আগেই কানাই সর্দার ফুল ফোর্সে প্যাডেল করতে করতে এগিয়ে আসে। উঠুন হুজুর, সেলাম।

না আমি ভাড়া যাবনা—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে জরুরি।

উঠে বসে বলুন—

অমিয় রিকশায় উঠে বসে। কানাই গাড়িখানা একটু ঘুরিয়ে দূরে নিয়ে

যায়। একটু চা খাবেন? আমাদের তো ঘরগিরিস্থি নেই, এই রিকশা আর ডালিমবাগে ঐ প্রিয়াকাফে। বেমারী-বুখার হলে সদানন্দ ডাগতর—ব্যস! চা ভাল বানায় গুলজারিলাল।

এরপর চা না খেলে দুঃখিত হবে সর্দার। অমিয় বলে, তবে দাও হাফ কাপ—নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।

কানাই সিট থেকে লাফিয়ে পড়ে। সে ছুটে যায় প্রিয়া কাফের দিকে।

অমিয় ওপরের দিকে চেয়ে বসে থাকে কানাইয়ের অপেক্ষায়। অনেক তারা উঠেছে। রাস্তার দুপাশে অবিন্যস্ত শাল গাছ—কোথাও বা শিশু, কোথাও বা পিতামহ। নিচে রুক্ষ পৃথিবীর মৃত্তিকা, ওপরে নিষ্কলঙ্ক আকাশের চাঁদোয়া। এর মধ্যে ওরা যেন যোগসূত্র। বেঁচে রয়েছে আকাশের আলো হাওয়া ও মাটির আশীর্বাদে। রুক্ষ হলেও মাটির মমতা রসনাময় অপূর্ব। গৌরী কানাই সুশীল অমিয় তো সভ্যতার যোগসূত্র। কিন্তু ওদের বেলা সমাজ কেন উদাসীন?

পরম যত্নে সর্দার প্লেটে ঢেকে চা নিয়ে আসে। তার সঙ্গে একটা ডবল মামলেট। এত খেলে রাত্রে আর কিছু খাওয়া যাবে না।

না হুজুর এতো নস্যি।

সর্দার আমাকে কালই একটা ছোটখাটো বাসা ঠিক করে দিতে হবে। দিনকয়েক থাকব দুবকুতে—ছুটি তো ফুরিয়ে এল যা ভাড়া লাগে। আর তোমার খোঁজে কি একটি ভাল লোক আছে—যে ঝির কাজ করতে পারে, হাটবাজারও হয় তাকে দিয়ে?

সব আছে। কবে চাই এসব?

কাল দিনের মধ্যে।

এত বড় বাংলো বাড়িতে কি কুলাচ্ছে না? আপনারা উঠে গেলে ওঁরা সব থাকবেন কি করে? না ঝগড়াঝাটি কিচিরমিচির হোয়েছে? ওঁরা তো লোক ভাল।

আমিই খারাপ কানাই সর্দার, অমিয় হাসতে হাসতে বলে, আমার সঙ্গে কারুর বনে না।

তা হোবে কেন? হামি কাল না পারলেও পরশু সব ঠিক করে দেব, রামদীনের পাকা কোঠি আছে, আর ঝি একটি মহল্লায় জুটে যাবে। কত শালা বেকার বসে আছে। এ বছর নাকি মাঠে কাজ নেই, অথচ দলে দলে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে কৃষক কৃষানী। একটা কাজের কথা শুনলে হাজারটা ওড়বে হুমড়ি খেয়ে।

দেখো চোরবজ্জাত অসৎ চরিত্র না হয়।

কানাই দাঁতে জিভ কাটে। সে বলে যে, সবে যারা দেশছেড়ে আসে কখনো অমন হয়না। ওদের দেশে গোয়ালা জল মেশাতে শেখে শহরে গরুর খাটাল করলে।

অমিয় লক্ষ্য করে কানাই সর্দারের কথাটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এ কাজ জুটো করে দিলে তুমি বকশিস পাবে। একটু গা লাগিয়ে চেষ্টা করো। সুশীল এখন তবে চলো।

আমিই এগিয়ে দিচ্ছি আপনি আর নামছেন কেন?

মন্দ নয়—উঠে এসে বসো সুশীল। বেশ রাত হয়েছে।

দু এক দিনের মধ্যে এ বাংলো বাড়িটা ছেড়ে যেতে হবে। কদিন আগেই তো এসেছে। স্মৃতি জমেছে অনেক। মনে দুঃখ হয় অমিয়র। দীপার জন্যই ছেড়ে যেতে হচ্ছে। ওর আকর্ষণও যেমন, আঁচও তেমনি। অন্য কারুর সঙ্গে ওর তুলনা হয়না। দীপাকে সহজ করে পাওয়া বড় কঠিন। হয়তো আদৌ তা পাওয়া যাবেনা, তাই দূরে সরে যাওয়ায় আজ এ প্রস্তুতি। অমিয়র কাছে স্পষ্ট একটা প্রশ্ন করলে হয়ত ঠিক উত্তর পাওয়া যাবেনা।

দীপাকে সে কেমন করে চলতে বলে?

আব্রু বে আব্রুর স্বাধীনতাও কী তার থাকবে না সেকি ঊর্ধ্বে চলে যাবে মানবীয় হিংসা দ্বেষের ?

তা নয়।

তবে অমিয় কি চায়, কি তার একান্ত প্রার্থনা ?

জবাব জোগায় না অমিয়র মুখে, সে থতমত খায়।

যদি দীপার পারিপার্শ্বিক এবং সামাজিক বেষ্টন অন্তরায় হয়ে থাকে ? অমিয় শুনেছে ওরা নাকি সবাই টেম্পরারি স্টাফ। ইস্কুলটি চলে পাঁচ জনার চাঁদায়, সরকারী কোন সাহায্য পায়নি, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও তেমন নয়। হঠাৎ আগুন লেগে অসময় ইস্কুল ঘর মেয়ে হোস্টেল পুড়ে গেছে। ওদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। টাকা পয়সা যোগাড় না হলে ঘর হয়ত উঠবেনা। এই হয়ত শেষ ছুটি।

অমিয়র সাধ্য আছে যে ইস্কুল আবার মেলাতে পারে ? ফিরিয়ে আনতে পারে ওদের কর্মব্যস্ত জীবন। দীপা যেখানে মধ্যমণি ? অমিয়র সে সাধ্যি নেই। ভাঙা হাটে সে আর ক্রেতা ফিরিয়ে আনতে পারে না। ভাঙা অ্যাম্বিলেটর বদলে তার অন্তত মোটর চালাবার ক্ষমতা নেই। হয়ত দীপার পারিবারিক দায়িত্ব আছে প্রচুর। কে তা নিতে পারে কাঁধে।

মেয়েরা শুধু আজ মেয়েই নয়। তাই তাদের সমাপ্তি নয়, একটি অবগুন্ঠিতা বধূ-জীবনে, যে জননী জায়ার সঙ্গে সহগামী হতে বাধ্য হয়েছে, বাইরের প্ল্যাটফর্মে সেখানে সহস্র বেকার পুরুষের ভিড়। কত ইলাস্টিক ওরা—ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সত্য সত্য অভিভূত হয়ে অমিয় রিকশায় বসে থাকে। রিকশা হেলেদুলে টক্কর খেয়ে আগিয়ে চলে।

দীপা প্লাস্টিক নয়—অদ্ভুত ইলাস্টিক। ওকে ভোলা দায়। তবু জোর করেই ভুলতে হবে মালতীর মত। কয়েক ঘণ্টায় কি যে চির খাইয়ে দিয়েছিল সে মেয়ে। সময় সময় এখনো সে মাথা কোটে অমিয়র হৃদয়ের চৌকাঠে—আমি হাজার বিড়ি নামাতে পারি, পছন্দ না হলে করতে পারি ট্যুইশনি, একটা মাস অন্তত ট্রায়াল দিয়ে দেখুন।

তখন মালতীকে তা দেওয়া হয় নি, আজ দীপাকেও কিছু দেওয়া যাবে না—দোষ অমিয়রই। তাই তারই পলায়নের জন্য এ প্রস্তুতি।

নামুন বাবু। ঐ তো বাংলো।

সুশীল তুমি গোপনে কাল দেখা করবে সর্দারের সঙ্গে।

আচ্ছা বাবু।

অমিয় এগিয়ে যায় বাংলোর সিঁড়ির দিকে।

অমনি পিছন থেকে পুরন দৃশ্য ফুটে ওঠে দীপার মানস-চোখে। গাড়ি থেমেছে। প্ল্যাটফর্মে ভিড়। জংশন স্টেশন।

সুনন্দা ডাকছে, খোকাবাবু।

কি বলছেন?

টিকিট কেটেছেন আমার?

না কাটলেও ভয় নেই—এই দেখুন। বলে সে অনেকগুলো শ'টাকার নোট দেখায়—যার একখানার সামান্য ভগ্নাংশও লাগবে না এ জার্নির মাশুলে। সুনন্দার চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

রান্নাঘরে দীপা তন্দ্রাচ্ছন্ন তবু সে যেন সব দেখতে পায়। বলে, বড় বড় কথা বললেই ও বয়সে সকল গূঢ় কথা বোঝার সময় নয়। এখনো ফিরে আয় সুনন্দা।

কিন্তু সুনন্দা ফেরে না। সে হেসে হেসে এগিয়ে চলে খোকাবাবুর সঙ্গে। একটি মাত্র টাকা দিয়ে গেট পেরিয়ে আসে।

একটা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিলেন। যদি আপনার মা সঙ্গে থাকতেন—

বার বার আর ও কথা বলবেন না। দেখলেনই তো নীতির জেলখানার পাচিল আমি কেমন টপকালাম! ভয় করলাম কোন কোম্পানীকে।

এসে একেবারে খানায় পড়লেন।

তবু তো মুক্তি পেলাম। খানা ভেঙে উঠতে পারব, কিন্তু মুক্ত না হলে যে পচে মরব—। উঃ আপনাদের সঙ্গে যদি দেখা না হত।

আর এক জনের সঙ্গে হতো, আর একজন।

এমনটি নাও হতে পারত। কত মেয়ের সঙ্গেই তো আলাপ হল আজ পর্যন্ত কলেজে বাড়িতে এখানে-ওখানে। কিন্তু তোমার মত তো কারুর সঙ্গে এত প্রাণ খুলে মিশিনি। এত শ্রদ্ধাও কেউ আদায় করে নিতে পারেনি এই সামান্য কটি মাত্র দিনের আলাপে। কেন পারে নি তা বলা কঠিন, বোধ হয় একেই বলে ভবিতব্য। তুমি তোলা 'ছলে শুধু আমার জন্য, আমাকে মুক্তি দেবে বলে, কি বলো ?

খোকাবাবুর শ্রদ্ধা, বিনয় ও আন্তরিকতায় সুনন্দা এত অভিভূত হয়ে যায় যে সে কেবল মাত্র দুটি কথাই বলে, হবে হয়তো।

একখানা প্রাইভেট ট্যাক্সি ডেকে দুজনে উঠে পড়ে। কলেজ অল্প দূরে। এ না হলেও চলত। একটা আপত্তি সুনন্দার মনে মাথা চাড়া দিয়েই উঠেই মিলিয়ে যায়। সে গুছিয়ে বসে। ভাল লাগে কিন্তু এই ছোট্ট গৌরবের গন্তব্যটুকু। কেমন হেলেদুলে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি। নরম শৌখিন আশপাশ। ভাল লাগছে আজকের খোয়ার ধাক্কাগুলোও।

কি যে বিশ্রী রাস্তাটা। টাল সামলান দায়। খোকাবাবু বলে, মিউনিসিপ্যালিটি এমনি কেয়ারলেস্। বাবা একজন কমিশনার, কিন্তু এদিকে একটু নজর নেই।

এবার সুনন্দা খোকাবাবুর গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে। চুপি চুপি বলে, বড্ড কেয়ারলেস্ ড্রাইভারটা। এবার আপনার পালা—কমিশনার হলে ওদের লাইসেন্স বাতিল করে দেবেন। বুঝেসুঝে কেন চালাবে না।

একের দোষে অপরের সাজা। এতো কখনো শুনিনি। তাছাড়া কমিশনারদের সে ক্ষমতাও নেই। ক্ষমতা খাস সরকারের হাতে।

সরকার আবার বলবেন, সব ক্ষমতাই জনসাধারণের হাতে। আমরা তো সাক্ষীগোপাল। তার চেয়ে আসুন টালসামলেই বসা যাক। সুনন্দা হাসে। কী বলেন প্রস্তাবটা কি মন্দ।

না মোটেই নয়।

মোটর এসে কলেজ প্রাঙ্গণে দাঁড়ায়। লম্বাচওড়া বারান্দাগুলো সব ফাঁকা। একটি ছাত্রও নেই কোনোখানে। গোলমাল শোনা যাচ্ছে না ক্লাসে।

সুনন্দা জিজ্ঞসা করে ব্যাপার কি ?

দারোয়ান এসে বলে, সিক্রিটারী সাব মারা গেছেন, তাই ছুটি আছে। কাল খুলবে।

অত্যন্ত স্যাড নিউজ সুনন্দা। উনি বাবার বন্ধু ছিলেন। বড্ড কাইণ্ডহার্টেড ম্যান।

হ্যাঁ, এ কলেজে এককালীন দান ওঁরই বড়। অমরা যতদূর জানি।

না, এখন বোধহয় বাবার। তবু ওঁকে স্বীকার করতেই হবে। সবাইকে উনি বড় ভালবাসতেন। ওঁকেও সবাই শ্রদ্ধা করত। কলেজ কমিটি অপজিশন গ্রুপও শেষ পর্যন্ত ওঁর কথা ঠেলতে পারত না। যাক এখন ট্রেনের দেরী আছে। এক রেস্তোরাঁয় চলো ড্রাইভার।

সব ভাল রেস্তোরাঁগুলো মেলায় উঠে গেছে। মেলা দেখতে যাবেন—অষ্টমীর মেলা। নদীর পারে ধর্মের নামে একেবারে টাকার খেলা, যাবেন দেখতে?

বর্ষায় সর্বগ্রাসী নদীর কথা মনে পড়ে সুনন্দার। সে চোখ বোঁজে। মুখ দিয়ে তার অনিচ্ছার অস্ফুট একটি প্রতিবাদ শব্দ বেরিয়ে আসে—না।

খোকাবাবু অমনি জিজ্ঞাসা করে, কেন?

সুনন্দা নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দেয়, না—কিছু নয়। চলুন যাব।

খোকাবাবু আহ্লাদে মোটরের দরজা খুলে ধরে। এই তো চাই।

দীপা মন মরা হয়ে থাকে। যেন ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছে ওরা। সে চোখমুখ ডলে উঠে পড়ে। সত্যিই সে ঠোক্কর খেয়েছে কাঠের বেড়ায়। তার তন্দ্রা কেটে যায়।

চল্লিশ

লণ্ঠনের আলো বাড়িয়ে দিয়ে দীপা দেখে যে সুশীল এসেছে। সে ধীর হাতে তার কাজকর্ম শেষ করছে। দীপাদির প্রশ্নর ভয়ে সে আগেভাগেই বলে, বাবু এসেছেন, খেতে চাইছেন—ডাকব?

ডাকো। কিন্তু তোমরা দুটিতে কোথায় গিয়েছিলে যে এত রাত হল?

কি কথায় আবার কি দোষ দাঁড়ায় সুশীল বলে, বাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি ডেকে দিচ্ছি। কোন রকমে হাত ধুয়ে সে চম্পট দেয়।

আর জিজ্ঞাসা করে কি হবে! প্রশ্ন, নিষেধ, অনুরোধ যুক্তি কিছুতেই কিছু হয় না মানুষের, যদি ঠেকে না শেখে, ধাক্কা না খেয়ে শেখে। অভিজ্ঞতার চেয়ে সার্থক পাঠ বোধহয় জগতে কিছু নেই। কিন্তু জীবনে কি তার শেষ আছে?

আসব ?

আসুন।

অমিয় বলে কতক্ষণ বসে রয়েছি।

আমি যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিছুই টের পাইনি।

সুশীল আশ্চর্য হয়। সব জানার মতই তো দীপাদি পোজ দেখালেন — এখন আবার বলছে কি ? উঁচু-তলার এ রঙ্গরস ওর সহ্য হয় না। ও জোরে জোরে প্লেট ঘষে। যতসব —

দীপা তিনখানা থালায় ভাত বেড়ে নেয়। বাটিতে বাটিতে ডাল তরকারি। একপ্রস্থ সুশীলকে দিয়ে, বাকি প্রস্থ টেবিলে তোলে। অনেক ভেবেচিন্তে আজ ভাত রেঁধেছি। সবাই পরিশ্রান্ত ভাল খেয়েছে !

শুধু রুটি তরকারি হলেও কেউ আপত্তি করত না। হাঁটাহাঁটি খাটাখাটুনির এই মজা। আসুন আরম্ভ করুন।

আপনি একটু এগিয়ে নিন, তারপর আমি বসব।

কারণ কি !

ভাতে কম পড়তে পারে, আপনিও তো পরিশ্রম করে এসেছেন।

সে ভয় নেই, আমি পেট ভরে টোস্ট-মামলেট উড়িয়ে এসেছি।

তাই নাকি ? দীপা খুশি না হলেও খুশির ভান করে। বেশ করেছেন। ঘর জ্বালান পর ভোলান আপনাদের আদিকালের স্বভাবটা ঠিক বজায় রেখেছেন দেখছি। এ জানলে আমি নিশ্চিন্ত মনে কখন খেয়ে শুয়ে পড়তে পারতাম, কেবল সুশীলের জন্য আমার ভাবতে হত না। ও সক্ষম ছেলে।

তেমন অক্ষুধাও আমার নেই। অমিয় হাসে।

দীপা অন্তরে অন্তরে চটে যায়। এরা বাইরেও হাসে, ঘরে এসেও হাসে। ইচ্ছামত রূপ বদলায় বহুরূপীর জাত।

এ ফুলগুলো কে এনেছে দীপা দেবী, গন্ধটি তো চমৎকার।

কই দেখি, বিনয়বাবু এনেছেন পাহাড় থেকে। দীপা অমিয়র হাত থেকে ফুলের গুচ্ছটা চেয়ে নেয়। তখনি খোঁপায় পড়ে। দেখুন তো কেমন মানিয়েছে ?

বিনয়কে ডেকে দেখান — রাসকেলটা বোধহয় ঘুমচ্ছে। ডাকব ?

ঘুমাক—ডেকে কাজ নেই। খোঁপায় পরেছি, যে কেউ একজন দেখলেই হয়। আমার কাছে সকলের চোখই সমান।

সুশীল, দেখ তো কেমন মানিয়েছে দীপাদিকে ?

খুব সুন্দর। সুশীল সভয়ে বলে পরীর মত ঠিক।

দীপাকে ডাউন দিয়েও কেন যেন অন্তর্দাহে অস্থির হয় অমিয়। সে ভাল

করে খেতে পারে না। ও যদি ও যদি পাহাড়ে যেত, হয়ত এর চেয়েও সুন্দর সুগন্ধি একগুচ্ছ ফুল পেত। সারাদিন বাংলোতে কাটিয়ে কি লাভ হল? বিনয়টা যেন টিকুসে মেরে দিল।

দীপা বার বার চেয়ে দেখে অমিয়র মুখের দিকে।

কিন্তু সেদিন সুনন্দা কোনো দিকে দৃকপাত করে না। গা ঢেলে দেয় উৎসাহের বন্যায়। লোকে লোকারণ্য, ট্যাক্সি চলে না। ওরা ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মেলার দিকে হেঁটে এগিয়ে যায়।

ওটা কিসের তাঁবু ওই যে বড়টা?

বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান সার্কাস দেখলে একেবারে থ মেরে যাবে। আমি অনেক দেখেছি পনরটা হাতি, একশ ঘোড়া, চল্লিশটা বাঘ, ভাল্লুক এবং আরো নানা রকম জানোয়ার আছে। দলে দলে শিম্পাঞ্জী বার হয় শো আরম্ভ হলে।

আমি কখনও দেখিনি এ সার্কাস, আচ্ছা সিংহ আছে?

নিশ্চয়ই ঐ যে—তোমার বাঁয়ে।

ওরে বাবারে। দূর আপনি যে কেমন মানুষ। পথের লোক হেসে ওঠে। আমি আর যাব না! খোকাবাবু, সুনন্দা একটু মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়। বাঁকা ভঙ্গিটি চলন্ত মানুষগুলো চোখ পাকিয়ে দেখে।

কুমির, কুমির।

এবার সুনন্দা লাফিয়ে উঠে খোকাবাবুর গায়ে হেসে ভেঙে পড়ে। বড্ড দুষ্ট তুমি। খেলনাওয়ালা দাঁড়াও। চমৎকার তৈরি করেছ তো। ছুটকির জন্যে একটা কিনব। বড়টা কত?

চার আনা—সব চার আনা।

সুনন্দা ভ্যানিটি ব্যাগে হাত দেয়।

খোকাবাবু হাত চেপে ধরে। ও কি আমি দিচ্ছি।

না, না আমি দেব।

না—না—আমি দেব হে।

দু'জনের কলহে পড়ে খেলনাওয়ালা হাবুডুবু খায়। তার মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। সে সুকৌশলে খোকাবাবুর পকেটে হাত পুরে দেয়। হঠাৎ সুনন্দার নজর পড়ে যায়। সে চীৎকার করে ওঠে।

আবার কুমির নাকি?

না গো মশাই পকেটমার।

আর যায় কোথায়। মেলার চাটি। খেলনাওয়ালা কোথায় যেন নিমেষে মিলিয়ে যায়। তার কুমির, টিয়া, কাকাতুয়া, গিরগিটি অদৃশ্য হয় হাতে হাতে।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সুনন্দা ও খোকাবাবু।

এই নোটগুলো রাখতো সুনন্দা।

কোথায়? ভ্যানিটি ব্যাগে? আমি তা পারব না। সে একটু সরে দাঁড়ায়। আচ্ছা দিন রেখে দিচ্ছি। সে হাত বাড়িয়ে নোটগুলো নিয়ে ব্লাউজের ভিতর কোথায় যেন অদৃশ্য করে রেখে দেয়। আপনি যে ন্যাধারুজ মানুষ। অতগুলো নোট এনেছিলেন কেন?

কিছু টাকা বাবা এখানের এক গদিতে জমা দিতে বলেছেন। বাকীটা তো আমার হাত খরচ।

আগে জমা দিলেই পারতেন?

পরে দিলেও চলবে, না দিলেও হবে—ভারি তো হাজার দুয়েক টাকা। যদি খরচ করি বাবা কি আমার ফাঁসি দেবেন? একবার তো পাঁচশ টাকা হারিয়ে গেল। বাবা বললেন, থাক, যেতে যেতে শিখবে।

মা কিছু বললেন না।

কি আর বলবেন! নবালকের হাতে দেওয়ায় আরো দু'কথা বাবাকে শুনিয়ে দিলেন। একটা আইসক্রীম খাবে? এই দিকে এসো, শুনছ?

আমি নাবালক নই, তুমি খাও খোকাবাবু।

তুমিও যে কত সাবালিকা তার প্রমাণ জেলার অনেকে পেয়েছে।

দু'জনে হেসে ওঠে।

দুটো বড় আইসক্রীম বিক্রি হয়ে যায়।

বিরাট পরিধি নিয়ে মেলা। কত দেশের যে কত রকম মানুষ এসেছে। হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, নেপালী; সাঁওতাল, বাঙালী বিভিন্ন জাতীর মানুষ বিভিন্ন সজ্জা। তাদের বর্ণ জৌলুসাদি রকম সকম। যারা যত আদিম, তারা তত জাঁকজমকের অনুরাগী। একেবারে হাল্কা ধরনের আধুনিকারও অভাব নেই। একজাতের মধ্যেই এমনি আছে দু'রুচির মানুষ। কৃষ্টি তাদের ভিন্ন তাই হয়েছে মনুমেন্ট—ময়দান ব্যবধান। কিন্তু ঐক্য রয়েছে অদ্ভুত। সকলেই লাভ ও আনন্দলোলুপ। তফাৎ কেউ বেচে কেউ কেনে। কেউ দেখায়; কেউবা দেখে। কেউ দেয়, কেউবা প্রাণ কেড়ে নেয়।

সুনন্দা তন্ময় হয়ে হাঁটে। এত দেখার স্বাদ যে তার কোথায় যে লুকিয়ে ছিল। খোকাবাবু হঠাৎ যেন ঘোমটা খসিয়ে দিলে। দিয়েছে ভালই করেছে সে তার দেহ মন দিয়ে পান করে নেবে এই মেলার আনন্দসমুদ্র। আহা ঐ পাহাড়ী মেয়েটি কাকে খুঁজছে? ঐ সাঁওতাল কিশোর কেন এ ভিড়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। মেয়েটি চঞ্চল চোখে এবং কিশোরের বাঁশির সুরে কোথায় যেন

একটা মিঠে মিল আছে। ভাবতে ভাবতে সুনন্দার আইসক্রীম জল হয়ে যায়।

ওরা এগিয়ে আসে উটের সমারোহের দিকে। এখানে মানুষ পাগল হয়ে তাকিয়ে আছে। কী দেখছ?

সুনন্দা তার মনের শৈশবের ভূগোলখানা ওলটায়। দেখে আরবীয় মরুমালভূমি। উটের তাঞ্জামে যাত্রী চলেছে বাদশাহারামে। সঙ্গে অগণিত ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী। তাদের বেশভূষা নাটকীয়। কিন্তু অভাবনীয় অসমতল প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে। ক্রীতদাসী উজ্জ্বল যদি বর্ণে স্বাভাবিক হিম্মতে—প্রভুপত্নী উজ্জ্বল হীরকে, ধর্মমূল্য প্রসাধনে। ঝড় আসে লক্ষ লক্ষ দস্যুর মত। যা অহরহ চলে ক্রীতদাসদাসীর ওপর। উটের মিছিল মিলিয়ে যায়। কিন্তু আজো সেই উট বেঁচে আছে। সুনন্দা ভাবে তাই কি এত ভীড়, তাই কি এত জিজ্ঞাসু চোখ? কোথায় সে দাসের যুগ।

ওরা এগিয়ে আসে গোহাটার দিকে।

চিত্রবিচিত্র নানা দেশি গরু—পরদেশি, ভিনদেশি আবার একেবারে কুটুম গাঁর একজোড়া। কবে তোমাদের জন্ম অল্প বয়সী সুনন্দা জানে না। তোমাদের এত রকমারি রূপে সজ্জিত সে কখনও দেখেনি। এই পর্যন্তই সে জানে, রেল হয়েছে, মোটর হয়েছে, হয়েছে নভোচারী ভারবাহী জাহাজ তবু তুমি সনাতন হয়ে রয়েছ দরিদ্রের ঘরে মমতায়। তাই তো আজোও মনে মনে প্রণাম জানায় সুনন্দা। এর বেশি সে তলিয়ে ভাবে না। তবে তার মনটা টাটিয়ে ওঠে, পিঁজরাপোলের কথা ভেবে—এত খেটেও করুণা ভিন্ন কিছু গতি হল না।

সুনন্দা বলে, আর একটা আইসক্রীম প্লিজ—শুনেছ খোকাবাবু?

বেশ তো তুমি বলতে শিখেছ! লোক চেন না, মর্যাদা বোঝনা—এবার নির্ঘাত বাংলা ব্যাকরণে রসগোল্লা পাবে।

যিনি পথ দেখিয়েছেন তিনি?

আবার আপনি? তাহলে আইসক্রীম পাবে না।

তুমি তুমি তুমি—এখন পাব তো?

শুধু আইসক্রীম নয়—সার্কাস দেখাব। রাজী?

সুনন্দা খোকাবাবুর হাতখানা টেনে নিয়ে একটু চাপ দেয়। এর পর আর কি থাকে?

অনেক।

সুনন্দা একটু দমে যায়—কিন্তু পর মুহূর্তে হেসে ফেলে ফিক করে একটা আইক্রীম পেয়ে।

নাগরদোলায় চড়বে ?

ওমা যদি পড়ে যাই। তার চেয়ে বরং সার্কাস চলো।

সে তো বেলা তিনটেয়। এখন তার কি ?

শুনেছি নাকি মাথা ঘুরায় ও আমি সইতে পারব না। একবার উঠতে গা বমি বমি করেছিল।

এবার যদি মর নদীতে ফেলে দিয়ে যাব—গা বমির ঝামেলা পোহাতে হবে না।

সুনন্দা একেবারে লজ্জা পাবে কেন ? নাগরদোলায় না উঠে, ঘোড়া, পাখি, হাতির চড়ক দোলে উঠতে চায় ওটা থেকে, এইটে ভাল—স্পীড বেশী এবং ন্যাচারাল। ওটা একেবারে মান্ধাতার আমলের পুরান। আমি ঘোড়ায় চড়লাম।

আমি পাখির পিঠে।

দেখবে আমিই আমিই আগে পৌছাব।

কি করে ?

পায়োনিয়র বলে। তোমার চেয়ে আগে চড়েছি বলে।

কথার শ্লেষটা ধরতে না পেরে খোকাবাবু বিশ্লেষণ দাবী করে। বুঝতে পারলাম না সুনন্দা। একটু বুঝিয়ে বলো।

আমার এক সহপাঠী ছিল কবি—

পুরুষ না মেয়ে ?

ফিমেল—কিন্তু কবিতাগুলো তার ম্যাসকুলিন। আমার খুব ভাল লাগত। আমার কেন অনেকের। শুনলে আপনিও তারিফ করতেন আপনি নও, তুমি—এক্সকিউজ মি।

কোনো কাগজে কি ছাপা হত ? বোধ হয় পড়েছি।

এইরে সর্বনাশ করেছে। মেয়েলোকের নাম শুনেছে কি অমনি—

খোকাবাবু লজ্জিত হয়ে বলে, না সুনন্দা তা ঠিক নয়—

সুনন্দা বঙ্কিম কটাক্ষে চেয়ে বলে, তাহলে নিশ্চিন্ত হলাম। ওর কবিতা কখনো ছাপা হয়নি, অনেক কাগজে পাঠিয়ে হয়রান হয়েছে। কেউ বা ধন্যবাদের সঙ্গে ফেরত পাঠিয়েছে, কেউ বা দেয় নি।

এ হতে পারে না। তুমি মিথ্যা বলছ। স্ত্রীলোকের কবিতা কিছুতেই ফেরৎ হতে পারে না।

হয়েছে, আমি সাক্ষী। তবে এমন সর্ব সুলক্ষণা কন্যার কেন যে বর জুটত না তা আজ ভেবে স্থির করেছি। কবিতাগুলো ছিল ম্যাসকুলিন।

ঠিক ধরেছ তুমি। পছন্দ হত না।

সে কি বলত জানো? হেমচন্দ্র পায়োনিওর বলে আজো বাংলা সাহিত্যে বেঁচে আছে কবি হয়ে।

সত্যি হেমচন্দ্র কি পায়োনিয়র?

বলো তার আর কি গুণ আছে? ওর তুলনায় তো বটেই। যেমন তোমার তুলনায় আমি মুখর কিন্তু এক বৃত্তেই দুজনে। অথচ আমি থাকব আগে।

সম্মুখ চাকাটা পাকে ঘুরতে থাকে। যে যার অবলম্বন জড়িয়ে ধরে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে যেন এই মেলাটাও পাক খাচ্ছে।

একটা ঘূর্ণায়মান চাকার দিকে অনেকক্ষণ দীপা যেন চেয়ে থাকতে পারে না। তার মাথাটা যেন গুলিয়ে ওঠে সে মেলার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে রান্নাঘরের টেবিলে চোখ রাখে।

নিশ্চই রান্না খারাপ হয়েছে, নইলে অগ্নিমান্দ্য।

অমিয় বলে, না—একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ এ রাগ কেন?

বড্ড সংক্রামক—আপনার জন্য আমি বেচারী মারা গেলাম। দেখছি আপনার সংসর্গে আমার সর্বনাশ হয়েছে—শক্ত হাতে রোগ ধরেছে।

আমি তো কিছু ভাবছিনে। দীপা সপ্রতিভ হয়ে বলে, আমি তো দিব্যি খাচ্ছি। সে চোখের তারা দুটি নাচিয়ে একটু হাসে। মাথাটি আপনা থেকেই হেলে দোলে। ফুলের গুচ্ছটাও সেই সঙ্গে নাচে।

অমিয় শান্ত চোখে তাকাতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে যায়।

দীপা বলে, হ্যাঁ একটু ভাবছিলাম—বিনয়বাবুর এসব আবার কি, অরসিককে রস নিবেদন। আমি তেমন ফুল ভালবাসিনে একটু বাদেই শুকিয়ে যায়—ও প্রিজার্ভ করা এক জ্বালা। কোথায় ফুলদানি, কোথায় জল। তার চেয়ে বরঞ্চ খোপায় পরে অল্পেতেই নিষ্কৃতি পেয়েছি—কি বলেন? গাছের ফুল গাছে থাকাই কি মঙ্গল নয়?

অমিয় ভাবে, এঁকে কবিতার ভনিতা করে বোঝান বৃথা। কিন্তু ওর এই একান্ত রিয়ালিস্টিক অ্যাপ্রোচ মিথ্যা। দীপা একটা হেঁয়ালি। দীপা একটা রক্ত মাংসের গোলক ধাঁধা। ওঁর এই বুদ্ধিদীপ্ত মনের ভিতর ঘুরে ঘুরেও মরা বুঝি ভাল। বিনয়টা বুঝি অনেকখানি এগিয়েছে।

একচল্লিশ

দীপা শুয়ে শুয়ে ভাবে, আলোটা নিভিয়ে দিলেই বোধ হয় ঘুম পাবে। দিনের সে চোখ বোজে নি। রাতও এখন কম হয় নি। সে হ্যারিকেনটার কল টিপে দিয়ে চুপ করে থাকে। কিন্তু চোখ বোঁজা যায় না। খোলা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ে মুখে-চোখে। পাওয়া যায় গোলাপ ফুলের সুবাস। সে উসখুস করে। উঠে বসে বিছানার ওপর। কতদিন সে চাঁদের দিকে ভাল করে তাকায়নি—সে প্রায় এক যুগ। কতকাল যেন নৈশ প্রকৃতিকে সে দেখেনি। ইট কাঠ পাথরের সঙ্গে লড়াই করে মনের মর্ম কোষে শক্ত কড়া হয়ে গেছে। আজ যেন মনে হচ্ছে বিশ্বে আরো একটা রূপ আছে, আরো কিছু দেখার মতো রয়ে গেছে, কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছে অবহেলায়। ইতিহাস, ভূগোল, গণিতে যেন তাকে গিলে ফেলেছে।

সে উঠে এসে জানালায় দাঁড়ায়। সুমুখে মুক্ত প্রকৃতি, শাল পিয়ালের ছন্দ—তারপর দিগন্ত রেখার উঁচুনিচু গিরিশ্রেণী। স্পষ্ট নয়, ঘননীল বিলীয়মান—তবু আজ বড় ভাল লাগে দীপার কাছে। সে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে বাইরের দিকে।

তার মনে হয় সুমুখের বাংলোর বারান্দায় কে যেন ওরই মতো বিনিদ্র পায়চারি করছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। শব্দ শোনা যাচ্ছে না ঠিক, তবু তাই যেন মনে হচ্ছে। মনে করতে বুঝি ভাল লাগছে দীপার।

একজন নয় হয়তো দুজনই পূর্ণ প্রতিযোগিতায় পরিক্রমা করছে।

এর মধ্যে কাকে সে চায়? কার ওপর টান পড়েছে বেশি? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে দীপা দাঁড়িয়ে থাকে উত্তরের প্রতীক্ষায়।

প্রায় একটানাই সে অনিচ্ছায় ভাঁটিয়ে চলেছিল, কোথা থেকে বিনয় এসে যেন জঞ্জাল বাধা। এ উপল পাথরের বাধা নয়—অনুরাগের, সুগন্ধের। অমিয়র আকুতি যেন আরো প্রবল। তাই তো দীপা একটানা এক দিকে চলেছিল ভেসে।

দীপা হেসে ফেলে একা একা। না, না কারুর জন্য তার টান নেই। টালমাটাল হয়ে গেলেই তাকে পড়ে যাওয়া বলে না—বলে না স্খলন। ভেসে গেলেই মরা হয় না—এ হতে পারে ওস্তাদ সাঁতারুর এক খেলা।

এ দীপার খেলাও নয়—কিছুই নয়। এ নিতান্তই ট্রামে বাসে যেন মাশুল এবং টিকিট দেওয়া।নেওয়া আদানপ্রদান হয়ে গেলে আর কোন দাগ

থাকে না। কি অমিয় কি বিনয়- দীপা কারুকে চায় না। তার চাওয়া না চাওয়া ঘুচে গেছে অনেকদিন। বিগত কথা আর সে স্মরণ করতে চায় না।

সে মুক্ত বাতাসে দাঁড়িয়ে থাকে। ছড়ানো মনটাকে ছড়িয়ে নিতে চায়। কিন্তু তা আবার ছড়িয়ে পড়ে শিশুর হাতে খেলনার মতো।

দূরে একখানা আবছা ক্লান্ত গরুর গাড়ি দেখা যায়। এমনি নৈশ পরিবেশে গড়িয়ে চলেছে। সুনন্দা ও খোকাবাবু যাত্রী। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে পথ নয়—বালিয়াড়ির ধ্বংসের ভিতর দিয়ে গোযান যেন লজ্জানে ঠেলে চলেছে। চাকা ঘুরতে চায় না, গরু চায় না হাঁটতে। যা কিছু হাঁটছে টাকার জোরে খোকাবাবুর সম্মানে।

সার্কাস ভেঙেছে। স্টেশনের দিকে ওরা ভয়ে ভয়ে চলেছে। তিনটার শোতে যদি ওরা টিকিট কেটে ঢুকত তবে আর এ ফ্যাসাদে পড়তে হত না। ওরা মেলা দেখায় মশগুল ছিল, কখন যে তিনটে বেজে গেছে খেয়াল নেই। ছটার শোতেও টিকিট পাওয়া যেত না চড়া দামে না কিনলে।

কি চমৎকার ভিতরটা খোকাবাবু, কি গরজাস, এ যে কত বড় ব্যাপার তা আমি কল্পনাই করতে পারি না। এ সব ম্যানেজ করে কে? এত লোক এত রকমারি জন্তু-জানোয়ার।

সকলের উপরে একজন ম্যানেজার আছে···সে সত্যি এ নামের উপযুক্ত। শুধু বাংলা দেশ নয়, কেবল ভারতবর্ষ নয়···এরা বর্মা ইন্দোনেশিয়া জাপান চায়না পর্যন্ত এই বিপুল লটবহর নিয়ে যায়। সে এক অবাক কাণ্ড।

এই হাতি ঘোড়া তাঁবু সব?

হ্যাঁ···প্যাকেটের পর প্যাকেট বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল। লোহার রোলারটাও সঙ্গে যায়।

তাঁবুটার দিকে চেয়ে সাজসরঞ্জাম দেখে একটু চুপ করে থাকে সুনন্দা। এত বড় বিস্ময়ের বিষয় আর বুঝি কিছু নেই। সুনন্দা কান পেতে ড্রামের বাজনা শোনে। নির্বাক হয়ে সার্কাসের খেলাগুলি দেখে। এরা কি রক্ত মাংসের মানুষ? সে মানুষ কি এত দুঃসাহসিক হতে পারে? বাজনার মৃদু তালে তালে যেন আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়ে একটি মেয়ে। পড়েই সে হাসে। সহস্র সহস্র দর্শকের সঙ্গে সুনন্দাও করতালি দেয়। মেয়েটি অভিবাদন জানিয়ে চলে যায়।

এরপর নানা খেলা চলে, মল্লবীরদের অদ্ভুত শক্তির পরীক্ষা। শিকল ছেঁড়ে, বুকের উপর পাথর ভাঙে, লোহার রোলার তোলে, হেঁটে যায় জোয়ান হাতি সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে।

তারপর আসে জন্তু-জানোয়ারের খেলা। তাদের প্রত্যাশ্চর্য বুদ্ধির পরিচয় কেউ বা সাইকেল চালায়, কেউ বা সাহেব সেজে পাইপ টানে, কেউবা ড্রাম বাজায় তালে তালে।

খোকাবাবু বলে, এবার দেখবে বাঘসিংহের খেলা ··খেলাচ্ছেন এক কুমারি মহিলা। মনে হবে মানুষের মন নিয়ে খেলা করছেন অনায়াসে হাসিমুখে।

তোমরা কি বাঘ সিংহ নাকি? অমনি হিংস্র নাকি তোমাদের মন? তা হলে তো বড্ড ভাবনার কথা—এক সঙ্গে আসা উচিত হয় নি।

তা নয়, তা নয় সুনন্দা। তোমরা তো আমাদের মন নিয়ে খেলা কর, তাই বলছি।

বরঞ্চ তোমরাই সুবিধা পেলে ট্রেসপাস্ করো, যখন তখন ঢুকে পড়ো জোর করে কোনো বাধা নিষেধ মানো না।

তবু আমরা হিংস্র নয়, পশু নয় সুনন্দা।

অল্পবয়সী খোকাবাবুর মুখে এর চেয়ে বেশি যুক্তি যোগায় না। সে শুধু লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

দীপা আজ বহু দূরের চন্দ্রালোকিত বাতায়নে দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকতে পারে না। সে বলে, তোমাদের দুজনার কথাই সত্য। কিন্তু ও দুটোর বিগলিত অর্থ আনন্দে পৌছান। তা যে না পারবে সে শুধু পাকই ঘাঁটবে।

খোকাবাবু ও সুনন্দা তা শুনতে পায় না। তারা বিহ্বল হয়ে দেখেছে পশুর খেলা। কথামতো, ইসারা মতো কাজ করে যাচ্ছে বটে বুনো জীব, কিন্তু মন যেন তাদের আফ্রিকায়। নেশায়, চাবুকে তাদের বিবশ করে রেখেছে কিন্তু মন যেন বাধা পড়ে নি। তারা ঠিক যেন পুতুল নাচের খেলনা। দেখতে দেখতে সুনন্দা তলিয়ে দেখে কেমন যেন প্রচণ্ড গ্লানি নিয়ে দেখা শেষ করে। হাততালি দেয় সকলে কিন্তু শব্দ হয় না।

কেমন লাগল? তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে খোকাবাবু জিজ্ঞাসা করে, নিশ্চয় খুব ভাল লেগেছে। অস্ট্রেলিয়ন সার্কাস।

মন্দ নয়, এখন একটা ট্যাকসি দেখো কত রাত হয়েছে। বাড়ি গেলে কী বলবে কে জানে। আমার বাবার চেয়েও তোমার মার কথা ভাবছি। যে রাশভারি মানুষ।

আমরা তো কোন অন্যায় করিনি—একটু যা রাত হয়েছে। ট্রেনে উঠলে আর কতক্ষণ, এই ট্যাকসি—দূর ভাড়া হয়ে গেল। একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো। ঐ যে আর একখানা গাড়ি।

সুনন্দা ত্রস্তেব্যস্তে খোকাবাবুকে ছাড়িয়ে যায়। তবু ট্যাকসিখানা পাওয়া

যায় না। অগ্রগামী—ভিড়ে গাড়ি দেখা মাত্র ভাড়া করে ফেলেছে। আর নিকটে ট্যাকশি নেই। রিকশা একখানা পাওয়া গেলেও মন্দ হত না। একটা ছ্যাকরা গাড়িতেও আপত্তি নেই। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

সুনন্দা জিজ্ঞাসা করে কটা বাজে?

সাড়ে নটা—না, নটা পঁয়ত্রিশ। পঞ্চান্নতে ট্রেন, কুড়ি মিনিট বাকি।

মাত্র? তাড়াতাড়ি চলো—প্রায় এক মাইল পথ যেতে হবে।

কিন্তু এগোব কী করে, যে ভিড়। দেখছ না, কেবল মানুষের মাথা। ধাকাধাক্কি করে কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে এসে দেখা যাক পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় কিনা।

সুনন্দার কাছে মেলার কলরব, এত আলো যেন কিছুই চোখে পড়ে না। এতক্ষণের সমস্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা যেন মাটি হয়ে গেছে। সে মাঝে মাঝে দেখছে আফ্রিকার ঘন অরণ্য। প্রকৃতির কোলে লালিত দুর্বার প্রাণী আজ বিমর্ষ—সার্কাসের খাঁচায় আবদ্ধ। দেশ আবাস অরণ্যভূমির স্বাধীনতাচ্যুত, সকলের কাছে ভাল লাগলেও ওর কাছে তেমন ভাল লাগে নি, সমস্ত উত্তেজনার অন্তরালে রয়েছে যেন একটা নিষ্ঠুরতার বীজ বোনা।

একটা সাইকেল রিকশা—উঠে পড়ে সুনন্দা, ট্যাকশির জন্য আর দেরী করা উচিত নয়।

কটা বাজে এখন?

নটা চল্লিশ।

আর মাত্র পনর মিনিট বাকী, ট্রেন ধরিয়ে দিতে হবে রিকশাওয়ালা, বকশিস পাবে, জোর চালাও।

ভাববেন না, খুব পারব—নগদ এক টাকা চাই।

দেব। সুনন্দা বলে, আরো চার আনা পাবে। ভয় নেই চালাও। বেশ একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

—না, সে ভাল করে গায় আঁচলখানা জড়িয়ে নেয়।

দ্রুত এগিয়ে চলেছে রিকশাওয়ালা।

ভীষণ এক দুর্ঘটনা। নূতন বলদের গাড়ি। শিকরা দেখে ভড়কে গিয়ে রাস্তার পাশের খানায় পড়ে উলটে গেছে যাত্রীদের চীৎকার। তার মধ্যে একটি শিশু রয়েছে, ঐ যে কান্না শোনা যায়।

তাড়াতাড়ি সুনন্দা ও খোকাবাবু নেমে পড়ে, রিকশাওলার সঙ্গে ওরা ছুটে যায়, সুনন্দা শিশুটিকে কোলে তুলে নেয়। টেনে তোলে তার মাকে। পরিবারের কর্তাকে খুঁজে বার করতে হয় গাড়ির জোয়ালের ভিতর থেকে, সে

উলটে গিয়েও নিরাপদে আছে, তা বোঝা যায় তার কণ্ঠস্বর থেকে। খোকাকে নিয়ে এদিকে চলে এসো, ওদের কাণ্ডজ্ঞান নেই মোটে।

আমরা কী করে বুঝব যে নতুন গরু গাড়িতে জুড়েই মেলায় এসেছেন। আমরা কী ভগবান? রিকশাওয়ালার গলায় বিরক্তি ঠিকরে পড়ে।

জানি যে তুমি ভগবান শ্রীচৈতন্য নও—আস্ত একটি গবেট গাড়োয়ান, কিন্তু কী করে বুঝলে বলতো যে আমরা এসেছি? আমরা কাপ্তেনবাবু নই যে অমনি অমনি পয়সা ওড়াব মানুষের গায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি হাঁকাব।

ইঙ্গিতটা সুনন্দা ও খোকাবাবুর কান ভাল ঠেকে না। তবু সুনন্দা বলে, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, আপনি মনে কিছু ক'রবেন না, মাপ করুন, আপনার গাড়োয়ানকে ডাকুন।

গাড়োয়ান তো আমি নিজে, এ গাড়িখানা কার? সে ভয়ার্ত বলদ দুটোকে খুঁজে দৌড়াদৌড়ি ধরে নিয়ে আসে। মিনিট আটেকের বেশি কেটে যায় ওখানে।

অনেক তাড়াহুড়া করে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন পাওয়া যায় না। রিকশাওয়ালা ভয়ে ভয়ে বলে, আমার কী দোষ বলুন।

সুনন্দার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে যায়।

খোকাবাবু বলে, এখন কী করি বলতো। আর সকাল আটটায় গাড়ি। পৌছতে পৌছতে বেলা দশটা।

একখানা গরুর গাড়ি দেখ। তা হলে ভোর নাগাদ হয়ত পৌছে যাব। ক' মাইল?

আমি তা জানিনে, রাস্তাঘাটও চিনিনে, তার চেয়ে এসো আজকের রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাই, মেলায় আরো অনেক কিছু দেখার আছে, কি হবে কাল একেবারে ভর্তি হয়ে ফিরলে?

না না তা হয় না। তোমার আমার সম্পর্ক এমন কিছু নয় যে হৈহল্লোড় করে রাত কাটাব, এবং তা ক্ষমার চোখে দেখবেন তোমার মাবাবা, তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ তাই ও কথা বলছ, সুনন্দার মনে হয়, এই ধাক্কায় আবার তাদের সমগ্র পরিবারটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, উঃ কি ভুল হয়েছে ছেলেমানুষের সঙ্গে যেতে।

অতি কষ্টে একখানা গরুর গাড়ি পাওয়া যায়, পথঘাট স্থানে স্থানে এখনো বিচ্ছিন্ন তাই কেউ সহজে ভাড়া খাটতে রাজী হয় না।

ক ট্যাকা দিবা?

যা চাও সুনন্দা বলে, আমরা দর করব না। কেবল রাতারাতি পৌছে দিতে হবে।

দশ টাকা দিলে তা পারব।

দশ টাকাই দেব।

গাড়োয়ানটা হ্যাঁ করে থাকে সে বিশ্বাস করতে পারে না সুনন্দার কথা। দু টাকার জায়গায় সে দশ টাকা দাবি করেছে, আবার জিজ্ঞাসা করে কী বললে?

তুমি যা চাইছ তাই দেবো—দশ টাকা।

না আর একটা টাকা দিবা গরুর বিচালী বাবদ কি খেয়ে তেঁনারা হাঁটবে?

আচ্ছা তাও পাবে।

অন্য দুএকজন গাড়োয়ান চোখ বুঁজে চুপ করেছিল, তাদের চোখ ছ্যানাবড়া হয়ে যায় টাকার অঙ্ক শুনে।

ওরা দুজনে গাড়িতে উঠে পড়ে, বিছানার অভাব। পেয়ালের ওপর শুধু একটা মাদুর তবু খোকাবাবু কিছু বলে না।

কিছুদূর এগিয়ে সুনন্দা বলে, বুদ্ধির দোষে রাজপুত্রের তৃণশয্যা।

দীপা বাংলোর বাতায়নে দাঁড়িয়ে যেন সুনন্দার কথাই আজ শুনছে। কখন যেন খোঁপা থেকে খসে পড়েছে সুগন্ধি ফুলের গুচ্ছ।

বেয়াল্লিশ

শুতে গিয়ে অমিয় দেখে যে বিনয় অঘোরে ঘুমেচ্ছে। হ্যাঁ—একটা বিরাট কিছু সম্পাদন করে এসেছে। নইলে এত বড় নাকের গোঙানি। অমিয় মশারি ফেলে শুয়ে পড়ে। এখন পর্যন্ত কেউ জানে না—সে একটা ভয়ানক দুঃসাহসের কাজ করেছে। গোপনে দীপার একটা স্ন্যাপ নিয়েছে। তখন দীপা ছিল সেলাই নিয়ে ব্যস্ত। এখন একবার লোভ হয়েছে নেগেটিভটা দেখতে। সবই তো রয়েছে। একটু শুধু ধুয়ে দেখলে হয়। কিন্তু কাককে এ খবর অমিয় জানতে দেবে না বিশেষ করে বিনয়কে জানতে দেবে না রাত আর একটু বাড়ুক, তারপর অমিয় উঠবে।

অমিয় ওঠার পূর্বে, কি আশ্চর্য বিনয় ওঠে। সে দেশলাই জেলে ঘড়ি দেখে, খুটখাট শব্দ হয়। সে যেন কি গোছায় অন্ধকারে। হয়ত অভিসারে যাবেন শ্রীমান, তাই ধড়াচূড়া বদলাচ্ছেন শিখি পাখা, আর বাঁশিটি সবই তো চাই। নইলে শ্রীরাধার মানভঞ্জন হবে কী করে।

বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে অমিয়ও ওঠে। সে একটা চাদর নিয়ে নিজেকে মুড়ে নেয়। একবার দুজনে একত্র হলেই হুড়মুড়িয়ে পড়বে। নইলে একটু অপেক্ষা

করবে যতক্ষণ না প্যানপ্যানানি আরম্ভ হয়। আমি তোমায় বড় ভালবাসি। তোমায় ছেড়ে কী করে গলায় দড়ি দেব প্রিয়তম? অমিয় একবার দুহাতের মাংসপেশী ফুলিয়ে নেয়।

দু বাংলোর মাঝখানের পর্দা ঠেলে বিনয় গিয়ে আলো জ্বালায় বাথরুমের। এক কোণে আলোটা ভাল করে ঢাকে লাল কাগজ দিয়ে।

কী চালাক, ভেবেছে সকলে ঘুমিয়ে রয়েছে। ওদিক দিয়ে কে যেন ঢুকছেন, তাই দরজা খোলা।

আর কথোপকথনের জন্যে অপেক্ষা করা হয় না—অমিয় গিয়ে জড়িয়ে ধরে বিনয়কে। ব্রাদার ভেবেছ, আমি বুঝি মরে গেছি? অমিয় টান মেরে ফেলে দেয় লাল কাগজটা।

চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কোন অভিসারিকার অস্তিত্ব নেই।

সর্বনাশ করেছিলি যদি প্লেট খোলা থাকত। আর তোর এত সন্দেহ বাই।

তুই বা গোপনে এত রাত্রে এসেছিস কেন ওয়াশ করতে? আমাকে ডাকলে কী হত? আমি বাধা দিতাম? কোনোদিন দিয়েছি?

দাওনি, কিন্তু আজ তার অতিরিক্ত করলে বাছাধন।

অমিয় একটু লজ্জা পেয়ে বলে, নারে অমিয় একখানা প্রফাইল চুরি করে-ছিলাম দুপুরবেলা। ভেবেছিলাম কারুকে জানাব না। কিন্তু তোকে কি না জানিয়ে পারি।

বিনয় এ আন্তরিকতায় অভিভূত হয়। তবে নিয়ে আয় একসঙ্গে ওয়াস্ করি।

কিন্তু জ্যান্ত প্রফাইলে কখনো লোভ দিতে পারবিনে।

স্বীকার করলাম—এখন তবে নিয়ে আয়। হ্যাঁরে তুই ক্যামেরা পেলি কি করে? আমি তো নিয়ে গেলাম।

আমার সুটকেসে কোয়ার্টার সাইজ একটা ছিল। সেই সেবার কিনেছিলাম মন মল্লিকার আবদারে। তুই যেটা নিয়ে গিয়েছিলি সেটা তো পরে কিনলাম। সময়েতে দুটো ক্যামেরাই লাগে। আজ দেখ না—যদি সুটকেসে না থাকত।

বিনয় কী যেন ভাবে। কার মুখ যেন মনে পড়ে। তারপর জিজ্ঞাসা করে। তুলতে দিলে হুঁ, সেই মেয়েই? চুরি করে তুলতে হয়েছে।

কী করছিল?

সেলাই। এমন চমৎকার দেখাচ্ছিল যে আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

যা নিয়ে আয়। এই জন্যই বুঝি আজ খাস নি?

নারে।

অমিয় চলে যায়। বিনয়ও দক্ষতার সঙ্গে শট নিয়েছে, সেখানেও সেই নারীমূর্তি—কিন্তু তার মনে হচ্ছে যেন তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। কি যেন গড়মিল হয়ে গেছে ওদের মধ্যে। অমিয়ই সৌভাগ্যবান।

প্লেট নিয়ে আসে অমিয়।

বিনয়ের ইচ্ছা করে ওয়াশিংয়ের সময় নষ্ট করে দিতে—নেগেটিভ পুড়িয়ে দিতে অমিয়র সৌভাগ্য। বিনয়ের হাত কাঁপে। মুখ শুকিয়ে আসে। প্লেটখানা হাতে নিতেই তার বুক ধড়াস ধড়াস করে। সে আলোটা ঢাকে লালকাগজের ঢাকনি দিয়ে। মাত্রা চড়িয়ে মেশায় হাইপো জলের সঙ্গে। এখন যা হয় তা পরিমিত বৈজ্ঞানিক লোশন নয় আগুন। ঢেউয়ে ঢেউয়ে অশরীরী মূর্তির ক্রম মাধুর্য ফুটে উঠবে না—যাবে খাক হয়ে জ্বলে। বিনয় একবার অমিয়র মুখের দিকে তাকায়। কত ঔৎসুক্য ওর চোখে। স্বল্প আলোকেও চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।

কী দেখছিস হাঁ করে? ওয়াশ কর বিনয়।

বড্ড টায়ার্ড—আমার হাত কাঁপছে। তুই ওয়াশ কর। আমি গিয়ে একটু শুয়ে পড়ি। বিনয় বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার আগে বলে যায়, হাইপো বদলে নিস। মাত্রা বেশি হয়ে গেছে। কাল সব দেখব ধীরে সুস্থে।

কিন্তু জানলা থেকে দীপা নড়ে না। মন্থরগতি গরুর গাড়ি এখন যেন তার সুমুখ দিয়ে সরেনি। চলেছে নির্জন পথ ধরে। পিছনে ফেলে এসেছে নদীর বালিয়াড়ি। বাথরুমে যা ঘটে দীপা তা জানে না। সে দেখেছে অস্তমুখ চাঁদের রক্তাভা—যেন আগুন লেগেছে বনে প্রান্তরে। একটা ঠাণ্ডা অসহ্য আগুন। চড়া হাইপোর লোশন নয়, তবু যেন পুড়ে শেষ হয়ে যেতে বসেছে দীপার চোখের সুমুখের জীবন্ত নেগেটিভখানা।

বড্ড শীত করছে খোকাবাবু।

কেন?

জানিনে। একটা কিছু গায় দিয়ে দিতে পার?

এখানে তো কিছু গায় দেওয়ার মতো নেই।

তবে থাক।

আবার কিছুদূর গাড়ি এগিয়ে চলে। শরতের স্বচ্ছ আকাশ। মাঝে মাঝে হাওয়া আসছে ফুর ফুরে। কেঁপে উঠছে বাঁশের পাতা, ঘাসের শিস।

গাড়োয়ান বলে, শীত করবেনি, দেবতা কি এবার কম কাঁদালে! কেঁদে কেটে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন গাঁয়ের পর গাঁ। আমার যেটুকু জমি ক্ষেত ছিল

তাতে কাদা জমে গেছে বালির। নইলে কে আসত দুপুর রাতে পাচন বাড়ি নিয়ে গরু খেদাতে।

সুনন্দা ভাল করে শুনতে পায় না গাড়োয়ানের কথা। তার হাত পা শীতে খেয়ে যাচ্ছে। চিবুকে হাড়ের ভিতর পর্যন্ত।

খোকাবাবু আমি যদি মরে যাই।

কেন সুনন্দা, একথা বলছ কেন? তোমার কি হয়েছে?

না তেমন কিছু হয়নি, কিন্তু কেন যেন একটা আশঙ্কা হচ্ছে। আচ্ছা মানুষ মরে কোথায় যায়?

বলতে পারিনে। খোকাবাবুর গলা যেন ভারি আসে। তুমি বাড়ির কথা ভেবে অস্থির হয়েছ। আমি রয়েছি তোমার ভয় কি? তোমার বাবাকে সব বুঝিয়ে বলব।

কিন্তু তোমার মাকে?

তাঁকেও বলব।

শুনবেন না। সেই জন্যই বলছিলাম যে অনেক ভয় আছে। তোমার মা শুনতেন যদি তোমাদেরও চাইতে মানে সম্মানে ইজ্জতে যদি উঁচু হতাম তবে তো কথাই ছিল না। আমরা কত ছোট।

তুমি মাকে চেননা। একটা ঝি চাকরের ওপরও তাঁর কত দরদ।

কাজ আদায়ের জন্য।

ছিঃ ও কথা আর বলো না।

বললাম তার জন্য রাগ করো না—তুমি তোমার মাকে কেন নিজেকেও নিজে ঠিক চেন কিনা সন্দেহ আছে। আর কতদূর?

গাড়োয়ান বলে, একি এল গাড়ি মা? এখন ঘুমাও দুজনে, ভোর নাগাদ জিজ্ঞেস করো। এখন রাত দুপুর।

কিন্তু আমার যে শীত করছে?

গান গাও মা, গান গাও। মাঘের কনকনে শীতে আমরা তো গান গেয়ে কাটাই।

খোকাবাবু জিজ্ঞাসা করে, কেন? তোমরা বুঝি সবাই গান জানো? একখানা শুনিয়ে দাও না এখন! সময়টা বেশ কেটে যাবে।

গাড়োয়ানের সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দাও হাসে। অপ্রস্তুত হয়ে থাকে খোকাবাবু। ধীরে ধীরে এগুতে থাকে গরুর গাড়ি। ধুলোটনির্জন পথ। নিকটে কোনো মানুষের বসতি আছে বলে মনে হয় না। সুনন্দা টাকাগুলোর ওপর হাত দিয়ে শিউরে ওঠে। কিন্তু কিছু প্রকাশ করে না। এখানে ডাকাতি

রাহাজানি হওয়া অসম্ভব নয়। এমন তো সময় সময় ঘটে। শুধু টাকা কেড়ে নেওয়া ছাড়া আরো যে কী সাংঘাতিক কাণ্ড হতে পারে, তা কল্পনা করতেও সাহস হয় না সুনন্দার বিশেষ করে সে কুমারী যুবতী। সে ঘামিয়ে ওঠার যোগাড় হয়। আর ভাল করে চোখ মেলে না অনেকক্ষণ।

খোকাবাবু চুপটি করে একপাশে বসেছিল। তারই ঝিম এসেছে। সে ছৈয়ের মধ্যে কাৎ হয়ে একটু হা[illegible] ছড়ায়। [illegible]ঃ আর পারা যায় না।

সুনন্দা কোনো জবাব না দিয়ে [illegible] গিয়ে ভাবে, এ গাড়োয়ান ব্যাটাও তো খুনে হতে পারে। হয়ত [illegible] নিয়ে যাচ্ছে মওকা মতো।

ঘুমিয়েছ সুনন্দা?

না।

কি ভাবছ?

ভাবছি আমাকেই বা আমি কতটুকু চিনি? মানুষের দুর্বলতা চিরন্তন।

দীপা মনে মনে মন্তব্য করে, অনেকক্ষণ বাদে একটা দামী কথা বলেছিল। এখনো তো আমি নিজে নিজেকে চিনতে পারলাম না। তারা তো ছেলেমানুষ।

কিন্তু, না, না—তোমাকে তোমার চিনতেই হবে, নইলে ছেলেমানুষ বলে আগুন তোমাকে কখনো ক্ষমা করবে না।

এ-ও তো কোন অবুঝ প্রভুর চাবুক—তোমার অক্ষমতা কিছু বুঝবেনা কেবল সপাংসপ সপাংসপ। দীপা আর ভেবে এগুতে পারে না। সে চেয়ে থাকে গড়িয়ে চলা চাকাগুলোর দিকে। গাড়িখানা একখানা গাছের আবডালে অদৃশ্য হয়।

সব ছবিই ভাল এসেছে—শুধু দীপার নেগেটিভটা হয়েছে ঝাপসা। মূলে একটা ভুল হয়েছে এক্সপোজার নাওয়ার সময়। হয়ত ফোকাস ঠিক হয় নি, কিংবা অমনি একটা কিছু হয়েছে। অমিয়র হাত পা কামড়াতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে প্লেটটা চুরমার করে ফেলতে এতকাল এত পয়সা উড়িয়ে কি শিখল?

সে খানিক মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। বিনয়ের কোন দোষ নেই যে গিয়ে তার টুঁটি ধরে ঝুলবে। সকাল বেলা বিনয় যখন দেখতে চাইবে, তখন কি দেখাবে? তার কতদূর মুরদ হয়ত ফাঁস হয়ে যাবে মেয়েমহলে। একবার জানাজানি হলে দীপা আর কিছুতেই ধরা দেবে না, এর জন্যই হয়ত খেতে হবে নিচু ক্লাসের ছাত্রের মতো ধমক। ছিঃ ছিঃ এমনধারা আপনার স্বভাব। তারপর আবার বাড়ি বদল। ধরেও ধরা পেল না, পেয়েও যেন পাওয়া হলনা। অমিয় নিজেকে নিজে ধাক্কা দেয় বার বার।

অমিয় সব গুছিয়ে নিয়ে অতি সাবধানে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। খাটের তলে সব ঠেলে রাখে, চুপে চুপে নিজের বিছানায় মশারি তোলে।

কিরে সব হয়ে গেল ?

রাসকেল ঘুমোসনি ? এখনো জেগে রয়েছ।

কেমন হলো ?

সব ও, কে—কাল দেখিস।

নারে একবার না দেখলে ঘুম আসবে না।

তুই একেবারে স্ত্রৈণ।

স্ত্রী নেই—ও গাল আমার হাঁটুতে ঠেকে ঠিকরে বেরিয়ে যাবে।

এক শর্তে আমি দেখাতে পারি।

শর্তটা কি ?

তোর পায় পড়ি ভাই, কারুকে বলতে পারবি নে যে আমি ফটো তুলেছি দীপা দেবীর। ভাল হলেও দেখানো যেত, হাত একেবারে বিট্রে করেছে। তোয়গুলো চমৎকার উঠেছে কিন্তু।

তা হলে তো দেখতেই হয়।

বিনয় বিছানা ছেড়ে উঠতেই, অমিয় পা জড়িয়ে ধরে। ধনেপ্রাণে আমাকে মের না বাপধন।

ছাড় ছাড় পা ছাড়—সে পরে দেখা যাবেখন।

অমিয়র কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে বিনয় আলো জ্বালায়। ঢাকনি পরিয়ে দেয় নিয়ম মতো। সে একটি একটি করে সব কখানা প্লেট দেখে। দীপার খানা দেখে বলে কোনো ভয় নেই—প্রিণ্টে অনেকটা মেরে দেওয়া যাবে। এর উপযুক্ত কাগজ আছে। এখন নিশ্চিন্তে চোখ বোজ।

কই দেখি—।

না এখন থাক।

ওরা প্লেটটা নিয়ে টানাটানি করে। হয়তো এক্ষুনি ভেঙে যেতে পারে।

দীপা চমকে ওঠে। তার পিছনে কি দুটো ছায়ামূর্তি ডুয়েল লড়ছে ?

না। বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে দূরে আবডাল থেকে সেই গরুর গাড়িখানা আবার বেরিয়েছে সে বাতায়ন থেকে নড়ে না।

তেতাল্লিশ

সুনন্দা বলে, খোকাবাবু আর কতদূর? এখন আর টিকতে পারছি নে শীতে।

তোমার নিশ্চয়ই জ্বর এসেছে। অত রোদে ঘোরা সহ্য হয়নি।

হবে হয়ত। কিন্তু কিছু গায় না দিলে বাঁচব না।

গাড়োয়ান গাড়ি থামাও। যত টাকা লাগে একটা কিছু গায়ের জোগাড় করতে হবে।

আমার গামছাখানা দিবার পারি। মাথা কান জড়িয়ে বেঁধে দাও দিকিন। দেখি শীতশালা কেমনে থাকে। আর মেয়েমানুষে রোদ্দুরে অত টোঁ টোঁ করে করলে জ্বর হবে নি। কোষ তিনেক গেলে গাঁ পাওয়া যাবে—ততক্ষণ তুমি বাবু জাপটে ধরে থাকো। মুই জোরে গাড়ি হাঁকাচ্ছি।

বলদের লেজে মোড় দিতেই একটু জোরে এগিয়ে আবার ঢিমেয় চলে। পাঁচ গুণের বেশী ভাড়া কবুল করেছে তবু যাত্রীদের জন্য মায়া নেই।

সুনন্দা আবার কিছুক্ষণ পরে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। তার দাঁতের শব্দ শোনা যায় খোকাবাবুর এমন বাড়তি জামা কাপড় নেই যে সাহায্য করবে। সে মুখের ওপর ঝুকে পড়ে জিজ্ঞাসা করে, কি করব সুনন্দা?

উনি কি বলবে, তুমি একটু জাপটে ধইরে থাকো না, জ্বর এক্ষুনি ছাইড়ে যাবে। রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে বাতিক ক্ষেপেছে। কে আর দেখছে বলো খোকাবাবু—আমি তো এদিকে ঘুইরে রয়েছি।

সুনন্দার কানে এসব অস্পষ্টই পৌছায় কি পৌছায়না সে বলে, একটু জল।

খোকাবাবু বলে, গাড়িটা থামাও। একটু জল আনতে হবে।

এ তল্লাটে জল নেই।

পুকুর, নদী?

নদী বেশাটাক ফেলে এয়েছি পেছনে। পুকুর পাত-কুঁয়ো সব চড়া গেছে বালি উঠে। এথান থেকে মানুষ কি সাধে ভেগেছে।

তা হলে নদী থেকেই জল আনতে হবে। খোকাবাবু বলে, একটু তোমাকে কষ্ট করতেই হবে বুড়ো।

এমন করলে এখন আর বাড়ি পৌছুতে পারবেনি।

তা হলে থাক জল আনা সুনন্দা বলে, থাক।

খোকাবাবু বাধা দেয়, না তা হয় কি করে? তুমি হেঁটে গিয়ে একটু

জল নিয়ে এলো। একজন যদি ডাক্তার পাও—

এ শ্মশানে! তুমি এত বড়লোকের ছেলে হয়ে হাসালে।

তোমার সঙ্গে কিছু আছে যে জল আনবে?

থাকবে কি ক্যান? একটা ফুটো বালতি আছে গরুর জন্যে। দরকার মতো ঐটে দিয়ে হামিও কাজ চালাই। খুব ঘষে মেজে রেখেছি যতন করে।

সুনন্দা বলে, আমি জল খাব না। উঃ! বড্ড। শীত।

তা হলে ভালই হলো—গাড়ি হাঁকাই, কি বলো খোকাবাবু?

হাঁকাও। একটু এগিয়ে না হয় চেষ্টা করা যাবে। গ্রাম দেখলে গাড়ি থামিও!

প্রায় আধঘণ্টা গাড়ি এগিয়ে চলে। নতুন কিছু দেখা যায় না। বালি—মাঝে মাঝে ঝাপসা গাছপালা, শেয়াল ডাকে, বাদুড় ওড়ে। রাস্তা পেরিয়ে যায় বুনো ভাম।

উঃ বড্ড তেষ্টা পেয়েছে খোকাবাবু।

আর নয় গাড়ি থামাও—জল আনতেই হবে যে কোনো ভাবে জোগাড় করে।

বিড় বিড় করতে করতে গাড়োয়ান সেই অতি যত্নে তোলা বালতিটা নিয়ে নেমে যায়। এমন কেরায়ত্ত তার ভাগ্যে জুটেছিল।

খোকাবাবু জল!

এইতো এল সুনন্দা।

বড্ড শীত।

খোকাবাবু তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শক্ত করে। একটু চুপ করে থাকো, শীত কেটে যাবে।

আর একটু শক্ত করে—আর একটু—

খোকাবাবু হুকুম তামিল করে।

দীপা সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দেয়। এরপর চরম যা কিছু তাও ঘটা অসম্ভব নয়।

অমিয় বলে বিনয় নেগেটিভগুলো সরিয়ে রেখে একটা কথা শোন। মনে থাকতে থাকতে বলাই ভাল—নইলে ভুলে যাব ছুটি ফুরিয়ে এল আর কটা দিনের জন্য চটুলতা করে লাভ কি?

কি বলতে চাইছিস বুঝতে পারছি না।

কাছে আয় বলছি।

প্লেটগুলো গুছিয়ে রেখে বিনয় একটা টুল টেনে এনে অমিয়র শিয়রে

বলে আলোটা বাড়িয়ে দেয়।

দরকার নেই, যা আছে যথেষ্ট।

দেখ, এইটুকু থাকবে? বিরহের কথা একটু ডিম লাইটে হওয়াই ভাল।

ফাজলামি না করে, শোন। যেখানে আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, সেখানে বেশিদূর না এগুনোই ভাল। দীপা আমাদের সম্বন্ধে উঁচু ধারণা পোষণ করে না—গৌরীটাকেও দেখতে পারে না, এখন আমাদের দূরে সরে যাওয়া মঙ্গল। আমরা ওদের যা কিছু দিয়ে থাকি, হিশেব করলে তা তুচ্ছ করার মত নয়। প্রতিদানে ভেবেছিলাম, একটু আনন্দ পাব,—কিন্তু কিছুই পাইনি। আশাও নেই।

তা ঠিক। আগাগোড়া এ ক'টা দিনের কথা ভেবে দেখলে তাই দাঁড়ায়। বিনয়ের চকিতে মনে পড়ে ফুলের গুচ্ছটার কথা। একটু হাত দিয়ে ছুঁলেও কি দোষ হত।—ভয়ানক দেমাকী মেয়ে দীপা।

ভাবছি, ওদের না জানিয়ে এ-বাসাটা ছেড়ে যাব।

কোথায়?

এই শহরেরই অন্য কোনো জায়গায়। বাসা ঠিক করতে বলেছি কানাই সর্দারকে। এ ছাড়া গৌরীর জন্য আমার একটা দুর্বলতা আছে।

বাতিটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বিনয় জিজ্ঞাসা করে, কি দুর্বলতা, অমিয়? এতদিন যে বলিস নি? অন্তত আমার কাছে গোপন করা উচিত হয়নি।

তেমন কিছু নয় তাই বলিনি।

একটু ইতস্তত করে বিনয় বলে, ও ছোট জাত, তুই ভদ্রলোকের ছেলে—আমার কিছু বলার নেই। তবু কি জানিস, যেখানে সেখানে ডুব দেওয়া উচিত নয়। কোন দিনই আমাদের পিপাসা মিটবে না, তাই বলে—

অমিয় উঠে বসে বাধা দেয়, গৌরীর কপালে একটা দাগ দেখেছিস? আমার মা'র কপালেও অমনি একটা ক্ষতচিহ্ন ছিল। সবই অপমানের চিহ্ন। মা'র জন্যে কিছু করতে পারিনি, তাই কেমন যেন একটা ব্যথা বোধ করছি এই দেহাতি মেয়েটার জন্য। ওর মুখের আদলে আমি মাঝে মাঝে দেখতে পাই আমার অল্পবয়সী মা'র মুখ। বিনয়, বড় দুঃখে আমার মা মারা গেছেন।

অমিয়র থমথমে মুখের দিকে চেয়ে বিনয় তার দুখানা হাত জড়িয়ে ধরে বলে আমাকে ক্ষমা কর, ভাই—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি আগে।

তার জন্য কি হয়েছে! এসব কথা তো তোকে কখনো বলিনি—তুই ভিতরের কথা জানবি কি করে।

আচ্ছা, তখন তোর বাবা বেঁচে ছিলেন না?

ছিলেন। কিন্তু সে কাহিনী আরো মর্মান্তিক, তোর না শোনাই ভাল। আর আমিও বলতে পারব না। না, না, কিছুতেই তা বলা যায় না।

এতদিন বিনয় এই লোকটার সঙ্গে ঘুরেছে, এর অন্তরে যে এমন একটা ক্ষত রয়েছে তা তো কোনো দিনই লক্ষ্য করে দেখেনি! এ কেমন বন্ধুত্ব? তোমার সামাজিক মানসিক কোনো ব্যথারই সত্যিকার অংশীদার হব না, অথচ রেস্টুরেন্টে সিনেমায় চেপে তোমারই পয়সা ওড়াব? তোমার সমস্ত স্ফূর্তির ভাগীদার—অথচ কোথায় তোমার চোখের জল তা দেখব না! এই কি মানুষের ধর্ম?

হ্যাঁরে, তোর বাবার নামটাও তো কখনো জিজ্ঞাসা করিনি? আমরা যে কি অপদার্থ হয়েছি। যেন আমাদের সব লেন-দেন, ভাব-ভালবাসা ক্রমার্শিয়াল। যতক্ষণ কাউন্টারে আছ, হাসছ, তারপর যেমন বেরিয়ে এলে—অমনি শেষ।

আমার পক্ষে তা ভাল।

কেন?

তাও আজ বলা যাবে না।

আজ আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তুই যেন আরো একদিন কী বলতে বলতে থেমে গেলি। হয়ত তোর আত্মকথাই হবে—আজ তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে। যে-কথা আর শোনা হল না, আজও কিছু বলনি নে। বিনয় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, বাধা থাকলে না বলাই ভাল।

তোদের মত বাপ মা ভাই বোন নিয়ে সংসার, সে-সংসারের স্বাদ আমি কখনো পাইনি। দুঃখ থাকলেও তোদের জীবনের একটা অর্থ আছে। আমার কিছু নেই বা ছিল না। অমিয় থামে। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নেয়, সময় সময় আমি ভুলে যাই পোস্ট কার্ডের দাম ক' পয়সা—আজকাল খামের দামই বা কি! কারণ কারুর সঙ্গে তো আমার নিয়মিত চিঠির আদান প্রদান নেই, যদি একটা কানা অক্ষম পঙ্গু ভাইও থাকত।

বিনয় দেখতে পায়, ফাঁকা আকাশে যেন একটা ধূমকেতু ঘুরছে। তাকে টেনে রাখার মত কোনো গ্রহ-নক্ষত্র নেই। সে পুড়ে যাচ্ছে। অথচ হাত-তালি দিয়ে নাচছে সমস্ত বুদ্ধিমান চক্ষুষ্মান জগৎ। সেই জগতেরই একজন বাসিন্দা বিনয়। অথচ অফিসে ক্লাবে তার বড় পরিচয়, সে অমিয়র প্রিয়তম বন্ধু। বিনয় কয়েক মুহূর্ত মাথা হেঁট করে থাকে। অবশেষে বলে, তুই চুপ কর ভাই, আজ এ অধ্যায় এখানেই শেষ হ'ক। বিনয় উঠে দাঁড়ায়। তার মনে হয় যে, সেদিনের সেই স্বপ্নের কথা, বিবাহ রাত্রির বিড়ম্বনা—নিছক স্বপ্ন কাহিনী নয়। একটা কিছু যোগসূত্র রয়েছে ওর জীবনের সঙ্গে।

অমিয় বলে, শেষ তো প্রায় হয়েছে, ধূমকেতু পুড়ে গেলে আর কী থাকে? তবু বলি—

বিনয় নিষেধে ঘুরে আসে। প্রশ্ন করে, কী বলবি, না থেমেই বল। কিন্তু যেন দীর্ঘ না হয়—এ সব সহ্য করা যায় না বেশিক্ষণ।

আমরা দু'পুরুষ যে-কোনো কারণে ছন্নছাড়া—আমাদের সংসারের তাই কোনো পরিচয় নেই। এর বেশি আর তোর কাছে বলা যাচ্ছে না। বড় একা লাগে, তাই বন্ধুবান্ধব ছাড়া আমি থাকতে পারিনে এক মুহূর্ত।

ঘর ছেড়ে বিনয় বেরিয়ে গিয়ে খানিক অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সঠিক কিছুই বুঝতে পারেনি, কিন্তু আবছা আবছা যেন অনেক বুঝেছে। সে একটু একটু করে পায়চারি করে বাংলোর বারান্দায়। ক্রমে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায়। হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। এইবার একটু ভাল লাগছে। এতক্ষণ যেন কারনেসে আবদ্ধ ছিল!

বিনয় দেখে রাত প্রায় শেষ হয়েছে। বাসায় ফিরে যাচ্ছে নিশাচর পাখি।

চুয়াল্লিশ

জানালাটা খুলে দীপা দেখে, রাত ভোর হয়েছে। ঘরের আলিসায় বকবকুম জুড়ে দিয়েছে পায়রাগুলি। দোয়েল শিস কাছেই নিকটের একটা গাছে বসে। আশ্চর্য, একটা দীর্ঘ রাতই সে জেগে কাটিয়ে দিয়েছে! কি ভেবেছে, কেন ভেবেছে—তার যেন সে হেতু আবিষ্কার করতে পারে না। শুধু সব তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে যেতে চায়। আর সে খোকাবাবু এবং সুনন্দার কথা চিন্তা করবে না। বড় মর্মান্তিক শেষ অধ্যায়।

সে মুখ ধুয়ে আসে। চিরুনিটা নিয়ে সামনের চুলগুলো একটু ঢেউ খেলিয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে নেয়। চোখের পরিখায় যেন ক্লান্তি এবং গ্লানি জমেছে নৈশ শ্রমের। একি সুনন্দার পথশ্রম? তেমনি যেন মনে হয়, খোকাবাবু কি তাকে নিবিড় আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল—আর এগিয়ে ভাবতে দীপার লজ্জা হয়। তবু ক্ষণিকের জন্য দীপা ভাবে, অনুভব করে সে অবিস্মরণীয় সান্নিধ্য—কুমারীজীবনের জ্বালাময়ী দুঃহস স্মৃতি।

—পর মুহূর্তেই সে ঘৃণায় মুছে ফেলে দেয় চোখের পরিখার কালি। সে জোর করেই তার মাস্টারী জীবনে ফিরে আসে। এবং সেই জন্য প্রয়োজন হয় যৎসামান্য বহিরঙ্গ সজ্জার। সে প্রলেপ বুলোয় পাউডারের—যাতে ভাল করে কালি মুছে যায় বিগত রাত্রের।

দীপা সুশীলকে খুঁজতে যায়। সে নেই। কিন্তু রান্নাঘরও ফিটফাট। উনুনের আঁচ উঠি উঠি করছে। চা জল খাবার তৈরির সাজসরঞ্জাম সব গোছানো। এখন শুধু চড়িয়ে দিলেই হয়।

সুশীল রাত থাকতে উঠে ছুটেছে। গৌরীকে তার পাওয়া চাই। কাল সে বড় অতৃপ্তি নিয়ে ফিরেছে, তার বাবুদের চরিত্রের ওপর যথেষ্ট আস্থা জন্মেছে—তবু যেন মনে হচ্ছে, বাসাটা বদল করলে কি যেন একটা কি অশুভ ঘটবে। যত শত্রুই হক, এখানে দীপা ছিল যেন একটা বেড়া। রীতিমত বাবুরাও ভয় ভক্তি করত।

অল্প কিছু দূর এগিয়ে গৌরীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সুশীলের।

কি, কোথায় যাচ্ছিস?

তোর কাজ একটু হালকা করে দিতে। দীপাদি ঘুম থেকে ওঠার আগেই আমি ভেগে পড়ব। ফের দুপুর বেলা চুপি চুপি আসব। নইলে একা তুই পারবি কেন সামলাতে?

তোর তো বড় মায়া গৌরী। আচ্ছা, সকাল বেলা একটা সত্যি কথা বলবি। সূর্য সাক্ষী করে?

কখনো তো সঙ্গে ধোঁকাবাজি করিনি। বলতে পারবি, করেছি?

না তো, কখ্খনো করিস নি। আচ্ছা, বাবু তোকে এত ভালবাসে কেন?

গৌরী ছলছলিয়ে হেসে বলে, জানিনে।

যখন তখন আসে, রাত বিরাতে কথা কয়, তুই কেমন কেমন করিস—আমি মুরি ভয়ে। তুই সুন্দরী বলেই বুঝি সকলের লোভ তোর ওপর?

গৌরী আবার হাসে। হেসে হেসে জবাব দেয়, কি জানি। হ্যারে, তুই আমার সুন্দর দেখলি কোন জায়গাটায়।

সুশীলের পক্ষে উত্তর দেওয়া মুশকিল। সে একবার গৌরার আপদমস্তক ভাল করে চেয়ে দেখে। স্থির করতে পারে না কিছুই।

বাবু তোর জন্য নতুন একটা বাসা দেখেছেন, তোকে নিয়ে নাকি থাকবেন।

তাই নাকি, বলিস কি? দূর, মিথ্যে কথা।

না, একেবারে খাঁটি সত্যি। এরপর গলায় হার, কানের কানপাশা গড়িয়ে দেবেন। তোর আর ভাবনা কি! গয়না পরে অহংকারে আর মাটিতে পা দিবিনে। তখন কি এ গোলামকে চিনবি?

এসব কানে শুনেই চিনতে কষ্ট হচ্ছে!

ঠাট্টা হলেও সুশীলের মনে আঘাত লাগে। সে যে নানা দুর্বলতায়

অনেক বাড়তি কথা বলেছে তা কিন্তু ভুলে যায়। এক সময় জিজ্ঞাসা করে, তুই সত্যি কাকে ভালবাসিস, গৌরী? তোর মা দুগ্‌গার মত চেহারা কিন্তু মনটা অসুরের বাবরির মত কোঁকড়নো।

কাকে ভালবাসি—বলে দিচ্ছি, আগে প্রণামী রাখ মা দুগ্‌গার পায়।

সুশীল চট করে পা চেপে ধরে গৌরীর।

ছাড়, ছাড়, কেউ দেখে ফেলবে সকালবেলা। আমি মানুষ দুগ্‌গা। মহাদেবকে ভালবাসিনে, ভালবাসি তার পায়ের ঢেঁড়া সাপকে। সুশীল আশ্বস্ত হয়। সে চলে যাওয়ার সময় বলে, তোর আসা লাগবে না, রাত উঠে আমি সব কাজ শেষ করেছি। আর তো দু একদিন বাদে এক সঙ্গেই থাকব। এর মধ্যে বাসা হবে। কিন্তু এ কথা তুই কারুকে বলবি নে। বাবু জানলে রাগ করবেন।

এত ভয় থাকবে বললি কেন?

তাতো জানিনে, গৌরী।

সুশীল বাংলোর দিকে ফিরে আসে।

সে একেবারে খালি হাতে রান্না ঘরে ঢুকতে সাহস পায় না। ইঁদারা থেকে এক বালতি জল নিয়ে ফেরে। দীপা ততক্ষণ আলু পটলের ডালনা নামিয়েছে। এখন রুটি টোস্ট করে, চায়ের জল বসালেই হয়।

ভিতর বাড়ির কলরব শোনা যাচ্ছে। কেউ বা মুখ ধুয়েছে, কেউ বা মুখ ধুতে যাবে।

সুশীল, ওদের ডাকো। ওঁরা আসতে আসতে আমার সব হয়ে যাবে।

এ-বাংলো ও-বাংলো মিনিট দেড়েকের মধ্যে ঘুরে আসা যায় কিন্তু এক এক একটা ফরমাস তামিল করতে দেরি হয় বেশ। কেউ চায় শাড়ি, কেউ চায় জল। কেউ বলে, একবার দেখতো বিনয়বাবুর কাছে খাম আছে কিনা। সুশীল ভাবে এরপর জুতো সাফ করার হুকুম না হয়। উঃ, গৌরীটার কি কষ্ট হত! সে মেয়েমহল থেকে পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়। কিন্তু তা পারে না। ফরমাস আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। সে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, কেবল ঠাকুর দেবতার কাছে প্রার্থনা করে যে কানাই সর্দার আজই যেন খোঁজ দিতে পারে একটা বাসার।

এদিকে রান্না ঘরে জল শোঁ-শোঁ করছে।

দীপা কল্পনার চোখে দেখে, অমনি যেন বয়েলিং পয়েণ্টে উঠেছে হরিণ-বাড়ির সমস্ত ভুঁইয়া বাড়িটা।

সারারাত ধরে জেগে রয়েছেন ভুঁইয়া বাবু। কাছারি বাড়ি থেকে তিনি

অন্দরে প্রবেশ করেনি নি। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জেগেছে সমস্ত কর্মচারি। চাকর চাকররানিরা পর্যন্ত ঘুমাতে পারেনি। অম্বরী তামাকের ধোঁয়া কখনো কখনো মেঘের মত মনে হয়েছে। আজ বুঝি বড় বড় আলমারীগুলোও চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে। ঝাড় লণ্ঠনগুলোও যেন কি আশঙ্কায় জেগেছে।

সন্ধ্যার পর যতবার ট্রেন এসেছে ততবার লোক গেছে স্টেশনে। শেষ ট্রেনের সংবাদটাও যেন আর পরিবেশন করতে সাহস হচ্ছিল না কারুর।

খোকাবাবুর মা এতক্ষণ বাদে কাছারি বাড়িতে বেরিয়ে আসেন। খোকা যে আসবে না, আমি তা জানি। একা গেলে ও নিশ্চয়ই ফিরত। ও জীবনে এমন কখনো করেনি—সে দুঃসাহস জন্মাবার কখনো সুযোগ দিইনি আমি।

ভুঁইয়াবাবু বলেন, তবে কি বলতে চাও আমি দিয়েছি? মিছামিছি কারুকে দোষারোপ করো না। যত শক্ত করে বাঁধতে চেয়েছ ততই ঢিলে হয়ে গেছে বাঁধন।

ঢিলে হত না—ঢিলে হয়েছে তোমার আশকারায়। তুমি যখন ওদের স্থান দাও আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করনি। দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুশতে আমার খুবই আপত্তি ছিল।

মুখে কেন এ কথা প্রকাশ করনি?

তোমাদের দয়া মায়া মহানুভবতায় এগিয়ে গিয়ে বাধ সাধব আমি! তোমাদের সমাজসেবায় কাঁটা হলে আর পাঁচজনের মধ্যে দাঁড়াবে কি করে, খানা খাবে কি করে লাট-বেলাটের সঙ্গে? এবার হয়ত কিছুটা শিখবে, ছেলেটা হল মহানুভবতার বলি।

তুমি চুপ কর, নইলে বাড়ির ভিতর যাও।

এখন আর তা যাচ্ছিনে, নিধিরাজ, মাস্টারমশাইকে ডাকো।

হুকুম পেয়েই নিধিরাজ চলে যায়।

দীপাও যেন উত্তেজনায় অপেক্ষা করতে থাকে পরবর্তী সংঘাতের জন্য। কেটলির জল তখন টগবগ করে ফুটছে। আর অশরীরী আত্মা যেন ভুঁইয়া বাড়ি গিয়ে লুকিয়ে থাকে এক কোণে।

নিধিরাজ ফিরে আসে।

একা যে? খোকাবাবুর মা জিজ্ঞাসা করেন, তিনি যে এলেন না?

মাস্টারমশাই বলছেন, মেয়েদের খালি ঘরে ফেলে রেখে কী করে আসবেন?

এতদিন তো রাস্তায় ছিলেন! থাক, সকালেই আসবেন। রাত চারটার গাড়িতে দু'জন লোক পাঠাও, তারা খবর নিয়ে আসবে যে কোন কলেজে ভর্তি

হতে গেছে। খোকার কি দুর্জয় সাহস হল ভেবে আশ্চর্য হই। তুমি কি খেতে যাবে?

না। শরীরটা তেমন ভাল মনে করছিনে।

তবে বসে থাকো, আমি চললাম। আমার ছেলে হলে সে আমার কাছে ফিরে আসবেই।

থানায় সংবাদ পাঠাব নাকি?

সে কেলেঙ্কারি করার মত এখনো সময় হয়নি। মহিলা ভিতরে চলে যান।

কাছারি ঘর রাত চারটা পর্যন্ত নিস্তব্ধ হয়ে হয়ে প্রহর গণে। কেবলমাত্র ঘড়িটা সময় নির্দেশ করে যায় অতি দুঃসাহসের সঙ্গে। আর যেন সব মমির দেশের মানুষজন ঝাড়লণ্ঠন আসবাব ঘরদুয়ার।

চারটা বাজা মাত্র মহিলা আবার বেরিয়ে আসেন। এবার যাও নিধিরাজ বেশি দেরি করো না কিন্তু।

নিধিরাজের ফিরে আসতে বেশ দেরি হয়। মহিলা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেন, আত্মহত্যা করেনি তো?

বলো কি? ভুঁইয়াবাবু অম্বরী তামাকের ধোঁয়ার ভিতর থেকে উঠে বসেন।

আমি কিছু বলছিনে, বলছি, অপমানের গ্লানিতে মধ্যে মধ্যে এমনি হয়। শুধু না খেয়েই মানুষ আত্মহত্যা করে না।

ও তাই বলো।

একটু বাদে ব্রজবাবু এসে হাজির হন। সঙ্গে তার মেয়ে দুটি। তাদের হাতে দুটি বোঁচকা তখন পুবদিকে বেশ আলো দেখা যাচ্ছে। গ্রামের ভিতর জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে নতুন দিনের। এখনো ভুঁইয়াবাড়ির খবরটা তেমন বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি। নইলে এতক্ষণে লোক সমাগম হত যথেষ্ট।

খোকাবাবুর মা একটু মাথায় ঘোমটাটা টেনে বলেন, ওভাবে এসেছেন কেন। মেয়েদের নিয়ে আসতে বলেছে কে? আপনি বসুন, ওদের নিয়ে আসুক নিধিরাজ। তুমি বড্ড বোকা তো।

আজ্ঞে যা বলেছেন! মেয়েরা এলেন, আমি নিষেধ করি কি করে?

না, ওরা এখন চা-জলখাবার খাবে, পড়াশুনা করবে, আবার ইস্কুলের ভাত আছে মাস্টারমশাইর। একটি নেই বলে, আর তিনটির পেট তো বন্ধ হবে না। তুমি ওদের দিয়ে এস এক্ষুণি।

নিধিরাজের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দুটিও নিষ্ক্রান্ত হয়।

বসুন, মাস্টারমশাই।

ব্রজবাবু একটু যেন স্বস্তি বোধ করেন।

ওভাবে এসেছিলেন কেন মাস্টারমশাই? ওতে যে ভুঁইয়া বাড়ির কতখানি মাথা কাটা যায় তা কি ভেবে দেখেন নি। একজন শিক্ষিত লোক হয়ে?

দেখব না কেন? আজ কাল যে একের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় অন্যকে।

তা হলে বুঝতে পেরেছেন যে আপনার বয়স্কা মেয়ে অন্যায় করেছে। একে সামাজিক দুর্নীতি কি পাপ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে, বলুন, এ দোষ কি মাপ করা যায়? আমিও কি খোকাকে শাসন না করে আশকারা দেব, ভেবেছেন? কিছুতেই নয়।

দেখবেন, আমিও কিছুতেই রেহাই দেব না আমার মেয়েকে।

একটু পরেই একটা গোলযোগ শোনা যায়। গোলযোগ ঠিক নয় – আনন্দ সংবাদ। খোকাবাবু এসেছে, খোকাবাবু এসেছে।

ইতিমধ্যে আর কিছু লোক জমা হয়েছিল, কাছারি সমেত সব বাইরে ভেঙে পড়ে। ভুঁইয়াবাবুও তাঁর স্ত্রীও বেরিয়ে না এসে পারেন না।

খোকাবাবুর সঙ্গে ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নামে সুনন্দা। বড় ক্লান্ত— কিন্তু জ্বর বোধহয় ছেড়েছে – গাড়োয়ানের ভাষায় বাতিক।

মহিলাকে দেখা মাত্র সুনন্দা ও খোকাবাবু জড়োসড়ো হয়ে পড়ে। একেবারে এখানে সে এভাবে ওকে দেখবে তা কল্পনা করতে পারেনি।

খোকা, এখানে না দাঁড়িয়ে ভিতরে যাও। কাপড় বদলে তবে আমার শোবার ঘরে যাবে। আমি না আশা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সেখানে। কথা আছে।

সুনন্দার মুখের দিকে একটি বার তাকিয়ে তাকে কিছু না বলে কয়ে খোকাবাবু ভিতর দিকে চলে যান। যেন চলে যেতে বাধ্য হয়।

অস্ফুট স্বরে সুনন্দা শুধু একবার বলতে যায়, খোকাবাবু…কথা তার মুখ দিয়ে বার হয় না।

এখন আপনার পালা, যা বলার বলুন মাস্টারমশাই মেয়েকে। এই লোকগুলো আপনার বিচার দেখতে চায়। আপনারাই তো সমাজকে জাতি-ধর্ম শেখান।

ব্রজবাবু বলেন, তোমার মতো মেয়ের আমি আর মুখ দেখতে চাই না।

একথা কি বাবা, সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

ঠিক বলছ, তুমি নিজে বলছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি। ব্রজবাবুর যেন গলা বন্ধ হয়ে আসে।

মহিলা বলেন, সাধে বাপ হয়ে একথা বলছেন। মেয়েলোকের পক্ষে যার চেয়ে বড় পাপ নেই, তাতে তুমি ইন্ধন যুগিয়েছ। জোর করে বলতে পারবে যে যোগাওনি? তা পারবে না। তোমার চোখমুখ যে স্বীকার করছে। আর কেউ বুঝুক না বুঝুক মেয়েমানুষ হয়ে আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি। মুখ তোল তো।

সুনন্দা মুখ তুলতে পারে না। সে ধীরে ধীরে স্টেশনের পথে অদৃশ্য হয়ে যায়। বেরিয়ে যাওয়ার সময় কাকে যেন খোঁজে, দেখতে পায় না।

ব্রজবাবু নিজেকে সামলাতে না পেরে কাছারির ভিতর আত্মগোপন করেন। কেটলির জল এবার উথলে পড়ে। একটা হুঁশ করে শব্দ হয়। ধোঁয়া, ছাইতে একাকার। দীপা আত্মস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি ওটা নামিয়ে ফেলে।

কিন্তু খোকাবাবুর আর্তকণ্ঠ শোনা যায়। সুনন্দা, সুনন্দা, সে ছুটে আসছে স্টেশনের দিকে। পড়ে কি মরে ঠিক নেই।

ট্রেনে উঠেছে সুনন্দা। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। খোকাবাবু নিকটে এসে বলে, কি চাই, টাকার জন্যে এসেছ বুঝি? সুনন্দা এক তাড়া একশ'র নোট ছুঁড়ে ফেলে দেয় প্ল্যাটফর্মে। এই নাও।

না, না—তার জন্য আসিনি, তুমি নেমে এসো, নেমে এসো।

তোমার মতো কাপুরুষের কথায়? আর নয়।

আমি পালিয়ে এসেছি। আমি মা'র কথা মানিনে। তুমি নেমে এসো।

তা আর কিছুতেই হয় না, তুমি ননীর পুতুল, মা'র কোলে ফিরে যাও—বিপ্লব তোমাদের শরীরে সয় না।

ধরি ধরি করেও খোকাবাবুর চলন্ত ট্রেনের হাতল ধরতে সাহসে কুলায় না। সুনন্দা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রেনের জানলায়।

পঁয়তাল্লিশ

অল্প কিছুক্ষণ বাদেই চা পর্ব শেষ হয়। গতকালের ছবি নিয়ে সকলে হৈ-চৈ আলাপ-আলোচনা করার জন্য উন্মুখ, কিন্তু দীপার জলদগম্ভীর মূর্তি মেয়েদের সে সাহস হরণ করে নেয়। ওরা বাংলোর বারান্দায় যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

বিনয় এবং অমিয়ও কেমন যেন মন মরা। চা খেল, না কি খেল ঠিক বোঝা গেল না। কথাবার্তা হল অত্যন্ত সামান্য।

মেয়েরা ভাবে, এদের তিনজনের মধ্যে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র সৃষ্টি হয়েছে। ওরা যতই হৈ-চৈ করুক, দীপার গাম্ভীর্য এই আইবুড়ো ছেলে দুটিকে মজিয়েছে। মনে মনে ওরা ব্যথা অনুভব করে।—শীলা জলে তুষের আগুনে। কিন্তু বিচার করে দেখলে তার সপক্ষে বলার মতো কোনো কথা নেই। বিনয়ের কথাই শীলার বেশি মনে পড়ে। বিনয়ের দিকে সে ফিরে ফিরে তাকায়, শীলা অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে ওখান থেকে উঠে যায় সহসা।

বিনয়ের নজরে পড়ে। গত দিনটা সে সম্পূর্ণ কাটিয়েছে মেয়েদের সঙ্গে। বিশেষ করে শীলার সান্নিধ্যে এসেছিল ঘনিষ্ঠভাবে। বিনয় শীলার পিছন পিছন ঠিক যেতে না পারলেও সুযোগের অপেক্ষা করে। সে উশখুশ করে মিনিট খানেক বাদে উঠে যায়। অনুমানের ওপর নির্ভর করে বোঝে শীলা মেয়েদের বাংলোতে ঢুকেছে। হয়ত তার শয্যায় গিয়ে নিয়েছে আশ্রয়। বিনয়ের এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবু সে দুঃসাহসে ভর করে পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়ে।

শীলা বালিশের ওপর উপুড় হয়ে কাঁদছে।

বিনয় আর দাঁড়াতে পারে না। দীপার শাসনের কথাও তার মনে থাকে না। একজন জলে ডুবে যাচ্ছে—সে মেয়ে না পুরুষ, হিন্দু না খৃষ্টান, সুন্দর না কুৎসিত—কোনো কিছুর বিচার না করে যেমন মানবতাবোধ মানুষকে লাফিয়ে পড়তে বলে, এমনভাবেই এগিয়ে যায় বিনয়। ভাবনা, চিন্তা, প্রশ্ন করার এ সময় নয়। বিনয় শীলার মাথাটি তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করে, একি ? এ যে গেট খুলে দিয়েছে দামোদর বাঁধের।

কিছু নয়—তুমি এখান থেকে যাও, বিনয়বাবু।

রাগ করেছ, শীলা ?

না, না, রাগ নয়, রাগ নয়।

তবে কি ? বিনয় অমিয়মাখা কণ্ঠে প্রশ্ন করে, তবে কি অভিমান ?

তাও নয়, আমি কিছু বলতে পারছি নে, বুঝতে পারছি নে। তোমার ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই, দাবি করার হেতু নেই—শুধু কাঁদতে ভাল লাগছে কেন যেন। তুমি চলে যাও, আমাকে একা থাকতে দাও।

তবে কান্না বন্ধ কর। বিনয় সস্নেহে চুলগুলো গুছিয়ে দিয়ে বলে, কান্না বন্ধ করলেই আমি উঠে যাব, শীলা।

তা আমি পারব না।

কেন ?

চিরদিন এ কান্না চলে এসেছে, আমাকেও কাঁদতে হবে। আমার পরে যারা আসবে তারাও বাদ যাবে না। একতারা কাঁদবে, টংকার কাঁদবে—এ

তুমি রোধ করবে কি করে ?

বিনয় উত্তর দিতে পারে না। সামাজিক বৈষয়িক একটা প্রতিরোধ আছে, জগতের অংশ বিশেষে পড়েছে নতুন জীবনের আলো—বিনয় সম্যক এ বিষয় কিছু জানে না। তাই আর কিছু সান্ত্বনা দিতে পারে না। শীলারও কান্না থামে না।

এভাবে কতক্ষণ বসে থাকা উচিত হবে ? যে কেঁদে আত্মস্থ হবে তাকে আর ঘাটানো উচিত নয়। বিনয় ধীরে ধীরে শীলার মাথাটি নামিয়ে রাখে। সুন্দর মুখখানি। সুন্দর চুলগুলি। একেও হয়ত ভালবাসা যায়। একে নিয়েও হয়ত জীবন কাটিয়ে দেওয়া চলে—কিন্তু পথ নেই। চারিদিকে উত্তুঙ্গ পাহাড় —সংসার, দায়িত্ব, বেকারি। বিনয় ছুটে বেরিয়ে যায়। শীলা কোনো অভিযোগ তোলেনি। তবু বিনয়ের মনে হয়, সে যেন একেবারে নির্দোষ নয়। অথচ তার যা কিছু অন্তরায় ঐ সামান্য বেতনের গোলামী। ভালবাসলে শীলাকেও বাসা যায়। প্রিয় বলে জানলে, ও-ও হয়ত হতে পারে প্রিয়তমা নারী। মনের রঙ দিয়েই মানুষ অপরকে ইচ্ছা মতো রঙ করে নেয়। এর ঠিক ব্যাখ্যা চলে না—কিন্তু এর বিভূতি স্বীকার না করে গত্যন্তর নেই। আজ বিনয়ের আবার মনে পড়ে শিউলিকে। যাকে সে ও ঘরে ফেলে এলো ; যে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে সে শিউলি নাকি ? বিনয় কি যাবে ? এক্ষুণি হয়ত সে অধীর হয়ে পড়বে। তাই সে সমস্ত কান্না মুছে ফেলে দেয় মনের আয়না থেকে। সে এগিয়ে দেখে সুমুখের বারান্দায় অন্য মেয়েরা হাসছে।

প্রিণ্ট তোলা তোর কর্ম নয়। দে দে আমাকে দে। বিনয় ছুটে আসে।

সূর্যালোকে অমিয় প্রিণ্ট তুলবে বলে চেষ্টা করছে। একটা ফ্রেমে প্যাকেট করা কাগজ ও সমস্ত নেগেটিভ নিয়ে সে একা একা হিমসিম খাচ্ছে। খাওয়াচ্ছে মেয়েরাই। অমিয়র মোটে আগ্রহ ছিল না, কিন্তু কে শোনে সে কথা ! ওকে একেবারে টানাটানি করে যেন নিয়ে এসেছে।

নাটক রিহারসেলে ভুলে দিয়ে তুমি বাবা হাওয়া—বেশ লোক যা হক। এখন এগুলো নাও, সামলাও দেখি।

তোর নেগেটিভখানা ? একটু একান্তে সরে বিনয় জিজ্ঞাসা করে, তোর সেইটা ?

আমার কাছে আছে, চুপ।

প্রিণ্ট ?

তুলে নিয়েছি। চুপ মাইরি !

দেখাবি—কেমন হয়েছে ?

পরে, পরে—চুপ !

আমরা শুনে ফেলেছি—আমাদের ঠকানো চলবে না। মেয়েরা এসে ঘিরে ধরে। কই দেখি আমাদের ছবি ? দিন তো ?

অমিয় বলে, তোলা হয়নি এখনো।

একটু আগে তবে কি করলেন ? আপনার হাতে যে একখানা ছবি দেখলাম। ইন্দিরা বলে, নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করা যায় না।

একটু বিব্রত হয়ে পড়ে অমিয়।

বিনয় বলে, দেখুন তো এইখানা নাকি ? সে ইন্দিরার হাতে খাম খুলে একখানা কী যেন দিতে যায়। এই সুযোগে সরে পড়ে অমিয়।

এ যে একটা রাক্ষুসীর ছবি। ইন্দিরা ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দূর, কার যেন নেগেটিভ।

কারুর নয়—বসুন, একটু দেরী করুন, দেখবেন এক অনিন্দ্য সুন্দরী রূপসীর।

বলুন না কার ?

আপনার।

মাইরি কি ঘেন্নার কথা। ওকি একটা নেগেটিভ।

একটু সবুর করুন—পজেটিভের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছি। হয়ত তার চেয়েও দেখতে সুন্দর হবে, তখন কি বকশিস দেবেন এক্ষুনি রেডি করুন।

মিনিট পাঁচেক বাদে সূর্যের আলোতে যে প্রিণ্ট ওঠে সত্যিই তা চমৎকার। যেমন পোজ তেমনি প্রফাইল। সকলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হাতে হাতে ঘোরে চারিদিকে।

এখন ইনাম মেমসাহেব ? একটা কুর্নিশ ঠুকে দাঁড়ায় বিনয়।

ইন্দিরার সারা মুখে আনন্দ টলটল করে। বিনয় ভাবে, এরপর আর দাবী করার কিই বা থাকে।

ছবিখানা নিয়ে অনেক কথাবার্তা সমালোচনা হয়। দু একজন সিনেমা অভিনেত্রীও এসে পড়ে মুখে মুখে। এবার শুরু হয় খুঁত ধরা। অ্যা, একটু যদি বাঁকা চোখে চাইতিস ! হ্যারে দাঁত কটায় বড্ড লাইট ফ্ল্যাশ করেছে, না ? ঠোঁট দুটো আর একটু বোজালি না কেন মাইরি ? দেখেছিস কলার বোনটা একেবারে হাঁ করে রয়েছে।

শুনতে শুনতে ইন্দিরার মুখ একেবারে শুকিয়ে যায়। সে ভেবে দেখে ওদের রুচিমত অদল বদল করলে ছবিখানার অস্তিত্ব থাকে না মোটে। সে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় ফটোটা। দেখা যাবে, তোমাদের থাঁদা মুখগুলোর

ছবি বার হচ্ছে এক্ষুনি। অনুগ্রহ করে তাড়াতাড়ি করুন, বিনয়বাবু।

চিঠি। দীপাদেবী, ইলা, অনিমা সেন। একজন পিওন এসে দাঁড়ায় গেটে।

ইন্দিরা এগিয়ে যায়। আলোচনা বন্ধ হয় ওখানে। সঙ্গে সঙ্গে দল সমেত মেয়েরা গিয়ে ঘিরে ধরে পিয়নকে। আমার নামে আছে, আমার নামে?

ভাল করে দেখ, ইন্দিরা বসুর নামে আছে কিনা।

সত্যি নেই। পিওন চিঠির গাদা উলটে-পালটে দেখে মাথা নাড়ে।

ইন্দিরা বলে, ছোট ভাইঝির অনেকদিন ধরে জ্বর, অথচ খবর পাচ্ছিনে। সে একটু চিন্তিত মনে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনিমা বলে, অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন। দীপাদির খামখানা ওকে দিয়ে আয়। মনে হচ্ছে কমিটির চিঠি। নিশ্চই ইমপরটেন্ট; শিগগির যা।

চিঠির সঙ্গে সঙ্গে ওরা সকলেই ভিতরে চলে যায়। বিনয় থাকে একা পড়ে।

এই যে দীপাদি, নেমন্তন্ন পত্তর।

কে লিখেছে, অনিমা?

কি করে জানব? বোধহয় আপনার প্রিয়তম কমিটি।

সকলে একটু মুখ মুচকে হাসে।

তাহলে ওখানা রেখে তোমরা সবাই যাও, আমি একা একা পড়ব, একটু গোপনে পড়ব। এবার দেখা যায় চিঠিখানার কাছ থেকে কেউ নড়তে চায় না। কি যেন এক মধুর আকর্ষণ রয়েছে এই অমুঢ়া মেয়ে কমিটির কাছে।

দীপা জিজ্ঞাসা করে, এবার কি হয়েছে ডেঁপো খুকিরা? বড় যে কাছ ছাড়ছ না?

ওরা লজ্জায় চোখ নত করে থাকে। কেউ কেউ অনিমাকে অস্ফুট ভর্ৎসনা করে। দীপাদিকে তুই বুঝি চিনিস নে।

হাত ধুয়ে দীপা চিঠি খোলে। ধীরে ধীরে পড়ে। সকলে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। আশঙ্কায় সবাইর মুখ শুকিয়ে যায়। হয়ত এক্ষুণি একটা সংবাদ শুনবে বজ্রাঘাতের তুল্য। ইন্দিরার হাতের ফটোটা কখন যেন পড়ে যায় মেঝেতে।

সবাইর চাকরি আগামী মাস পর্যন্ত আছে।

তার মানে মাত্র এক সপ্তাহ? ইন্দিরা প্রশ্ন করে, কি বললেন?

না, হয়ত এক্সটেনশন্ পাবে - আমাকে আজই সেক্রেটারি যেতে লিখেছেন। গাড়ির বেশি দেরি নেই। আমি গোছগাছ করতে চললাম। তোমরা নিয়ে থুয়ে খেও। আর সুশীল, দেখো, ওঁদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়। তোমায় বলছি বা কেন, আমার চাইতে তো তুমি অনেক পুরোনো। ওঁদের চেন অনেক বেশি।

হোমিওপ্যাথিতে। তিনি এ অঞ্চলে এসে খুব নাম করেছিলেন। স্বনামধন্য পুরুষ, আমরা তাঁর পায়ের নখের যোগ্যও নই। উনি যখন এখানে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন তখন একাদশী ঝাঁ'র বাবা একজন পুলিস কনস্টেবল। তারপর কি করে যে দারোগা হন, আশ্চর্য! ওদের সব পাপের পয়সা। বোকা গোমূর্খ ঠেঙিয়ে পসার।

দীপা কোনরকমে বিদায় নিয়ে উঠে আসে। দরকার হলে চিঠি লিখবেন।

তা আর বলতে। শীগগিরই আপনাকে আবার দরকার হবে।

সেক্রেটারির বাড়ি থেকেই একখানা রিকশা করে সোজা স্টেশনে চলে আসে দীপা। মাঝপথ থেকে হোল্ড-অল স্যুটকেস তুলে নেয়।

এখন এক্সপ্রেস ট্রেনটা পাওয়া চাই। দীপা রিকশাওয়ালাকে একটু জোরে প্যাডেল করতে অনুরোধ করে।

রিকশাওয়ালা তা গ্রাহ্যই করে না।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দীপা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এবার তার গলায় কাতরতা ফুটে ওঠে। তাহলে কি তুমি গাড়িটা ধরিয়ে দেবে না।

আপনি ঘাবড়াবেন না মেমসাহেব, গাড়ি লেট হবে।

তুমি বকশিশ পাবে, আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

তবু প্যাডেলের দম বাড়ে না।

তুমি সর্বনাশ করলে।

ভয় নেই, আপনি গাড়ি পেয়ে যাবেন।

আর পেয়েছি গাড়ি—তোমার যা ইচ্ছা তাই করো।

রিকশাওয়ালা এক তালেই প্যাডেল চালায়। সব্বাই বকশিসের কথা বলে, কিন্তু জায়গা মত পৌঁছে গেলে ঝগড়া করে।

দীপা আর কোন জবাব দেয় না। সে চুপ করে বসে থাকে। রিকশাখানা উঁচু-নীচু পাথুরে পথে ঠোক্কর খেয়ে চলতে থাকে।

এক সময় দীপার মনে হয় তার এত ব্যস্ত হওয়ার হেতু কি? কে তার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দুয়ারে দাঁড়িয়ে আসে? এক্সপ্রেস ফেল করলে প্যাসেঞ্জার ট্রেন পাওয়া যাবে। তারপর লোকাল। না হয় কাল সকালে ওখানে পৌঁছাবে। মিছিমিছিই বকশিস কবুল করা, মিছিমিছিই উত্তেজিত হওয়া—ও এখন হাঁপিয়ে উঠেছে। আর নয়, আর নয় মায়ামৃগের পিছে ছোটা।

ট্রেনটা সত্যিই মিনিট কয়েক-লেট হয়। দীপা আর কোন ব্যস্ততা না দেখিয়ে একটা কামরায় উঠে বসে। তখন ঘোর সন্ধ্যা। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে চলে।

সাতচল্লিশ

দীপা রিকশা ভাড়া করে উঠে পড়ে। কেমন যেন এখন আর অত তাড়াহুড়া নেই। কেন যেন সমস্ত আকুলতা ঢিমিয়ে এসেছে তার। কেন যেন একটা ব্যথা বোধ হচ্ছে সুনন্দার জন্য। অথচ সুনন্দা এবং দীপা অভিন্ন সত্তা।

দূরে দূরে শহরে বাতি জ্বলছে বিক্ষিপ্ত ফুলের মতো। যেন কুল হারিয়ে ভাসছে। অমনি সুনন্দাও ভেসে এসে মিশেছে দীপার সঙ্গে। দীপা তার মর্মবেদনায় বিধূর হয়েছে। বয়স্কা ভগ্নি যেন কনিষ্ঠার জন্য দরদে গলে গেছে। দীপা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কখন বা দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকায় দূরের মসিলিপ্ত পাহাড়ের দিকে। কেনই বা এ সংসারে আসা, কেনই বা অবহেলা গ্লানির মধ্যে চলে যাওয়া? দীপা কিছু স্থির করতে পারে না। সুনন্দা দীপার ভিতরে এসে শুধু একটা ধাক্কা সামলেছে। শুধু একটু বয়সে বেড়েছে। কিন্তু কোন সম্বৃদ্ধিতে পৌছতে পারেনি। এ পরিণতি হতে পারে, কিন্তু মানুষের এ পরিণাম নয়। মরা গাছেও ফুল ফোটে, মৃত নদীতেও বন্যার ঢল নামে—ওরা বন্ধ্যা হয়ে রইল কি যেন কি অভিশাপে। লজ্জা ত্যাগ করেই ভাবে দীপা। ভাবে পৃথিবী পর্যটন করে এসেও একটি জয়ের মালা পেল না। সারা জীবনে পেল না কোন অভিনন্দন। ধূ-ধূ করছে বালুকাময় তপ্ত ভবিষ্যৎ। সেখানেও নেই কোন বাহু-বন্ধনের ছবি। তাই দীপা সুনন্দার জন্য ব্যথিতা। তাই আচমকা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

মেমসাহেব, নাবুন, ঐ ত বাংলো।

এর মধ্যে তুমি এলে! দীপা নেমে পড়ে। সে শাড়ি এবং খোঁপা গোছায়।

বাংলোটা অন্ধকার-নীরব। ভুল হল নাকি রিকশাওয়ালার? না। ঐ তো ফুলের বাগান—ঐ তো গেল। সে যখন সেদিন বেরিয়ে যায়, তখন তো অমিয় এবং বিনয় ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। এরা সব গেল কোথায়? এ ভৌতিক কাণ্ডের মতো ঠেকছে দীপার কাছে। সে একটু এগিয়ে এসে ডাকে, সুশীল, সুশীল!

কোন জবাব নেই। অন্য মেয়েরাইবা গেল কোথায়?

শুনছ রিকশাওয়ালা, তুমি একটু এগুলো নিয়ে ভিতরে আসবে?

পয়সা পেলে সব কিছু করতে পারি, মেমসাহেব। সে অবলীলাক্রমে বোঝা দুটো নিয়ে এগিয়ে আসে।

দীপা দেখে যে ভিতরে একটা আলো জ্বলছে। মেয়েমহলের জানালা দিয়ে রোশনাই আসছে। কিন্তু পুরুষেরটা একেবারে অন্ধকার কেন? শুধু

অন্ধকার নয় দুয়ারগুলো হাঁ হাঁ করছে। কেউ কী নেই? দীপার প্রাণ ডুকরে ওঠে। দীপা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস পায় না। কী যেন মর্মন্তুদ একট একটা কিছু ঘটে গেছে।

দীপা সুমুখের বাংলোতে না ঢুকে রান্না ঘরের দিকে যায়। সেখানেও শিকল তোলা ঘরকন্নার কেনে বন্দোবস্ত নেই। সমস্ত বাড়িটা যেন ঝিমোচ্ছে। তার সাজানো সংসার এভাবে ভেঙে গেল কী করে?

মেয়েদের বাংলোতে ঢুকেই সে আলোটা বাড়িয়ে দেয়। নিজের শয্যার কাছে বোঝা দু'টো নামাতে ইশারা করে রিকশাওয়ালাকে। সে চারদিকে চেয়ে দেখে—ফুল চন্দন কাজল ছড়ানো। একটা প্রদীপ জলছে। সুমধুর গন্ধ আসছে। সে একটু আশ্বস্ত হয়।

রিশকওয়ালা ভাড়া এবং বাড়তি মজুরি দাবি করে।

তুমি এখনি চলে যাবে?

না গেলে হামার রিকশা দেখবে কে? পেটভি চলবে কী করে?

তা বটে?

এমন সময় কানাই সর্দার প্রবেশ করে। সেলাম, মেমসাহেব। এই চিঠি সাহেবের।

তাঁরা সব কোথায়?

ঐ চিঠিতে লেখা আছে।

তুমি এখন কোথা থেকে এলে?

এখানেই তো ছিলাম আপনাদের পিছে পিছে। বাংলো পাহারার ভার পড়েছে হামার ওপর।

তবে এতক্ষণ লুকিয়ে ছিলে কেন?

একটু মজা দেখছিলাম,—আজ বড় ফুর্তির দিন।

দীপার সর্ব শরীর জলে ওঠে। সে মুখে কিছু প্রকাশ করে না। সে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ভাড়া চুকিয়ে দেয়।

কানাই বলে, একটু ভাড়া বে।

কেন?

দরকার আছে। কথা না শুনলে থাপ্পড় খাবি।

এবার আর ভাড়া খাটা কিংবা লোকশানের কথা তুলতে পারে না রিকশাওয়ালা। সে চুপ করে থাকে।

তুই বাহার যা।

লোকটা বেরিয়ে গেলে দীপা জিজ্ঞাসা করে, আজ তোমার বাবুদের এত

ফুর্তি কেন? ও সব কি, ঐ যে ফুল চন্দন প্রদীপ।

গৌরীর বিয়ে।

দীপার বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে।

—কার সঙ্গে?

ঐ চিঠিতে আছে।

সবই যখন চিঠিতে আছে, তুমি আর দাঁড়িয়ে কেন? নেমন্তন্ন খেতে যাও। আমি ওর মধ্যে নেই, জেনো। এতক্ষণে সব বুঝলাম।

দীপা কাপড় চোপড় নিয়ে বাথরুমের দিকে যায়। ঘৃণায় তার মুখখানা কুঞ্চিত।

—একটু পড়েও দেখবেন না!

সব শুনলাম। তোমাকে তো যেতেও বললাম। আর কি শুনতে চাও। দীপা অদৃশ্য হয়ে যায়। কানাই সর্দার বোকার মতো চেয়ে থাকে।

সকাল বেলা দু বন্ধুতে পরামর্শ শেষ করে প্রথমে এখানে আসে। মেয়েদের কাছে অমিয় যতটা সম্ভব খুলে বলে। আমরা পালিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন বাসা করিনি। সুশীলকে বিয়ে দিতে চাই আজ রাত্রে। এখানে এক বাসায় ঝামেলা হবে এবং দীপাদেবীর যে হিসেব এবং রুচি সেই ভয়েতে অন্য একটা বাসা ভাড়া করেছি।

অমিয়র যুক্তিটা দুর্বল হল দেখে বিনয় একটু মেজে ঘসে বলে, অমিয় ঠিক বোঝাতে পারছে না। দীপাদেবী এসব শুনলে নিশ্চয় আপত্তি তুলতেন না, কেউ তা তোলে না। তবে হঠাৎ সব ঠিকঠাক করতে হল কিনা, তিনি তো উপস্থিত নেই, জিজ্ঞাসা করা গেল না। তাই ভিন্ন একটা বাসা করা। আর বুঝলেন কি না, বিশেষ কারণে যত সময়ে চার হাত এক হয়ে না যায় ততক্ষণ বিষয়টা একটু গোপন রাখা দরকার? এদেশী মেয়ে, পরদেশী বর—একটা কিছু গোলমাল হতে পারে।

কে যেন জিজ্ঞাসা করে লাভ ম্যারেজ নাকি?

বিনয় গম্ভীরভাবে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওমা টিকিওয়ালা ভেজা বেড়ালটির এত বুদ্ধি। তলে তলে দুধের হাঁড়ি ঠিকই চিনেছে। মেয়েটি দেখতে কেমন?

এখন বলব না। আপনাদের ইনটারেস্ট কমে যাবে। সরেজমিনে গিয়ে দেখবেন যে চয়েস আমাদের চেয়ে সুপাব। অন্তত তাই আমরা শুনেছি, এখনও মেয়ে অবশ্য আমরা দেখিনি। বর এখান থেকে উঠে যাবে। বরের অভিভাবক আমি। বরযাত্রী আপনারা। মেয়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছে অমিয়।

কথাটা অনুগ্রহ করে আউট করবেন না। দুঃখের বিষয় দীপাদেবী উপস্থিত নেই, তিনি হয়তো এসে পড়বেন যে কোন মুহূর্তে—তাঁকে যা বলার আমিই বলব। আপনাদের কি কোন আপত্তি আছে বরযাত্রী যেতে?

সমস্বরে সবাই বলে, না, না,—তবে আমাদের রীতিমত আদরযত্ন হওয়া চাই।

আশা করি, চর্বচোষ্যলেহ্যপেয়র অভাব হবে না। কি বলিস, অমিয়?

অমিয় জবাব দেয়, বরপক্ষের তো এ আব্দার সইতেই হবে।

ওরা দু' বন্ধুতে উঠতে উঠে পড়ে। সময় অল্প, এখন তবে চলি—নমস্কার।

সকলে বলে আসুন আসুন তবে—আজ আপনাদের একটি মুহূর্তেরও দাম আছে।

ঘুম থেকে উঠে বিনয় ও অমিয়কে না দেখে মেয়েরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এবার আনন্দের বান ডেকে যায় সারা বাংলোটায়। শীলাও হাসে—কিন্তু কেন যেন একটু একান্তে কথা বলতে ইচ্ছা করে বিনয়ের সঙ্গে। বিনয় অনুমানে তা বোঝে। কিন্তু আজ তো সময় নেই।

ওরা দু বন্ধুতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সুশীলকে ডেকে নিয়ে যায়।

বিনয় জিজ্ঞাসা করে ঝি এসেছে।

হ্যাঁ বাবু এসেছে।

অমিয় বলে, বিনয়, তোর সত্যি উপস্থিতবুদ্ধি আছে। এমন গ্রেভ সিচুয়েশনটা চমৎকার হালকা করে দিলি এখন একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ি, কানাই সর্দারকে পাওয়া চাই।

বিনয় বলে, ঐ তো কানাই হয়ত ভাড়া খেটে ফিরছে। শুভকাজের এমনি যোগাযোগ হয়। এই সর্দার রোকো রিকশা, রোকো।

কানাই প্যাডেল থামায়।

ওরা তিন জনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়।

আজ তোমার নেমন্তন্ন চব্বিশ ঘণ্টা। সুশীলের বিয়ে।

কানাই আহ্লাদে এমন একটা সিটি দেয় যে ওরা তিনজন চমকে ওঠে।

কার সঙ্গে সাদি ঠিক হল? মেয়ের বাপের নাম? ঘর কোন জিলা?

বিজিন্দ্রপ্রসাদের মেয়ে। ঘর—বিনয় থামে।

গৌরী আরে রাম রাম! ওর অনেক বদনাম আছে, বাবু।

সত্যি বলে কি কখনও প্রমাণ পেয়েছে। অমিয় জিজ্ঞাসা করে, ঠিক করে বলতো?

তা পাইনি হুজুর—আমি মরে গেলেও মিথ্যা বলতে পারব না। মেয়েটা

কারুকে আমল দেয় না, তাই চ্যাংড়া শালারা যা তা বলে। সুশীল তোর নসিব ভাল, অমন একটা সুন্দরী মেয়ে ভদ্দরলোকের ঘরেও কম মেলে। সাদি করলে সব সাফা—কোরা কাপড়ে ধোপ দিলে কি ময়লা থাকে ?

উপমাটা শুনে সুশীল খুশি হয়—বিনয় ও অমিয় দৃষ্টি বিনিময় করে।

দেখবে মন সাফা থাকলে বিলকুল সাফ। তুই সাদি করে নিয়ে যা, অমন বহু বাংলামে মিলবে না। মাহাতো শালা কি জানে ?

জানলে কি রক্ষা আছে, সেইটাই তো ভয়। অমিয় বলে, তোমাকে কয়েকজন শক্ত লোক দিতে হবে। আরও অনেক কিছু করতে হবে আমাদের সঙ্গে থেকে।

সব ঠিক করে দেব হামি, হুজুর। মাহাতো শালা এলে এক শটে ওকে দিলরুবা কেবিনে পাঠিয়ে দেব। আপনাদের কোন ভয় নেই। গৌরীতো রাজী আছে ? জিজ্ঞাসা করেছেন ওকে ?

এই রে ঠিকে ভুল ? তাতো করা হয়নি সর্দার, অমিয় বলে, এমন জরুরী কথাটাও তুই মনে করিয়ে দিলি না, বিনয়। একটু আগে তোর বুদ্ধির তারিফ করলাম মিছে।

একটু অসুবিধে হয়েছে কি আমার দোষ ! যত দুর্নাম বিনয়ের।

সুবিধে হলে সুনামের তো বখরা নিতে যাইনে—অতএব তুমি এভাবে কি করে ? সত্যই কাজটা কাঁচা হয়ে গেছে।

হোক। ওকে যেন-তেন প্রকারেণ রাজি করাতে হবে। তুই ভাবিস নে —ওরে সুশীল, একটু সাহস দে তোর বাবুকে।

অপ্রতিভ হায় সুশীল জবাব দেয়, আমি তো আপনাদের ঝামেলা করতে বলিনি, বাবু।

অমিয় বলে, চোপরাও, আমাদের ইচ্ছে হয়েছে, করব, তুমি মাইনের মানুষ মাইনে পাবে, ব্যস ?

সকলে হেসে সরগরম করে রাস্তার চৌমাথাটা।

আটচল্লিশ

দীপা কাপড়-চোপড় বদলে এসে দেখে যে কানাই সর্দার নেই। তার জায়গায় বিনয় করজোড়ে দাঁড়িয়ে, হাতে তার একখানা রঙিন চিঠি।

দীপা হাসি চাপতে গিয়েও চাপতে পারে না ও কি ভঙ্গি।

আপনি এসেছেন—কানাইর মুখে সংবাদ পেয়ে ছুটে এলাম। এ আর

কিছু নয়, কন্যাপক্ষের বিনয়—এখন আমি যা কিছু অমিয়র হয়ে বলছি। অমিয় হচ্ছে ড্রাইভ মাস্টার আপনি একজন মাননীয় বরযাত্রী। গৌরীর সঙ্গে সুশীলের বিয়ে—এই চিঠি।

তাই নাকি? এর মধ্যে চিঠি ছাপিয়েছেন। আপনাদের তো দারুণ উৎসাহ।

সুশীল ও গৌরীকে আপনার আশীর্বাদ করতে যেতে হবে। ওদের দু'টিকে দেখলে আপনার আর কোন রাগ থাকবে না। যেন হরগৌরী। এই বাড়ি থেকে সুশীল উঠে গেছে। ঐ তার চিহ্ন।

বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই শাঁখ বেজে ওঠে। অমিয় অভিনন্দন জানায়। আসুন, আসুন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছি।

ওরা ভিতরে ঢোকে। বিনয় ভাবে, এ বিয়ে তো ওদের নয়। না হোক। তবুও যেন এতক্ষণ উপভোগ করেছে এক বিচিত্র বিয়ের অনুষ্ঠান।

ওদের জন্য তো কিছুই আনলাম না, বিনয়বাবু।

শুভেচ্ছা আশীর্বাদের চাইতে বড় কিছু নেই, দীপাদেবী। তা তো আপনার যথেষ্ট রয়েছে। বিনয় চুপ করে।

অমিয় বলে, এতদিন আপনাকে বলিনি—গৌরীর সঙ্গে আমার মার সাদৃশ্য ছিল। ওর যাতনা আমাকে বড্ড কষ্ট দিচ্ছিল এতদিন। আশীর্বাদ করুন, এখন যাতে ও শুভ কুশলে ঘরসংসার করতে পারে। ওর বাপটা নিতান্তই অমানুষ। আপনি এসে আশীর্বাদ করলে বিয়ে আরম্ভ হবে।

দীপা এগিয়ে যায়। কোথায় সুশীলের টিকি, কোথায় গৌরীর ছিন্নবাস, এ যে সত্যি হর-গৌরীর মিলন। দীপা খানিক চেয়ে থাকে বিস্ময়ে। কত কী যে সে ভেবেছিল।

দীপা প্রস্তুত নয়। একটা কিছু তো উপহার দিতে হবে। ওর শুভেচ্ছার সম্ভার-ভরা মনটা তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না। ও মুহূর্তকাল থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর গলাটা খালি করে সরু চেইনটা টেনে এনে গৌরীকে পরিয়ে দিয়ে ওর চিবুক স্পর্শ করে। সুশীলকে বলে, ভাই, তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ো না, তোমার হাতে সোনার চেয়েও দামী একটা জিনিস দিলাম নাও, ধরো শক্ত করে।

সুশীল সাগ্রহে ধরেই লজ্জায় ছেড়ে দেয়।

সভা সমেত জনতা হাসিতে ভেঙে পড়ে।

নিয়মিত অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি হয় না। পুরুত বামুন, রিকশাওয়ালা কয়েকজন, স্কুলের মিস্ট্রেসরা সবাই মিলে সভাটা সারাক্ষণ জমজমাট করে

রাখে। জাঁকজমক ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে প্রচুর। আলো এবং ফুলের ছড়াছড়ি। জিনিসপত্র গয়নাগাটি যতটা সম্ভব অমিয় দিয়েছে। কয়েকজন লাঠি নিয়ে খাড়া হয়ে রয়েছে দরজায়। অতিথিদের মধ্যে বাকি ছিল দীপা, সে এসে একেবারে ষোলকলা পূর্ণ করে দিয়েছে অনুষ্ঠান।

দীপা মিস্ট্রেসদের ডেকে একান্তে বলে, খবর ভাল, এক্সটেনশন দিয়েছে, তোমরা একটু গা লাগিয়ে কাজ কর। আজ আমাকে আর ডেকো না ভাই, আমি বড্ড টায়ার্ড ফিল করছি। বসে বসে দেখব শুধু।

ইন্দিরা বলে, বিশেষ কোন তো কাজ নেই রান্নাবাড়া ঠাকুরেই করছে, চাকর তো রয়েছেই—একটু মেয়ে-জামাইকে নিয়ে যা হৈ চৈ।

তা তোমরাই করো—আমি বসে বসে আজ দেখি, কি বলো?

তাতে কার আপত্তি থাকতে পারে, বলুন।

অমিয় এসে বলে, ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে পুরুত ঠাকুর এক ঝাঁক উলু দিতে বলেছেন, তা কেউ পারছে না। আপনি এসে উদ্ধার করুন অমিয় দীপার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। এমন সে কখনও অনুরোধ করেনি।

দীপা শিউরে শিউরে ওঠে। সে যত 'না' 'না' করে অমিয় ততো তাকে মিনতি জানায়! এ না হলে আমার মন লাগছে না। আমি কন্যা সম্প্রদান করতে বসতে পারছিনে।

দীপা যখন লজ্জায় গৌরবে রাঙা হয়ে উলু দেয়, অনেক মেয়েই তখন যোগ দেয় তার সঙ্গে।

বিয়ে শেষ হতে বেশী সময় লাগে না।

অমিয়র এখন আর সাহেবী সাজসজ্জা নেই। অভিভাবকের পূর্ণ মর্যাদায় সে সমাসীন। এ রূপটি—এই যে স্থিরধীরকর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিসত্তাটি বড় ভাল লাগে দীপার কাছে। সে অভিভূত হয়ে চেয়ে থাকে।

বিয়ের পর খাওয়ার পাতা পড়ে। মেয়ে-জামাইকে তুলে নিয়ে যায় মেয়েরা বাসর দেবে বলে। দূর থেকে হাসি উল্লাস ভেসে আসে। দীপা ঘুরে ঘুরে সব দেখে। কোনটায় না জড়িয়ে কেবল ঢেউয়ের মতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

অমিয়র মার সঙ্গে কি সাদৃশ্য এই দেহাতির কন্যার! রূপের, না, গুণের, কিছুই ভেবে স্থির করতে পারে না দীপা। তবু সে ভাবে। মাঝে মাঝে লজ্জা বোধহয় নিজের বিগত ধারণার জন্য। সে যা করেছে তা একেবারে ঠিকে ভুলের সামিল। অমিয় ও বিনয় আর যাই হোক অতি সাধারণ কৃষ্টিহীন ছেলে নয়। সমস্ত ছাড়িয়ে এদের রয়েছে একটা মহত্ত্বের দিক।

আসুন দীপাদেবী, খেতে বসবেন। অমিয় সবিনয়ে কাছে এসে ডাকে।

তার আগে এই বুড়োকে খাইয়ে দিন। না, না, আমিই যাচ্ছি নিজে, দীপা ভ্যানিটি ব্যাগটা অমিয়র কাছে রেখে চলে যায়। এবং একটু বাদে সেই ফুলের ইতিহাস জানা অচ্ছুৎ বুড়োকে নিয়ে সভার মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে নিজের হাতে পরিবেশন করে। আজ আর দীপা তার কোন আপত্তিতে কান দেয় না, তুমি আশীর্বাদ কর ওদের।

খেয়ে উঠে বুড়ো শুধু সুশীল ও গৌরীকে আশীর্বাদ করে না। ঈশ্বরের কাছে মঙ্গল কামনা করে সকলের জন্য বিনয়-অমিয় সব লক্ষ করে।

আবার ঘুরে ঘুরে বেড়ায় দীপা। অঞ্চলে যেমন শিখা চেপে রাখতে পারে না—তেমনি শাড়ি সায়া ব্লাউজ যেন রাখতে পারছে না—সামলে ওর রূপ। সকলে অবাক হয়ে দেখে। দীপা অনেকক্ষণ ঘোরে।

এবার আসুন খাবেন দীপাদেবী। অমিয় বলে, বাইরের সকলের হয়ে গেছে এখন বাকি শুধু আপনারা।

চলুন আপনারা দু'বন্ধুতেও বসবেন।

আপত্তি নেই। বিনয়, আয় ভাই, চল, বসিগে, রাত কম হয়নি।

ওরা তিন জনে গিয়ে বসে। কিন্তু অন্য মেয়েরা আসে না।

কি হল ওদের, অমিয়বাবু?

কি করে জানব বলুন?

একটু বাদে খবর আসে, তাদের দেরী আছে। তারা মেয়ে-জামাইর বাসর দেওয়ার জন্য ব্যস্ত। মাঝে মাঝে হাসির হর্‌রা এ পর্যন্ত ভেসে আসতে থাকে।

খেতে খেতে দীপা বলে, আপনারা অক্ষম বলেই আমার ধারনা ছিল। অন্তত এ-সব বিশেষ ব্যাপারে। এখন আমার সে ধারণা পালটে গেল। লক্ষ্য করে দেখলাম, খুঁটিনাটি বিষয়টুকুতেও ক্রুটি রাখেন নি।

বিনয় বলে, অমিয়টা চিরবাউণ্ডুলে হলেও ওর ভিতর রয়েছে একটি নিপুণ সংসারী মানুষ—যাকে ও কোনদিনই আমল দিল না। ও এসব ইচ্ছা করেই করল।

আর আপনি?

দীপার প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে যায় বিনয়। সে কিছু বলতে পারে না।

অমিয় বলে, আপনাদের সাহায্য না পেলে আমরা এত সব ঠিকঠাক করতে পারতাম না। প্রসংশার অর্ধেক ভাগ আপনাদের। সে হিসাবে দুর্নামেরও অর্ধেক অংশীদার আপনারা। অথচ দুঃখের কথা, বাউণ্ডুলে খাতায় নাম তুলে দেওয়া হয়েছে আমার একার।

বিনয়ের দিকে চেয়ে দীপা হাসে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সে

হাসি নিতান্ত ফ্যাকাশে মলিন।

মুখ ধুয়ে দীপা বলে, ওদের যখন দেরী আছে, আমাকে বিদায় দিন। আমি বড্ড ক্লান্ত। কাল আবার দেখা হচ্ছে, কি বলেন? আমাকে কে এগিয়ে দেবে?

আমি তো যেতে পারব না।

বিনয় যেন সুযোগের জন্য অপেক্ষায় ছিল, সে বলে, কেন আমিই তো রয়েছি।

নমস্কার করে অমিয় চেয়ে থাকে। ওরা চলে যায়।

একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস। তুই এলে এদিকের সব ব্যবস্থা হবে। মনে আছে তো?

বিনয় অমিয়র কথার কোনো জবাব না দিয়ে, হেসে দীপাকে জিজ্ঞাসা করে কেমন লাগল বিয়ে?

খুব ভাল—আর বেশী কিছু বলা যায় না।

আর কিছুটা পথ এগিয়ে এসে দীপা প্রশ্ন করে, আমি একটা কথা বুঝতে পারছিনে—গৌরীর সাথে অমিয়বাবুর মার কি সাদৃশ্য? রূপ কি রঙ—

তা নয়। গৌরার কপালে একটা দাগ দেখেছেন, ওর বাবা নাকি লোহা পুড়িয়ে ছ্যাকা দিয়েছিল। তেমনি একটা গ্লানির চিহ্ন ছিল অমিয়র মার কপালে। সেই জন্যই প্রথম দিন থেকে অমিয়র ওর ওপর এত টান। এবার একটা হিল্লে হল।

দীপা আর কোন প্রশ্ন না করে পথ হাঁটে। অমনি গ্লানি অপমানের ক্ষতচিহ্ন ছিল সুনন্দার চরিত্রে। অথচ ভুল বুঝেছে দীপা। সে আর কথা বলতে পারে না সারা পথ।

বাংলোতে পৌঁছে বিনয় বলে, আসি তবে—নমস্কার।

দীপা ভিতরে ঢুকে যায়। ভ্যানিটি ব্যাগটা রেখে শাড়ি বদলাবে ভাবে। কে যেন বারান্দায় ঘুরছে। ঐ যে জুতার শব্দ। সে বেরিয়ে আসে। কে, বিনয়বাবু নাকি? আপনি যাননি?

না যেতে পারিনি।

ভিতরে এসে বসুন। কোন কথা আছে নাকি? বলুন তা অমন করছেন কেন? দীপা আলো বাড়িয়ে দেয়। বিনয় একেবারে তার কাছে এসে বসে। এমন কখনও করে না বিনয় দীপা একটু সংযত হয়ে দূরে সরে যায়। ভিতরে ভিতরে ও যথেষ্ট বিরক্ত বিস্ময় বোধ করে।

কি বলবেন বলুন ?

দাঁড়ান, একটু স্থির হয়েনি।

একে এত রাত তাতে নির্জন বাংলোটা, রিশকাওয়ালাটাও বোধহয় খেতে চলে গেছে ও বাড়ি—দীপা শঙ্কিত হয়। কিন্তু চিৎকার করার মতও পরিস্থিতি ততো ঘোলাটে হয়নি। সে কাঠের মতো কঠিন হয়ে থাকে, নিজেকে সর্ববিধ পরিত্রাণের জন্য সচেতন করে রাখার প্রয়াস পায়। বলুন !

বিনয় কিছু বলে না। দীপার কঠোরতা তাকে যেন আরও সংশয়ে ফেলে দিয়েছে।

এভাবে আমাদের অনেকক্ষণ কি বসে থাকা ভাল দেখাবে ? যদি ওরা এসে পড়ে কেউ ? আজ থাক, কাল না হয় বলবেন।

আজ শেষ রাত্রেই আমি চলে যাচ্ছি। আর এখানে ফিরি কি না জানা নেই। কারণ যত হৈ-চৈই করি, আমাদের চাকুরিও আপনাদের মতই, ছুটি নিয়ে ঝামেলা বেঁধেছে। আমি গৌরী ও সুশীলকে তাদের বাড়ি পৌছে দিয়ে কলকাতা যাব। আর দেখা নাও হতে পারে।

কিন্তু আপনি আমাকে কোথায় টেনে নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে যাচ্ছেন তাকি বুঝতে পারছেন না। আমার মানসম্ভ্রম—

কিছু নষ্ট হবে না, দীপাদেবী। আপনার নারীত্বের মূল্য আরও বেড়ে যাবে। শুধু আমাকে সে কথাটা পেশ করবার মত অধিকার দিন।

আপনার চোখ, মুখ দেখে যা বুঝতে পারছি—তা আর অনুগ্রহ করে কানে তুলবেন না। আপনারা ভদ্রবেশী—

বিনয় দীপার হাত দুখানা চেপে ধরে। অত উত্তেজিত হবেন না। একটু ধীরে ধীরে কথা বলুন। আমাদের যা ভেবেছেন আমরা তা নই, এ কথা শপথ করে বলতে পারি।

আপনি হাত ছাড়ুন।

দেখুন, বিশ্বজগৎ সবাই টেম্পোরারি—এমন যে গ্রহ-নক্ষত্র তাও। আপনি অমিয়কে বিয়ে করে বন্ধুর কর্তব্য থেকে আমাকে মুক্তি দিন। অনেক ঘুরেছি, অনেক দেখেছি, কিন্তু আপনার মতো একটি মেয়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়নি। ওর মর্মবেদনার ইতিহাস যদি জানতেন !

দীপা একটু সময় স্থির থেকে বলে, আমি ভেবেছিলাম আপনি বরঞ্চ পালটা একটা কিছু প্রস্তাব করবেন।

সত্যি বলতে গেলে কি, তাও আজ আশ্চর্য ছিল না বিনয়ের পক্ষে। তাই সে পৃথক গণ্ডি টেনে দিয়েছে মরিয়া হয়ে। সে বলে, আমার বাপ

আছে, ভাই-বোনের একটা বন্ধন রয়েছে। আমি বিয়ে না করলেও সংসারী আর ও হচ্ছে সন্ন্যাসী। ওকে গৃহী করাই আমার প্রধান কাজ। ওরটা আমার চেয়ে অনেক জরুরি।

আমার যে দুটি বোন ও বুড়ো বাপের দায়িত্ব রয়েছে। আমি চাকরি না করলে যে সংসার একেবারে অচল। তা কি ভেবে দেখেছেন?

ওর তো যথেষ্ট আয় রয়েছে। আর তর্ক না তুলে কথা দিন! বিনয় আবার হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে। আমাকে মুক্ত করে দিন দীপা দেবী এবং আপনার পক্ষে আজ তা সম্ভব।

একটু হেসে দীপা বলে হাত ছাড়ুন, ভেবে দেখব।

চললাম, নমস্কার। বিনয় ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, আমি অমিয়কে গিয়ে সব বলছি।

উনপঞ্চাশ

এত করে বলে দিলাম তবু দেরী করে এলি! এতক্ষণ কি করছিলি ওখানে?

কিছু না—পরে শুনিস। তিনটা বাজে, এখন বল কি কি গুছিয়ে নিতে হবে আমাকে?

আমি কিছু বলতে পারব না। তোর যা ইচ্ছা তাই কর। ট্রেন ফেল করলে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হবে। কিছুই আর গোপন থাকবে না। হয়ত থানা পর্যন্ত টানাটানি হতে পারে।

একান্তই যদি হয় সেজন্য আমিই না হয় জবাবদিহি করব। গৌরী আর নাবালিকা নয়। আমরা তো তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করছিনে।

বুঝলাম উকিল মশাই। পুলিসের হাতে ত কখনও পড়নি। দরকার হলে তারা রাতকে দিন করে দিতে পারে। সাবালিকা তাদের হাতে-কলমে নাবালিকা হতে কতক্ষণ? তারপর কোর্ট পর্যন্ত ছুটোছুটি কর। ওখান থেকে একটু তাড়াতাড়ি এলেই হত।

ও, এই রাগ! বিনয় হেসে ফেলে।

অমিয়র সারা শরীর দগ্ধে যায়। হ্যাঁ, সেই রাগ!

বিনয় গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়, ভদ্রলোকে কখনো ওয়ার্ড অফ অনার ব্রেক করে না। আমার যতই দেরী হয়ে যাক, আমি তোর জ্যান্ত প্রফাইলে লোভ দিই নি। আমার এবং তোর ভিতর যে ভুল-বোঝার পাহাড় খাড়া হয়েছিল, তাতে ডিনামাইট চার্জ করেছি। চমৎকার রেজাল্ট হয়েছে—আয় বলি, শুনবি।

এখনো ট্রেনের যা দেরি আছে তাতে একটা বাক্স ও বিছানা গুছিয়ে নেওয়া যাবে।

অমিয়কে টেনে বাইরে বাগানের কাছে বিনয় নিয়ে যায়। সে চারদিকে চেয়ে দেখে কেউ আছে কিনা। বিশেষ করে মিস্‌ট্রেসরা। পাশাপাশি দুজনে একটা বেঞ্চে বসে পড়ে। একটা সিগারেট দে অমিয়।

এই নে কিন্তু দেশলাই নেই।

তুই নিতান্ত অরসিক। এখন দেশলাই নেই! ভেবে ছিলাম একটু মেজাজ করে নেবো।

তুই যে ভূমিকা করছিস, তাতে হয় ট্রেন ফেল করবি, নয় পুলিস এসে পড়বে।

কিছুক্ষণবাদে একটা জলন্ত সিগারেট প্রচুর অক্ষমতার সঙ্গে টানতে টানতে বিনয় আবার এসে অমিয়র কাছটিতে বসে। দেশলাই পাওয়া গেল না। এই নে, এইটা ঠেকিয়ে ধরিয়ে নে তোরটা। তুইও একটু মেজাজ করে নে।

বিনয় গোটা কয়েক টান দিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফের বলে, অমিয় এবার আব আমি তোমার আর কোন কথা শুনতে চাইনে। তোমাকে মত দিতেই হবে। কারণ দীপাদেবী রাজী হয়েছেন।

বিষয়টা কি?

ন্যাকাচৈতন যেন, কিছু বুঝতে পারেনি।

তবু শুনতে হবে। নইলে কিছু জবাব দেওয়া যাবে না।

বি সিরিয়াস্—বলছি শোন। তুই রাজী হলে দীপাদেবীও রাজী। অনেক দিনের ইচ্ছে তোকে প্রতিষ্ঠা করি। তুই ধনুক-ভাঙা পণ করে বসিস নি। একটি একটি করে কিন্তু জীবনের দিন ফুরিয়ে যায়।

তোকে ত সব বলেছি, আমার অনেক অন্তরায়।

তোর যদি দীপার ওপর কোন খারাপ ধারণা হয়ে থাকে তা মিথ্যা। এমন মেয়ে লাখে একটি মেলে কিনা সন্দেহ। আমি অনেক কষ্টে তাকে রাজী করিয়েছি।

তার ওপর আমার কোন খারাপ ধারণা কোন দিনই নেই। সে যা ভুল করেছে আজ নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছে। সে অতি বুদ্ধিমতী। কিন্তু তবু অন্তরায় আছে। তুই হাজার মাথা কুটলেও আমার এ বিয়ে হওয়ার নয়। কোন বিয়েই সম্ভব কিনা তা জানিনে। অমিয় চুপ করে থাকে।

হয়ত আবার টেম্পরারির কথা তুলবি। সুশীল কোন্ পারমানেন্ট যে তার হাতে গৌরীকে দিলি? ও শব্দটাও ভাবতে গেলে আপেক্ষিক।

তাও নয়।

তবে?

শুনবি? ভেবেছিলাম এ-সব কারুকে কোনদিন বলব না। অমিয়র গলায় এক একটি শব্দ যেন গভীর গহ্বর থেকে বার হয়ে আসে। কিন্তু তুই আজ যেমন করে আঁকড়ে ধরেছিস, তাতে না বলেও উপায় নেই।

বিনয়ের কানে প্রতিটি কথার ধ্বনি তীক্ষ্ণ শেলের মতো বেঁধে, তবু সে বলে, আজ আমার এ বিষয় নিয়ে শেষ চেষ্টা। জীবনে আর কখনও আমি এ নিয়ে তোকে অনুরোধ করব না। তুই বন্ধুত্বের কোন মর্যাদা বুঝিস নে, তুই পাষণ্ড।

অমিয় একটু হাসতে চেষ্টা করে, হাঁ যা বলেছিস!

কি করে তুই হাসছিস, বল তো? ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে—এর জন্য কি তোর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই? কোন মোহ নেই একটি নারীর জন্য? তবে হ্যাংলামি করে ফিরিস কেন তাওতো বুঝতে পারছিনে। তোকে গালাগালি দেওয়ার মতো আমার কোন ভাষা নেই!

আমি রক্ত-মাংসের মানুষ, আমার সব আছে, বিনয়, কিন্তু বিধাতা বৈরী।

ও-সব আধ্যাত্মিক কথা রেখে দে। একটু প্র্যাকটিক্যাল হতে চেষ্টা কর। দীপার মতো মেয়ে হাত ছাড়া হলে একটা চামচিকাও তোকে কোনোদিন লাথি মারতে আসবে না।

তাও মেনে নিচ্ছি।

দেখ, তোর সঙ্গে আমি কিন্তু জন্মের মতো সমস্ত সংসর্গ ত্যাগ করব। বিনয় রাগে উত্তেজনায় বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আমার সঙ্গে তোর কোনো নাড়ীর যোগ নেই, আত্মীয়তার কোনো বন্ধন নেই—তবু জানিস আমি চলে যাওয়া মানে তোর অনেক কিছু যাওয়া।

অমিয় কিছু জবাব দেয় না, শুধু বিমর্ষ হয়ে থাকে।

বিনয় বলে, আমার সংসারে অনেক কিছু থাকলেও তোকে ভাইয়ের থেকে বেশি ভালবেসেছি, বোনের থেকে বেশি স্নেহ করেছি। সময় সময় বাপের চেয়েও শ্রদ্ধা করেছি বেশি, তার বদলে তুই কি করেছিস, জানিস? আমার সঙ্গে ভান করেছিস। জোচ্চোর! বিনয় একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করে। তুই এমন করবি জানলে দীপাকে কি আমি ভালবাসতে পারতাম না? আমার ভেতর কি কোন মোহ নেই? সকল বাধা-বিপত্তি কি প্রেমের জন্য তুচ্ছ করা যেত না? ও অশিক্ষিত বুনো নয় যে ভার হত। দেখতিস, চাকরি বাকরি করে কেমন সুন্দর একটি বাসা বাঁধত। তুই একুল ওকুল দুকুল মজালি। আবার আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তুই নিতান্ত পাষণ্ড, বেইমান।

বল তো দেখি, তোর অন্তরায়টা কি শুনি আজ ?

আমি বাপ-মা'র আইনসঙ্গত ছেলে নই। সমাজের চোখে জারজ। দীপা কেন, কোনো মেয়ে কি এ-কথা শুনলে আমার মুখের দিকে তাকাবে ?

বিনয় স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে খানিক চুপ করে থাকে। যেন ভিরমি খেয়েছে—যেন কে নক আউট ব্লো মেরেছে।

তুই ঠিক জানিস ?

আমার জ্ঞান বিশ্বাস তাই বলে। তাই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ। কী আকুতি; কী মর্মবেদনা; একবার আমার বুকটায় হাত দিয়ে দেখ, ভাই। দীপার কাছে তুই যদি কিছু প্রোপোজ করে থাকিস ভুল করেছিস।

সে ভুল কি শোধরান যায় না, অমিয় ? বল তো দীপাদেবী কি ভাববে ?

কোন পথই তো দেখছিনে, একটু তুই যদি—

এ ছেলেখেলা নয়। বিনয়কে চিন্তিত দেখায়। সে একটু পায়চারি করে। ওদিকে ট্রেনেরও সময় হয়ে এসেছে। সে ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়ে; দীপা অনেক অসম্মতিসূচক উত্তর দিয়েছে। কিন্তু তার ভিতরই বিনয় যেন দেখেছিল স্পষ্ট অথচ মৌন শান্ত অনুমতি। এক কাজ কর—তুই এ-সব বলতে যাবি কেন ?

এতক্ষণ বাদে তুই হাসালি ? তা কিছুতেই হয় না। এখন চল, ওদের ডেকে তুলে সব গুছিয়ে দিই। এখন পর্যন্ত গৌরীকে কিছু বলা হয়নি। সে জানলে কতদূর কি করে দেখ না।

তাই চল। উপস্থিত সমস্যাটা আগে মীমাংসা করে নি। ভরসার মধ্যে সুশীল সব জানে। সে কি এতক্ষণ গৌরীকে কিছু বলেনি ? কথা ছিল সে-ই গৌরীকে রাজি করাবে।

ওরা দুজনে উঠে ভিতরে চলে যায়।

প্রায় রাত ভোর।

মিস্ট্রেসরা ক্লান্ত হয়ে এখানে ওখানে শুয়ে পড়েছে। কেউ বেঞ্চে, কেউ বা কার্পেটে, শীলা ঢুলছে একখানা চেয়ারে বসে। একটা মিহি সুবাস আসছে আসরের আশপাশ দিয়ে।

বিনয় বলে, আপনাদের বড় কষ্ট হয়েছে, কেন, চলে গেলেই পারতেন রিকশা করে ও-বাড়ি। রিকশা তো রেডি ছিল বাইরে।

ইন্দিরা বলে, ভাল বলেছেন! এত রাত্রে সঙ্গে যেত কে ?

অনিমা দোহার টানে, আনার সময় করজোড়, বিদায়ের সময় গলা ধাক্কা —এই হল বরযাত্রী নিমন্ত্রণ। চল চল এখন আমরা নিজেরাই যেতে পারব, পুব দিক ফর্সা হয়ে এসেছে।

যাওয়ার আগে আর একটু উপকার করে দিয়ে যেতে হবে। গৌরী এবং সুশীলকে ডেকে তুলে দিয়ে যাবেন।

রাগ না করলে তা এক রকম দেখা যেত। এখন আপনি ঠেকা, আমাদের সকলের অভিমান ভাঙুন আগে। ইন্দিরা চোখ বুজে ঘুমের ভান করে।

অনিমা বলে, অমিয়বাবু কোথায়, তাকে ডাকুন, শয্যাতুলুনি কে দেবে? আমরা এক'শ টাকা চাই। তার কমে কিছুতে হবে না।

মানুষ এখনও মামলা-মকর্দমা করে খাচ্ছে। আপনারা যেদিন আদালতে বসবেন সেদিন আর কারুর রক্ষা থাকবে না। জজ করে বসিয়ে দিলেও বাঁ হাত পাতবেন।

অমিয় এসে পড়ে। বাকশ এবং সঙ্গের টুকিটাকি তৈরি, এখন ওদের ডেকে তুলতে বল।

এরা শ'টাকার ওপর আরও এক টাকা দাবি করেছেন,নইলে ওদের ডাকতে পারবেন না।

ঠাট্টা ফাজলামি করার ঢের সময় আছে, বিনয়, এখন ওদের রওনা করিয়ে দিতে হবে, বুঝলেন, ওরা এখন বাড়ি যাবে। একটু তাড়াতাড়ি তুলে দিন।

তাই নাকি? সত্যি ওরা চলে যাচ্ছে? ইস! সব মেয়েরা সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। অনিমা বলে, কি ভাল ছিল গৌরীটা। যাক, ওরা এখন সুখে ঘর-সংসার করুক।

অমিয় মুহ্যমান হয়ে শোনে।

মেয়েরা গিয়ে বাসর ঘরের দুয়ারে দাঁড়ায়। ভিতরে ফিসফাস আওয়াজ হচ্ছে।

ইন্দিরা বলে, কাদের ঘুম ভাঙাতে যাচ্ছ! ওরা কি আজ চোখ বুজেছে।

অনিমা বলে, চুপ শুনতে দে।

ইন্দিরা বলে, ওদিকে যে ট্রেন ফেল হবে।

হোক। তারপরও অনেক ট্রেন পাওয়া যাবে। ওদের জীবন-স্টেশনে এমন রাতের গাড়ি আর থামবে না। জোর করে এ ট্রেন বদল কারও মহাপাপ।

ইন্দিরা জবাব দেয়, ভট্‌চায বাড়ির বিধবা বোনঝি, একটু সর দেখি। শুনতে দে ওরা কি বলছে। ওমা, গৌরী দেখি কাঁদছে।

সুশীল বেটা মারলে নাকি? বিয়ে করতে না করতেই মর্দ হয়েছে বুঝি। অনিমা এবং আরো তিন চারজন মিলে ডাকে, এই সুশীল, সুশীল!

সোরগোলে বিনয় ও অমিয় এগিয়ে আসে।

অমিয় জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে?

গৌরী কাঁদছে। বোধহয় মেরেছে ওকে। শীলা বলে, একটু ধমকে দিন ওকে।

কঠিন কণ্ঠে অমিয় ডাকে, এই সুশীল, দোর খোল।

গৌরীই দুয়ার খুলে কেঁদে-কেটে লুটিয়ে পড়ে অমিয়র পায়ে। সুশীল থাকে সংকুচিত ম্রিয়মান হয়ে। যেন সে কি অন্যায়ই করেছে।

ব্যাপার কি রে?

সুশীল কোন জবাব দেয় না।

গৌরী বলে, আমি বাবু কিছুতেই ল্যাংড়া বাবা আর ছোট ভাইদের ছেড়ে যেতে পারব না। ওরা কি খাবে? ও-বেটা তা শুনবে না। আমাকে নাকি জোর করেই নিয়ে যাবে। আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন ওকে। নইলে আমি ওর সংসার করব না। কেন আমাকে আপনারা বিয়ে দিলেন? বাবু…গৌরী উচ্চৈঃস্বরে কান্না জুড়ে দেয়।

অমিয় বিনয়ের মুখের দিকে তাকায়।

বিনয় বলে, এতো ভাল কথা নয়—এর মধ্যেই সুশীল তোমার ওপর জুলুমবাজি শুরু করে দিয়েছে? আচ্ছা ওকে শিক্ষা দেওয়ার পথ বাতলে দিচ্ছি আমি।

গৌরী কেঁদে কেঁদে বলে, আমার ছোট ছোট সব ভাই…।

তুমি এক কাজ কর, গৌরী, কানাইর রিকশায় চড়ে এখনি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যাও, তোমার বাপকে সঙ্গে তুলে নিয়ে তারপর থানায় যাও। গিয়ে নালিশ জানাও যে, সুশীল তোমার ওপর জবরদস্তি চালাচ্ছে। ও তোমাকে ফুসলে বিয়ে করেছে। আমরা সাক্ষী দেব। দেখবে বাছাধন ছ'টি বছর সাজা খেটে আসবে। ওঠো, যাও।

অমিয় সরে গিয়ে মুখে রুমাল চাপা দেয়। গৌরী ওঠে না।

দেখবে, পুলিশ এক এক কোড়া মারবে, আর ওকে রক্ত-দাস্ত করাবে। বুঝবে তখন মেয়েলোকের ওপর জুলুম করার কি মজা। যাও রিকশায় গিয়ে ওঠো।

গৌরী কান্না থামায়। উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু রিকশার কাছে যায় না।

বিনয়ের হাসি পাচ্ছে। তবু সে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে, তবে কি করতে চাও এখন? থানায় যদি না যাও, ওকে ছেড়ে দাও - ও কিছুতেই না গিয়ে পারবে না। অনেক দিন ওর মাকেও দেখেনি। ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। শুধু শুধু ট্রেন ফেল করিয়ে তুমি কেন অভিশাপের ভাগী হতে যাও? দু'টো কথা বলে বিদায় দাও, গৌরী। তারপর আদালত থেকে

এ-বিয়ে নাকচ করে দেব আমরা।

গৌরী কিছু বলে না।

এসো সুশীল—আর দেরী করা যায় না। কানাই, তুমি বাকশ বিছানা মাথায় তুলেছ কেন? গৌরী তো যাবে না।

কানাই প্রভৃতি বিষয়টাকে সত্য বলেই ধরে নেয়। কেবল মিস্ট্রেসরা অতি কষ্টে হাসি চেপে থাকে। সুশীল পুতুল নাচের পুতুলের মতো এগিয়ে যায় নিঃশব্দে রিকশার দিকে।

মিস্ট্রেসরা বলে, জেল ফাঁসি হলেও গাঁটছড়া খোলা যাবে না কোন মতে।

গৌরী এখন আর কোনো আপত্তি তোলে না। সে পায়ের ধুলো নেয় সকলের।

অমিয় বলে, সুখে থাকো—শুভ কাজে চোখের জল ফেলতে নেই। সক্ষম লোকের হাতে তোমাকে দিয়েছি, সেই তোমার বাপ ভায়ের দিকে দৃষ্টি দেবে। যতদিন তা না পারে, আমি তো রয়েছি। সুশীল এই টাকা কয়টা নে, চিঠিতে সব খুলে লিখিস—আমার যেন বুঝতে কষ্ট হয় না।

আচ্ছা বাবু, বলে সুশীল প্রণাম করে।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে সবাই বাইরে চলে আসে।

রাস্তার পাশে সেই ইটের জঞ্জাল। বহুদিনের সঞ্চিত আবর্জনা। অমিয় পাশ কাটিয়ে আসতে কেমন করে যেন ওর ওপর পা দেয়—দিয়েই চিৎকার করে ওঠে। উঃ কিসে যেন কামড়ে দিল আমাকে!

দূরের আলোতে ক্ষণিকের জন্য কি জানি চিকমিকিয়ে ওঠে।

অমিয় বলে, সাপ সাপ, ঘা দিয়েছে আমাকে।

সমস্ত পরিস্থিতিটা তুমুল ঝড়ের ঝাপটায় যেন এলোমেলো হয়ে যায়।

পঞ্চাশ

বিনয় ও সুশীল লাফিয়ে পড়ে রিকশা থেকে। অমিয়কে তুলে তাড়াতাড়ি বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকজন লাঠি-সোটা লণ্ঠন নিয়ে ইটের জঞ্জালটা তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কোথায় শত্রু? সে অদৃশ্য হয়েছে।

আমাকে আর বাঁচাতে পারবিনে,কাল কেউটে ঘা দিয়েছে, ভাই। উঃ জলে পুড়ে গেল রে। অমিয় ছটফট করতে থাকে। এ বাড়িটায় যখন প্রথম এসে ঢুকি, তখনই আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল। আমি আর বাঁচব না।

বিনয় তাড়াতাড়ি নিজের কাপড় ছিঁড়ে গোটা কয়েক বাঁধন দেয়, তুই

অমন করিসনে অমিয়—আমি তোকে কিছুতেই মরতে দেব না, তুই মরলে আমিও আর কলকাতা ফিরে যাব না।

প্রাথমিক একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ে বিনয় ছোটে ডাক্তারের জন্য কানাইকে নিয়ে। সুশীল ছোটে দীপাকে ডাকতে। আর বিয়ের সাজে গৌরী যায় ফুলের ইতিহাস-জানা বুড়োর উদ্দেশ্যে। অমিয়কে ঘিরে বসে থাকে অন্যান্য সবাই, একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে সকলের মুখে।

বিনয় চলে যাওয়ার পর দীপা সুস্থ হয়ে ঘুমোতে পারেনি, সে জীবনে ভালমন্দ আদ্যোপান্ত অনেক কিছু ভেবেছে। অঙ্ক কষে দেখেছে নানা রকম। কিন্তু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কিছুই যেন মিলতে চায় না। ব্ল্যাক বোর্ডে, শ্লেটে যা চমৎকার মেলে, জীবনে তা কেন যেন ভুল হয়ে যায়। একান্ত ইচ্ছা থাকলেও যেন সরে থাকে বাঞ্ছনীয় কামনার ফল। দীপা অনেক ভেবে, সবে একটু চোখ বুজেছে এমন সময় সুশীল এসে হাজির হয়।

দীপাদি, দীপাদি, সর্বনাশ হয়েছে, উঠুন—বাবুকে সাপে কেটেছে।

শয্যায় উঠে বসে দীপা। ক্ষণিকের জন্য কিছুই তার মাথায় ঢোকে না। সে যেন সরষে ফুল দেখছে। একটু সুস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে, সুশীল?

অমিয়বাবুকে সাপে দংশেছে।

বলো কি?

কোনো প্রকারে স্যাণ্ডেল জোড়া পায় ঢুকিয়ে সে আকুল হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামে। চলো, চলো, আর দাঁড়িও না—চলো। কেন বাসা বদল করতে গিয়েছিল ওঁরা।

সুশীল ভাবে, এ দেশে যে সাপ—এ দুর্ঘটনা যে কোন জায়গায়ই ঘটতে পারত। বাসা বদলে আর দোষ কি?

একেই বলে দুষ্ট নিয়তি। এখন ওদের কি উপায় হবে? ঐ সুন্দরী গৌরীটাই নিতান্ত অলক্ষুণে। ওর জন্যই এ-সব হয়েছে।

দূর থেকে দীপাকে আসতে দেখে সকলে সরে যায়।

দীপা যখন গিয়ে পৌঁছায় তখন অমিয়র বাক্‌শক্তি প্রায় রহিত হয়েছে। সে যা বলে শত চেষ্টা করেও দীপা বুঝতে পারে না। সে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

কি বলছেন অমিয়বাবু, আমি দীপা এসেছি।

অমিয় ইঙ্গিতে কি যেন বলতে চায় কিন্তু অর্থ বোঝা যায় না।

দীপা জিজ্ঞাসা করে, কেউ কি ডাক্তার ডাকতে গেছে?

অনিমা বলে, বিনয়বাবু নিজে গেছেন।

এখনো যে আসছেন না?

তা কি করে বলব? তিনি তো বসে থাকার মানুষ নন।

তা জানি, অনিমা, কিন্তু এখন আমাদের কি করা উচিত? এ দেশে তো এমন সাপে কাটা নতুন নয়, এদেশের লোক কি করে?

হয়ত ওঝা বৈদ্য ডাকে।

ওদের কাছে কি জিজ্ঞাসা করেছ? এই, শোন তো? তোমরা কি এমনি বসে থাকবে, কিছু করবে না? তোমাদের ভাই ব্রাদার হলে কি করতে?

ওঝা ডাকতাম, কিন্তু—একজন দেহাতি বলে, আপনারা সব লিখাপড়া লোক, বিশ্বাস যাবেন না—যাব, যাব। এখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সময় নয়, ওঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করাই প্রথম কর্তব্য। যাও, তোমার সন্ধানে যদি কোন ওঝা-বৈদ্য থেকে ডেকে আনা।

ঠিক সেই সময় গৌরী হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকে বুড়া বাবা! বুড়া বাবা।

একখানা ভাঙা ঘরের দুয়ার ঠেলে বেরিয়ে আসে বৃদ্ধ। সে দাঁতন এবং লোটা খুঁজছিল। কিরে গৌরী।

বড়বাবুকে সাপে কেটেছে, বাবা।

বুড়ো সজোরে একটা চড় বসিয়ে দেয় গৌরীকে। হামার সাথে দিল্লেগী, শালী। সে আরো গালাগালি কটুক্তি করে গৌরীকে। তারপর বিড় বিড় করতে করতে ছুটে চলে। চড়ের ধাক্কাটা সামলে গৌরীও যায় ওর পিছে পিছে। সে ওঝা বৈদ্যের চড়ের কথা অভিজ্ঞদের মুখে শুনেছে কিন্তু তা যে এত কড়া, তা সে জানত না।

বুড়ো অমিয়র কাছে পৌছে প্রদক্ষিণ করতে থাকে তাকে। শান্ত শিষ্ট এই মানুষটির চোখের দিকে তখন চাওয়া যায় না। যেন ভাঁটার আগুন জলছে।

বুড়ো সবাইকে গালি-মন্দ করে সরিয়ে দেয় রোগীর কাছ থেকে। মিস্ট্রেসরা যথেষ্ট বিরক্ত হয়। এ-সব অসভ্যতা তাদের রুচির বাইরে।

অমিয় প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। তার ক্ষতস্থানে একটা পাথর এবং শিকড় ছুঁইয়ে বুড়ো বলে, কোন ভয় নেই। রোগী ভাল হবে। কিন্তু একজন দুঃসাহসীকে মুখের মধু দিয়ে টেনে তুলতে হবে বিষ।

সুশীল ও গৌরী এগিয়ে যায়। প্রায় ঠেলাঠেলি পড়ে যায় ওদের মধ্যে।

ওদের ধমক দেয় বুড়া, তোরা ছুঁস নি। তোদের কাপড় মইলা। মা মনসা খাপ্পা হবে জবর। বিষ উঠবে মগজে।

এবার কে যাবে?

সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান স্বাস্থ্য ও জীবনের তর্ক ভুলে দীপা এগিয়ে যায়। সে

হাঁটু গেড়ে অমিয়র পায়ের কাছে বসে।

দেখি দাঁত তোমার?

দীপার বুক কাঁপে দুরু দুরু। এখন তাকে আবার বাতিল করে না দেয় বুড়ো, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে দীপার।

বুড়ো ভাল করে পরীক্ষা করে দীপার দাঁত ও মাড়ি। কোনো মন্ত্র তন্ত্র জড়ি-বুটিতেও কাজ হবে না। উপস্থিত সকলে মহা উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায় উদ্‌গ্রীব হয়ে বুড়োর শর্তগুলো শোনে। একজনের জন্য আর এক জনকে আবার শ্মশানে যেতে না হয়।

একটা তাম্রকুণ্ডে করে খানিকটা দুধ আনতে বলে বুড়ো। ওর মধ্যে বিষাক্ত রক্ত ছাড়তে হবে। কিছু সময়ের মধ্যে দুধ সংগ্রহ হয়। দীপাকে দেখায় এক স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্রহ্মচারীর মতো—সে এর মধ্যেই যেন জীবন-মরণের প্রশ্নের অতীত হয়ে গেছে।

দীপা বিষ টেনে টেনে তোলে। সকলে নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে।

দেখতে দেখতে তাম্রকুণ্ডের দুধ নীল হয়ে যায়। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ঠিক হয়ে আসতে থাকে অমিয়র।

বেলা প্রায় ন'টা। বিনয় ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসে। রাত থাকতে কলে বেরিয়েছিল ডাক্তার, তাই এত দেরী। বিনয় হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে, খবর কি? কেমন আছে অমিয়?

দীপা বলে, একটু ভাল। ওঝা বুড়ো জীবন রক্ষা করেছে।

সত্যি? ঈশ্বরের কি ইচ্ছা দেখুন, ডাক্তারবাবুর—আপনার কল থেকে ফিরতে দেরি হল, আর একজন গুণীকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

ওঝাটি কে, দীপাদেবী? তাকে ডেকেই বা আনল কে?

অমিয়র কাছে ছিল দীপা। সে সংক্ষেপে সব বলে।

বিনয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে ধন্যবাদ জানায় বুড়োকে।

ডাক্তারবাবু মন্তব্য করেন, হয়ত আদৌ বিষাক্ত সাপ নয়।

দীপা প্রতিবাদ করে, তাম্রকুণ্ডে দুধ রয়েছে, পরীক্ষা করে দেখুন। দেহাতি মানুষের ভিতর যদি সুপ্ত কোনো ঐশ্বর্য থেকে ওষুধপত্র ব্যবহার করে তা দেশজ হলেও কিছুতেই অবৈজ্ঞানিক নয়।

তাহলে আর আমাদের ডাকেন কেন?

ওদের চেয়ে আমাদের চোখে আপনারা অনেক শ্রদ্ধেয় কিন্তু এখনো দুষ্প্রাপ্য। তাই ভালো করে তোলার ভারটা অন্তত নিন। বসুন, আপনার আরজেণ্ট ভিজিট আমরা দেবই।

ডাক্তারবাবু অমনি অমিয়র কাছে বসে পড়ে স্টেথিসকোপটা বার করতে করতে করতে বলেন, আপনি কিছু মনে করবেন না। ছুঁরি-কাঁচিতে আমার যতটা বিশ্বাস, ঈশ্বরের ওপর তার চেয়ে কম নয়। কারণ আমাদের সায়েন্স্ এখনো নলেজের ত্রি-সীমানায় পৌঁছতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। তবে কি জানেন, এ-সব প্রায়ই মিথ্যা এবং আজগুবি হয়, তাই আমি ও-সব বলছিলাম, দ্রব্যগুণে আমিও বিশ্বাস করি। অনেক ভাল জিনিস রিসার্চের অভাবে কুভ কর্মে নষ্ট হল।

ডাক্তারবাবুর অল্প বয়স। যত্ন করেই অমিয়কে পরীক্ষা করেন। তিনি পায়ের ঘা-টা সম্বন্ধে যা যা করণীয় একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তা বলে দেন। উপদেশ দেন খাওয়া দাওয়ার বিষয়। একটা ইনজেকসন দিয়ে লিখে দেন ওষুধের ব্যবস্থাপত্র। কোন চিন্তা করবেন না। সাতদিনের মধ্যে সুস্থ সবল মানুষ হয়ে দাঁড়াবেন। এ বাড়েও যেমন ধাঁ করে, কমেও তেমনি চট করে, অবিশ্যি নিয়তি যদি বিরূপ না থাকে—নমস্কার।

দীপা হাত জোড় করে। বড় প্রীত হলাম আপনার ব্যবহারে।

বিনয় একটা অনুমান ক'রে ডবলপ্রমাণ ভিজিটের টাকা এগিয়ে দেয়, এই নিন, ধরুন ডাক্তারবাবু।

ক্ষমা করুন, এ চিকিৎসায় আমি ভিজিট নেই নে।

কেন, ডাক্তারবাবু? কেন? দীপা জিজ্ঞাসা করে, আপনি নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হয়েছেন আমার ওপর।

না—সে আর শুনে কি করবেন, আমার স্ত্রী মারা গেছেন সর্পাঘাতে। সেই থেকেই আমার এ দুর্বলতা, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না। অনেক ওঝা বৈদ্য ডাক্তার কবিরাজ নাকি এসেছিল। কিছুতেই কিছু হয়নি। একটা নিঃশ্বাস চেপে ডাক্তারবাবু চলে যান।

একান্ন

বিনয় চলে যাওয়ার পর যেন সিনেমার গতিশীল অভিনয় হঠাৎ সমাপ্তির দিকে এগিয়ে এসেছে। বিচ্ছেদের পূর্ণচ্ছায়া পড়েছে দর্শকের মনে। তাই কমে গেছে মিস্টেসদের কলরব। যত তাড়াতাড়ি অমিয়র ভাল হয়ে ওঠার কথা ছিল, তার চেয়ে অনেক দ্রুত সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। সুশীল, গৌরী এমন কি মাহাত্তোর ব্যবস্থা হয়েছে চমৎকার। তবু যেন ভাঙনের ছায়া দীপার সংসারে ডানা মেলেছে। দীপা বুঝেছে এবারের মতো পিক্‌নিক্ শেষ।

সব জেনে শুনেও এখনো কিছু স্থির করতে পারেনি। মনের শোয়েটারের ঘরগুলো কেবলই উলটার বেলা সিধা, সিধার বেলা উলটা বুনে চলেছে। বিনয়ের অনুরোধ বার বার এসে তার অনুমোদন ভিক্ষা করছে।

অমিয়র কিন্তু তা হয়নি। সে জানে, বিনয় নিশ্চয়ই ছুটি মঞ্জুর করাবে। সে হুট করেই একদিন এসে উপস্থিত হবে, যেমন সে চলে গেছে। তাই অমিয় দীপার সেবাযত্নআপ্যায়নে ভরপুর। ভাঙনের কোনো ফাটল আপাতত তার চোখে পড়ছে না। চিন্তা ছিল গৌরীর জন্য, তাকে তো সে ভাল করেই প্রতিষ্ঠা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সুশীলটারও একটা ব্যবস্থা হয়েছে। গৌরী এবং সুশীল অহরহ আসা-যাওয়া করছে। দিলরুবা কেবিন এই বাংলোটারই যেন অবিচ্ছিন্ন একটা অংশ। বৃহৎ পরিবারের অমিয় যেন কর্তা আর দীপা যেন এক অনন্যরূপা গৃহকর্ত্রী। দুজনেরই একটু বয়স হয়েছে তাই দুজনেরই স্থির গম্ভীর। পরস্পরের ওপর একান্ত আস্থাশীল। দীপাকে পাওয়া না-পাওয়ার প্রশ্নের অনেক আগেই যেন জবাব দিয়ে এসেছে অমিয়।

এইমাত্র সুশীল ট্রেনিং থেকে ফিরেছে সেদিন—

অমিয় জিজ্ঞাসা করে, আজো কি তোমায় স্টিয়ারিং একবারও ছুঁতে দেয়নি?

সুশীল ক্ষুব্ধ গলায় জবাব দেয়, না বাবু। বলে যে চুপ করে সাতদিন বসে দেখ, বেশি তেড়ি-বেড়ি করলে থাপ্পর খাবি। ষণ্ডামার্কা এক বেটা ট্রেনিং মাস্টার।

মার না খেয়ে ওর কথা মতোই তো চলা ভাল।

দীপা একটা পুলওভার বুনছিল, হাত থামিয়ে প্রশ্ন করে, তুমি কি চাকা ধুতে শিখেছ যে স্টিয়ারিংয়ে হাত দিতে সাহস করছ? ড্রাইভারি শেখা অত সহজ নয়। হাঁটতে না শিখে একেবারে ছোটা যায় না।

গৌরী খিল খিল করে হেসে ওঠে।

অমিয় প্রশ্ন করে, তুই বুঝি ওকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারিস নে? দোকান-পাট ফেলে ছুটে এসেছিস? এমন করলে কি ব্যবসা থাকবে?

আপনি যে-ক'দিন, সে-ক'দিন আমাকে কেউ দোকানে বেঁধে রাখতে পারবে না চব্বিশ ঘণ্টা।

সকালবেলা তো একবার এসেছিলি।

এখন তো রাত্তির হয়েছে।

দীপা বলে, ওর সঙ্গে কথায় পারবেন না। ওর উদ্দেশ্য ভিন্ন, কিন্তু তা ধরতে দেবে না।

গৌরী, একথা সত্যি? বাঙালি ঠগবাজ, কিন্তু তুইও কি তা হ'লি?

লজ্জায় গৌরী উঠে যায়।

অমিয় এবং দীপা হু'জনে হু'জনের দিকে মৃদু হাস্যে চেয়ে থাকে।

পিকনিক শেষ হয়ে এলেও দীপা ওর ভিতর থেকে একটু রস সঞ্চয় করে—আঁখের ছিবড়ে হলেও সে একবার দাঁত দিয়ে ভাল করে মাড়িয়ে নেয়। আস্বাদ আছে নতুনতর।

আরো হু'টো দিন ঘুরে যায়। অমিয় পোস্টঅফিস থেকে এইমাত্র ঘুরে এসেছে।

আজো তো কোনো চিঠি-পত্র এল না বিনয়ের। বোধহয় কাল সশরীরে এসে পৌছোবে।

এ ডিজাইনটা কেমন হচ্ছে, অমিয়বাবু? একটিবার দেখুন তো।

সুন্দর হচ্ছে। কার জন্য বুনছেন? আমাকে যদি দিতেন!

নেবেন, নেবেন—এর জন্য এত কাঙালপনা কেন? আপনার জন্যই তো বুনছি। বিনয়ের বিষয় দীপা কিছু আর বলে না। কারণ যে বিশ্বাস নিয়ে অমিয় রয়েছে, তাতে দীপার মোটে আস্থা নেই।

অমিয় তাড়াতাড়ি একটা প্যাকেট খুলে বলে, দেখুন তো জিনিসটা কেমন হয়েছে? এ ডিজাইনটা কি আপনার পছন্দ হবে।

একেবারে আপ-টু ডেট ফ্যাশান—অত বড় লকেটটার সঙ্গে একগাছা চেইন। অত্যন্ত কনট্রাস্ট, কিন্তু বড় মানানসই।

একটু অপেক্ষা করে অমিয় বলে, কই, আপনি তো আমার মতো চেয়ে নিতে পারলেন না? আপনার বোধহয় পছন্দ হয়নি।

হয়েছে কিন্তু—

কিন্তু কেন দীপাদেবী? আমি পরিয়ে দেব, ভাবছি, আপনার গলাটা একেবারে খালি।

এখন নয়, বাংলো শুদ্ধু মিস্ট্রেসরা কি বলবে?

অমিয়র স্বপ্ন ভেঙে যায়, সত্যই তো—ওদের মধ্যে এমন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি যে অমিয় অবলীলাক্রমে এক ছড়া সোনার হার পরিয়ে দিতে পারে দীপাকে। সেবা-শুশ্রূষা প্রীতির ভিতর দিয়ে যে-দীপা সান্নিধ্যে এসেছে, তাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরা চলে না। এ যেন মানব মনের রেডক্রশ সোসাইটি -যুদ্ধ ফুরিয়েছে, আহত সুস্থ হয়েছে—অমনি বিদায় দিয়ে দিচ্ছে স্নেহময়ী কল্যাণময়ী নার্স।

কর্তব্য শেষ হয়েছে দীপার। এবার অমিয়র নজরে পড়ে ডাক্তারের ফাটল। মনে পড়ে জন্মপত্রির অন্তরায়। এ বৃহৎ পরিবার বাস্তব সত্য হলেও একান্ত

সত্য নয়। দীপা ওর কেউ নয়।

তবু ভাল লাগে দীপাকে। ভাল লাগে তার নখ থেকে গালের টোলটি পর্যন্ত। এই আদিম অনুভূতি এ ক'দিন কাছাকাছি ঘেঁষা-ঘেঁষি থেকে যেন বেড়েছে। অমিয় মরেছে। হয়ত সে এক সময় বলে ফেলবে তার জন্মকাহিনী। হতে পারে সে সমাজের চোখে পঙ্গু, তার কি গিরিলঙ্ঘনের স্বাদ কখনো মিটবে না?

কি ভাবছেন অমন ভ্রূ কুঁচকে? দুঃখিত হলেন বুঝি?

এই তো পরম মুহূর্ত, এবার অমিয় বলে ফেলবে, সে গলা পরিষ্কার করে, একবার ভাল করে চারিদিক চেয়ে নেয়, আপনি কি কখন...

ব্যস্ত হবেন না, অমিয়বাবু, সময় মতো আমি আপনার হাতেই পরব ও-হার। আজ ওষুধের শেষ মাত্রাটুকু খেয়ে নিন। গ্লাসে জল আনবে বলে দীপা দাঁড়ায়।

ওর আর দরকার ছিল না।

তবু খেয়ে নিন। ফেলে দেবেন কেন পয়সার ওষুধ।

সব ওলোটপালট হয়ে যায়, বিস্বাদ ওষুধই তখনকার মতো প্রাধান্য লাভ করে, এত করে বলতে গিয়ে আসল কথাটাই চাপা পড়ে থাকে।

দীপা বাইরে বেরিয়ে যায়, অনেকক্ষণ ধরে বাংলোর বারান্দায় পায়চারী করে। অমিয় বুঝতে পারে, দীপার ভিতরও একটা আলোড়ন চলছে। সে ধাক্কাই সে যেন সামলাচ্ছে অতি কষ্টে। অমিয় নিজেকে নিজে ধিক্কার দেয়। কেন সে এতটা দুর্বলতা প্রকাশ করতে গেল। উপহার দিতে গেলে তা তো অতি সাধারণভাবেই দেওয়া যেত।

অমিয় একা একা প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে সিগারেট টানে। লঘু পদক্ষেপ শোনে দীপার। কখন যেন গানের শেষকলির মতো মিলিয়ে যায়। তবু মনে হয়, দীপা আসবে—এখুনি না হলেও একটু পরে। সে শান্ত সমাহিত হয়ে ফিরবে।

কিন্তু দীপা ফেরে না। অফুরন্ত আগ্রহের অঞ্জলি নিয়ে অমিয় বসে থাকে। সন্ধ্যা আসে, রাত বাড়ে তবু দীপা ফেরে না।

গৌরী!

আজ্ঞে বাবু।

দীপাদেবী কোথায়?

অনেকদিন রান্নাঘরে জাননি—সেখানে গিয়ে তত্ত্বিরতালাশ করছেন।

তাই নাকি? চুপ করে থাকা ওর ধাতে সয় না। অমিয় সিগারেটের

একটা নকশি-মাটির ট্রেতে ঝেড়ে জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁরে, তোর বাবা এখন কি বলে ?

এমন বন্দোবস্ত মতো চললে সে দু'বছরে মেয়ে জামাইর নামে বাড়ি করবে।

তার নাতির কথা বলে না ?

জানিনে বাবু। গৌরী চলে যায়।

আরে শোন, শোন, গভীর স্নেহে অমিয় ডাকতে থাকে।

গৌরী চলে গেলে কি যেন কি ভেবে অমিয় পুলওভারটা তুলে দেখে—এখনো বাকি।

সে দিন অনেক রাত পর্যন্ত দীপার বাতায়নে আলো জ্বলে।

যতবার অমিয়র ঘুম ভাঙে, ততবার সে চেয়ে দেখে, দীপা একাগ্র মনে হাত চালিয়ে যাচ্ছে। সকাল বেলাও বিছানা থেকে উঠে অমিয় লক্ষ্য করে, দীপা তেমনি ব্যস্ত। সারা দিনটা তার একই ভাবে কেটে যায়।

বিকালের দিকে অমিয় অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞাসা করে, আপনার কি হল ? একটু কথা বলবেন না ?

জবাব দেওয়ার আগেই পিওন কড়া নাড়ে।

ঐ বুঝি বিনয়ের চিঠি। অমিয় দোর খুলে দেয়।

দীপা হাঁপ ছেড়ে বলে, যাক, আর সামান্য একটু বাকি।

পিওন ভিতর দিকে এগিয়ে আসে। দীপাদেবীর চিঠি।

সেক্রেটারী লিখেছেন, দীপার মুখ শুকিয়ে যায়।

অমিয় জিজ্ঞাসা করে, কি আদেশ।

চিঠিখানা পড়া শেষ করে দীপা বলে, আজ রাত্রেই রওনা হয়ে যেতে হবে। কাল সকালেই তাঁর সঙ্গে দেখা করা চাই—কমিটির মিটিং।

মিস্ট্রেসরা বলে, তাহলে তো দেরী করে সময় নষ্ট করার উপায় নেই।

না—এখনি একখানা রিকশা ডাকতে হবে। আমি কিছু খেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এর মধ্যে কি রান্না চাপিয়েছে।

বাহান্ন

গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দীপা আজ আর জানলা ছাড়তে পারে না। সমস্ত আঁধার দিগন্ত যেন অমিয়ময় হয়ে রয়েছে। তার নিজের সত্তা, ট্রেনের বাস্তবতা সব যেন হারিয়ে গেছে এক মহাপ্লাবনে। সে প্লাবন এনেছে অমিয়, ঢেউয়ে ঢেউয়ে পুঞ্জে পুঞ্জে যেন আবেগ ঝলক। খোকাবাবুর অল্প-

মধুমনী দুর্বলতা, নিজের রক্তে রক্তে মিলিয়ে নেওয়ার সেই যে গভীর আকাঙ্ক্ষা—সব অধিকার কখন যেন অমিয় দাবি করে নিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে নারীর এক দুর্বল মুহূর্তে তার সমস্ত স্বাধিকার।

দীপা কতটুকুই বা দিয়েছে। ওকটু শুধু মাথা হেলিয়ে রেখেছিল বুকে—এই সুদীর্ঘ জীবনপঞ্জির মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। অমিয় একবার তার অধর দুটি অধরে স্পর্শ করেছিল, কোনো সম্বিত তখন দীপার ছিল না। স্বাদে শান্তিতে তার যেন চোখের পাতা বুজে আসছে। অনেকদিন বাদে তার যেন বড্ড ঘুম পেয়েছে। রিমঝিম করছে দেহমন।

সে বিছানাটা বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালবেলা সেক্রেটারীর সঙ্গে যথা নিয়মিত সাক্ষাৎ।

এসেছেন, বসুন, বসুন—একটা হাতের কাজ শেষ করে নি। আর বলেন কেন, আজ এমন একটা জরুরি পবিত্র অনুষ্ঠান তবু আমার রেহাই নেই। দিস ইজ পাবলিক লাইফ।

কিছু সময় বাদে মক্কেলরা বিদায় হয় দীপা ধীরে ধীরে গিয়ে ভিতরে ঢোকে।

বসুন আপনি কি চা খেয়েছেন?

খেয়েছি।

তবু আপনি একটু খেলে সেই উপলক্ষ্যে আমার খাওয়া হয়। আজ তাড়াতাড়িই সব ঝামেলা বিদায় করেছি। উকিলবাবু নথিপত্র গুছিয়ে রাখেন।

চা আসে দু'কাপ।

উকিলবাবু দীপার দিকে এক কাপ এগিয়ে দিয়ে অন্যটা নিজে তুলে নেন। আজ আমার স্বর্গত পিতার মৃত্যুতিথি। কিন্তু জন্মতিথি হলেই ভাল ছিল। উকিলবাবু একটু দৃষ্টিকটুভাবেই দীপার দিকে ঝুঁকে আসেন।

দীপা মুখে কিছু বলে না। সামনে সরে আসে চেয়ারটা ঠেলে।

উকিলবাবু আরম্ভ করেন, যখন জন্মতিথি হবে না, তখন উপায় কি? মৃত্যুতিথিতে তাঁর আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাতে চাই। এবং তিনি যে এদেশের কল্যাণে কত দূর আত্মত্যাগ করেছিলেন তাই হবে আলোচনার বিষয়। আপনি একজন শিক্ষিতা মহিলা—বিশেষ করে একজন শিক্ষিকা, আমি আশা করি আপনি কিছু বলবেন। আপনার কথার মূল্য আলাদা।

দীপা মহা সংকুচিত হয়ে বলে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনে।

আমি সব লিস্ট করে দেব, আপনি মৌখিক পরীক্ষার মতো বলে যাবেন—

এটুকু আর পারবেন না? মানুষ মরে গেলে তার যশ এবং কীর্তিই বেঁচে থাকে। তা একটু বাড়াবাড়ি করে বলার লাইসেন্স আছে। আপনি ফুল মার্কস পাবেন—ঘাবড়াবেন না। ও কি, চা ঠাণ্ডা করে ফেললেন যে?

উকিলবাবু নিজের কাপটায় গোটাকতক চুমুক দিয়ে বলেন, সভাপতি শ্রীযুক্ত মুকুল মহান্তি এম. পি প্রধান অতিথি একাদশী খাঁ, কয়েকজন এম. এল. এ. আছেন বক্তা।

একাদশী খাঁ তো আপনার পরম শত্রু।

শত্রুকেই তো বড় আসন দিতে হয়। এ সংসারে এ আপনি বুঝলেন না?

আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের বুদ্ধি শিক্ষা—এসব বুঝব কি করে?

আমার কাছে শিখে নিন। তুষের জঞ্জালেও মুক্তা থাকে। একাদশী শত্রু হলেও তাকে দুটো কারণে তুষ্ট করেছি। এক, মিটিংটা হল গণতন্ত্রসম্মত—এদেশের উভয় পক্ষ উপস্থিত। দ্বিতীয়, ওকে তোয়াজ না করলে হয়ত ফ্ল্যাগ নিয়েই বার হত। অতি বড় হৃদয়হীন হলেও মৃত্যুতিথিতে এসে আর দু'টো মন্দ কথা বলে যেতে পারে না।

দীপা মন্তব্য করে, সে-কথা ঠিক। এবং তিনি যখন প্রধান অতিথি।

সভার শেষে আমি নিজে ব্যয়ে ইস্কুলঘর তুলে দেওয়ার প্রপোজাল দেব। তখন আর কারুর কিছু বলবার থাকবে না। আর বলবেই বা কি, এর ভিতর এক ফোঁটাও তো ভেজাল নেই। তারপর আপনার পার্ট।

আমি কি করব?

এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? ইস্কুলটি যাতে বাবার নামে হয় আপনি সেই প্রস্তাব করবেন—এই তো আপনার সঙ্গে কথা ছিল।

হ্যাঁ, ক্ষমা করবেন। মনে পড়েছে। কিন্তু আমাকে যে জন্য ডাকা—কমিটির মিটিং?

এ-সব বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য তা চাপা দিয়ে রেখেছি। আপনি হচ্ছেন কেন? এ কাজ কি আপনার নয়? এখন থেকেই যদি ব্যস্ত আপনারা আপাকে মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ড করতে থাকেন, সে দুঃখ যে রাখবার ঠাঁই নেই।

ছিঃ ছিঃ আপনি এ সব বলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। আমার পূর্ণ সমর্থন আছে এসব সৎকাজে।

মিটিং ছটায়—রথতলায়। এই নিন যে লিস্টটা দেব বলেছিলাম, সেইটা। আপনি, ভোটমাইও—একটু সেজেগুজে আগেভাগেই আসবেন। সম্ভ্রান্ত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার মতো আর একটিও বিদুষী মহিলা নেই এ

অঞ্চলে, একেবারে মূর্খের দেশ একটা।

তলিয়ে দেখলে সব দেশের অবস্থা—এদের মিছিমিছিই দোষারোপ করা। আশৈশব তো পল্লীঅঞ্চলে কাটিয়ে এসেছি।

একাদশী খাঁ এসে উপস্থিত হয়েছেন গৈরিক খদ্দরের জামা পরে। তার গায়ের রঙ আবলুস-চকচকে হলেও আজ চোখ ঝলসায় সকলকে। তিনি যথারীতি বিনয়ের সঙ্গে দীপার পাশটিতে এসে বসে পড়েন। দীপা একটু সংকুচিত এবং খানিকটা বিব্রত হয়। আশেপাশেও আর জায়গা নেই। চারিদিকে গণ্যমান্য অতিথি।

উকিলবাবু সমস্তই লক্ষ্য করেন। তিনি এক্ষেত্রে পুলিশ সুপার নন যে একটা কিছু সাংঘাতিক এ্যাকশন নেবেন। তাঁকে চুপ করেই সব সহ্য করতে হয়।

সভা আরম্ভ হয় নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই। তবু অনেক লোক হয়েছে। গ্রামাঞ্চল থেকে স্ত্রী-পুরুষ এসেছে নানাবিধ সরকারী দাতব্যর আশায়। কারণ মিটিংয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রায় বার আনা লোক অজ্ঞ। সব কিছু জানলে এবং বুঝলে হয়ত অনেকেই আসত না। তারা শিক্ষার চাইতে খেতে চায়। চাষ-আবাদের বীজ, গরু-বাছুরের দানাপানির ব্যবস্থা চায়।

বক্তারা সকলেই যেন এক একটি বার্ক—চমৎকার বলেন, কেউ বা রসিয়ে কেউ বা হাসিয়ে। কাঁদিয়ে ছাড়েন একাদশী।

সে এক গভীর দুর্দিন, যখন একাদশীর বাবা সামান্য একজন পুলিশ কনস্টেবল, আর উকিলবাবুর পিতা অতি তুচ্ছ একজন হোমিওপ্যাথ। কিন্তু কি যে প্রণয় ছিল দু'জনার মধ্যে। দু'জনেই বাড়তে থাকলে সমান তালে। তারপর বিপুল ঐশ্বর্য—তিলে তিলে দেশ সেবা। খাটতে খাটতে অকাল বার্ধক্য—পরিণামে দু'জনার স্বর্গধামে মাত্র ষাটের কোঠায় পা দিয়েই গমন। তাঁরা আরো বাঁচতে পারতেন। আসুন, সকলে একত্র হয়ে আমরা তাঁদের সেই অল্প বাঁচাটা বাঁচিয়ে রাখি। একাদশী থামেন একটু।

উকিলবাবু ভাবেন, একি সর্বনেশে কাণ্ড। এক্ষুনি হয়ত প্রস্তাব করে বসবেন যৌথ স্মৃতি রক্ষার এই ইস্কুলটির মাধ্যমে।

উকিলবাবু একটু চোখের টিপ দেন সভাপতিকে। সভাপতি মুকুল মহান্তি একটু নখের চিমটি কাটেন একাদশী খাঁকে। আপনি পয়েন্ট হারিয়ে ফেলেছেন।

একাদশী ঘাবড়াবার মতো ব্যক্তি নন। তিনি মাইক টেনে বলতে শুরু

করেন আবার, আসুন, আমরা তাঁদের দু'বন্ধুর অল্প আয়ুকে চিরায়ু করে রাখি ডাক্তারবাবুর ফটোতে মালা পরিয়ে—শ্রদ্ধা জানিয়ে। বন্ধুর বাগানের গোলাপ বন্ধুর গলায়ই শোভা পায়।

করতালি পড়ে সহস্র : ধন্য ধন্য।

উকিলবাবুর ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি থেমে যায়। তিনি আর দেরী না করে প্রস্তাব করেন দানের। এই রথতলায়ই ইস্কুল পত্তন হবে তাঁর টাকায়।

এবার দীপার পালা। সে থতমত খেয়ে যায়। উকিলবাবু দাঁত খিঁচিয়ে ওঠার উপক্রম করেন।

অতি কষ্টে দীপা বলে, এ দান আমরা সাধারণের পক্ষ থেকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করছি। উভয় মহাত্মার স্মৃতি রক্ষা হবে, যদি উকিলবাবুর টাকায় উকিলবাবুর পিতার প্রথম স্মৃতিরক্ষা হয়। অর্থাৎ এ ইস্কুলটি যদি তাঁর পিতার নামে হয়, শ্রীযুক্ত ঝাঁও তাঁর পিতার স্মৃতির জন্য সচেতন হবেন।

সামগ্রিক জয় হয় উকিলবাবুর।

শুধু সভা অন্তে মন মরা হয়ে ফিরে যায় সাধারণ জনতার সঙ্গে দীপা। কি যেন তার মনের তলায় খচখচ করে বিঁধছে।

আর একাদশী ঝাঁকে মনে হয় একটু ভাগাটে – মানে ফ্যাকাশে।

তিপ্পান্ন

পরদিন সকাল থেকে দীপা মুহূর্তকাল বিশ্রাম পায় না। রথতলায় একখানা পুরানো জীর্ণ ঘর আছে লম্বা ধরনের, তা মেরামত করতে হবে। মজুর মিস্ত্রীর হিসাব রাখা, ত্রুটি বিচ্যুতির সুপারভিসন করা—সমস্তই হেড মিস্ট্রেসের কাঁধে, উকিলবাবু জনহিতে পয়সা ব্যয় করছেন আর তিনি কিছু জানেন না। তবে যখনই টাকার দরকার প্রশ্ন করেন, ঘোরান তাঁর ইচ্ছামত।

সকলের মুখ চেয়ে দীপা দাঁতে দাঁত দিয়ে কাজ করে যায়, একবার গড়ে তুলতে পারলে আর এত ঝামেলা থাকবে না। প্রথম প্রথম শ্বশুর বাড়ি গিয়ে তো মেয়েদের কত কষ্ট হয়।

এর মধ্যেও সময় করে দীপা চিঠি লেখে।

অমিয় উত্তর দেয়—প্রতি চিঠিতেই কমন প্রশ্ন করে আসছেন, জানতে পারি কি?

দীপা নিজেই জানে না। জানেন সেক্রেটারী। মনে মনে হেসে দীপা বলে, এবার তাঁর কাছে একখানা চিঠি লিখে উত্তর আদায় করে নিতে উপদেশ

দেবে অমিয়কে।

দীপা মনে মনে জবাব দেয়, ওস্তাদ কারিগরের কাছে অমনি আরো হাজারো রকম পছন্দসই জিনিস আছে কিন্তু তা পেতে হলে নিষ্ঠা সাধনা এবং ধৈর্য চাই।

অমিয়র কি তা আছে?

আছে, আছে, আছে,। এবার সে পরীক্ষায় অনার্স পেয়েছে,। দীপা মুগ্ধ হয়ে নম্বর দিয়েছে।

একদিন সন্ধ্যার পর সেক্রেটারী বলেন, আপনার যেমন বিশ্রাম নেই, আমারও তেমনি। তবে ঘর এবং ফার্নিচারের ঝামেলা শেষ হয়ে আপনার একটু সুবিধা হয়েছে, কিন্তু আমার চিন্তা শত গুণ বেড়েছে।

আবার ঝাঁ মশাই কি—

না না তা নয়, তিনি মনে মনে সব বুঝেছেন বটে কিন্তু এখনো মুখ খোলেন নি।

তবে?

ইস্কুল খুলেই আর ছাত্র বেতন পাওয়া যাবে না। অন্তত দু'মাস আমাকে চালাতে হবে সমস্ত খরচ। সে এক বিরাট ব্যাপার, ভেবেই কূল পাচ্ছি নে। এবার আমার যখন পিতৃশ্রাদ্ধ তখন অন্য কেউ একটি পয়সাও দেবে না। সে কথা সত্যি, এখন কি করা উচিত?

ব্যয়সংকোচ। যুদ্ধের সময় দেখেন নি যে এক টুকরো বাজে কাগজও ফেলা হয় নি। শুনেছি জার্মানিতে নাকি একটা পোড়া দেশলাইর কাঠি পর্যন্ত জমিয়েছে। তবেই না যুদ্ধ। আমার ঠিক ততখানি করতে হবে না, শুধু দু'জন মিসট্রেস তুলে দিলেই হল, আপনি একটু কষ্ট করুন—তা হলেই আমিও পেরে যাব। দেখুন, দিজ পাবলিক লাইফ আই হেট ইট।

মাথাটা বন বন করে ঘুরে যায় দীপার। সে কিছু বুঝতে পারে না।

বুঝতে পারছি অতগুলো ক্লাস আপনার ম্যানেজ করতে কষ্ট হবে কম স্টাফ নিয়ে, কিন্তু উপায় কি? গড়ার মুখে সকলেই একটু পরিশ্রম করতে হবে।

সে কথা ভাবছিনে। ভাবছি কাকে তুলে দেব? সকলকেই তো আশা করে রয়েছে। সকলের বাড়ির অবস্থাই তো এক রকম।

যে দু'জন সব চেয়ে ইনএফিশিয়েন্ট, তাদের নোটিস দিয়ে দেবেন। এখানে কোনো সেন্টিমেন্টের প্রশ্ন নেই।

কিন্তু সে দু'জন কে— কাদের আমি ভাত মারতে যাব?

তা আমি কি করে জানব? আপনি হচ্ছেন হেড অফ দি ইনস্টিটিউশন।

ক্ষমা করুন, আমি এ সব পারব না, দীপাদেবী, আপনি একটি প্রতিষ্ঠানের মাথা, আপনার হৃদয়ের বালাই নিয়ে কাজ করা চলবে না। আপনি শুধু একটা রিটেন রিপোর্ট দিন, নোটিস-ফোটিস কমিটি সার্ভ করবে। আপনার কাছে কাঁদতে গেলে বলবেন, আমি কি করব ভাই! ইস্কুলটি যদি আদৌ দাঁড়াতে না পারে, তা হলে যে ভাত মারা যাবে সকলের।

মিস্ট্রেসদের সুকুমার মুখগুলি মনে পড়ে দীপার। জীবনে তার এমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি আর কখনো। যেন তার সোনার সংসার কে জোর করে ভেঙে দিতে চাইছে। সে কিছুতেই পারবে না নিজের দু'খানা পাঁজরার হাড় ভেঙে দিতে। কারুর বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, অসম্ভব।

একটা কাজ করলে হয় না?

কি বলুন? যুক্তিসঙ্গত হলে অবশ্যই তা মেনে নেওয়া হবে। কমিটি হৃদয়হীন নয়।

আমরা যদি সবাই মিলে দু'টো মাসের মাইনে কেটে দি, অথবা মাসিক বেতনের হার কিছু কম নি, তা হলে তো সব দিক ম্যানেজ হয়ে যায়। কারুকে ছাঁটাই করার দরকার হয় না আপাতত।

ভেবেছেন কি, এ-সব প্ল্যান এ পাকা মাথাটায় নেই? ও স্যাক্রিফাইজ তো সবাইকে করতে হবে—তবু দু'জনকে না কমালে স্কুল বাঁচে না ইনস্টিটিউশনের দীর্ঘায়ুর চাইতে বড় সেন্টিমেন্ট আমার নেই।

আবার আলাপে ব্যবহারে—স্নেহে—বাচালতায় – নির্ভয়ে ভেজা মুখগুলো মনে পড়ে দীপার। কোন্ দু'জনার ওপর সে খড়্গ ধরবে? সে স্পষ্ট জবাব দেয়, আমার দ্বারা কিছু লিখে দেওয়া সম্ভব হবে না।

সেক্রেটারী বলেন, আপনি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছেন, নিজের ভবিষ্যত বুঝতে পারছেন না। একদিন এ স্কুল এ্যাফিলিয়েটেড হবে—চাই কি কলেজ হয়ে যেতে পারে। তখনকার বেতন ভাতা নিরাপত্তা আপনি কল্পনা করতে পারছেন না।

আমাকে মাপ করুন, সে উন্নতি আমি চাইনে।

এই দেখুন আয়ব্যয়— সেক্রেটারী একটু নরম গলায় বলেন, সব দিক বিবেচনা করে বলুন তো আমি এখন কি করি? বলতে চান আমি কি মানুষ নই?

দীপা জবাব দেয়, আমি কিছু বলতে চাইনে—হিসাব দেখারও আমার কোনো দরকার নেই। অনুগ্রহ করে এক টুকরো কাগজ দিন, আমি রেজিগনেশন দিয়ে যাচ্ছি।

বসুন, বসুন অত উত্তেজিত হবেন না। আপনার মতো একজন দক্ষ গ্রাজুয়েটকে কি অত সহজে ছেড়ে দিতে পারি?

দীপা তবু একখানা কাগজ টেনে নিয়ে খচখচ করে লিখে চলে।

এবার উকিলবাবু যেন একান্ত সরলভাবেই বলেন, আপনি হয়ত দেখতে পাচ্ছেন এই ইস্কুলের পিছনে আমার একটা উদ্দেশ্য খাড়া রয়েছে—ভাট মিনস্ পারপাস। কিন্তু এমন যে বড় বড় সন্ন্যাসীদের মিশনগুলোর দিকে একটিবার নজর দেখুন—পর্দার আড়ালে কোথায় না রয়েছে পারপাস? আমি সন্ন্যাসী নই, আমার পক্ষে ভোগ-বাসনা-উন্নতি কিছুই ত্যাগ করা সম্ভব নয়,—তাই যেখানে আমি সেখানেই ওয়ার্ক করবে পারপাস। তার জন্য সময়েতে কঠিন হতে হবে, এ কাঠামোতে এ ছাড়া গতি নেই। অনুগ্রহ করে আপনি চাকরিটা ছাড়বেন না।

তা আর উপায় নেই। মিছিমিছি আমাকে আর অনুরোধ করবেন না।

ভুল করলেন, আপনার চেয়ে অনেক কোয়ালিফাইড, অনেক এফিশিয়েন্ট মেয়ে আমার কথায় রাজী হবে। দুঃখের বিষয়, আপনি শুধুই শুধুই এত খাটলেন।

কাগজখানা সেক্রেটারীর সুমুখে রেখে দীপা বেরিয়ে যায় নমস্কার করে। কি করব বলুন? বিবেককে বলি দিয়ে আমি বাঁচতে চাইনে।

ভিতর থেকে পর্দা ঠেলে দু'খানা মুখ বেরিয়ে আসে। উকিলবাবুর স্ত্রী ও কন্যা।

এ কি করলে বাবা? তুমি ওর রেজিগনেশনটা নিলে?

একটা উপায় বলে দে না মা? তুই তো অর্থনীতিতে এম. এ দিচ্ছিস।

উকিলবাবুর স্ত্রী নীরব থাকলেও মেয়ে জবাব দেয়, পথ কি নেই, সে পথ যে তোমরা মাড়াবে না।

ততক্ষণে দীপা অন্ধকারে তলিয়ে গেছে।

স্টেশনে পৌঁছে সে মহা দ্বন্দ্বে পড়েছে—এখন কোথায় যাবে? অমিয়র কাছে? না, না—তা হয় না, এ অবস্থায় কারুর ঘাড়ে গিয়ে সমস্যা হয়ে উঠতে পারবে না।

অবশ্য আগে একটা চাকরি জোগাড় করতে।

তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারটি যত স্পষ্ট হয়ে ওঠে অমিয় তত অস্পষ্ট হয়ে যায়, এদিকে সিগন্যাল ডাউন হয়েছে নতুন গাড়ির। যেন শব্দ হচ্ছে—না না, উপায় নেই উপায় নেই যাত্রা বদলের।

চুয়ান্ন

বাংলোর বাড়িতে হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। গৌরী, মাহাতো, কানাই সর্দার ওঝা বুড়ো সবাই এসেছে। সুশীল যায়নি ট্রেনিং নিতে। স্যুটকেস, বাক্স বিছানা বাধা হচ্ছে। এখুনি সবাই রওনা দিয়ে যাবে স্টেশনে।

টেলিগ্রাম এসেছে হঠাৎ দীপাদেবী চাকরি ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছেন। মিস্ট্রেসদের তার পেয়েই রওনা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন সেক্রেটারী। এদিকে ইস্কুলের সব নাকি তৈরি ক্লাস খুললেই হয়।

টেলিগ্রাম পেয়ে অমিয় জলদগম্ভীর হয়ে অনেকক্ষণ বসে রয়েছে। আর চেয়ে চেয়ে শুধু দেখছে, যে ভাঙছে—ভেঙে শেষ হয়ে যাচ্ছে তার দু'দিনের চেঙের সংসার। দু'দিনের হলেও এর মধ্যে যেন জমেছিল বহু দিনের হাসি কান্না দেওয়া-নেওয়া। স্মৃতি ছিল, আশা ছিল, সব ভেঙে গেল।

আপনি কি করবেন অমিয়বাবু? আমাদের বাধ্য হয়ে চলে যেতে হচ্ছে। দীপাদি যে কাণ্ডই করলেন। উত্তরের আশায় অনিমা দাঁড়িয়ে থাকে।

কারণ না জেনে আমি কিছু মন্তব্য করতে পারছিনে। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব ভেবেছি—নইলে স্থির হতে পারব না। দীপাকে খুঁজে বার হবে হঠাৎ 'দেবী' কথাটা উঠে যায়, ভাবের গভীতার জন্য অনিমার তা কানে বাজে না।

কোথায় খোঁজ করবেন স্থির করছেন?

তাও জানিনে।

সম্ভবত বাড়ি চলে গেছেন। দুঃখের বিষয় তাঁর হোম এ্যাড্রেসটা আমরা কেউ জানিনে ইস্কুলের আগের খাতাপত্রে নিশ্চয়ই আছে।

ইন্দিরা বলে, তাতো পুড়ে গেছে।

অনিমা বলে, তাহলে কি হবে এখন? আর আমরা এমন হয়েছি যে এত ঘনিষ্ঠতা অথচ কেউ কারুর সত্যি পরিচয় জানিনে, কারুর মা বাপ আত্মীয়-স্বজনের সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া যেন বাজে কাজ। আশ্চর্য আমাদের বন্ধুত্ব।

আমরা যে ট্রেনের প্যাসেঞ্জার অনিমাদেবী। অমিয় বলে, মাটিতে যাদের শিকড় নেই, তাদের এর চেয়ে বেশি থাকে না। দুঃখ করে লাভ নেই, সভ্যতার খাতিরে কতক মানুষ চিরটাকাল এমনি পথিক হয়েই কাটাবে। ভবঘুরে মেয়ে-পুরুষের চলতি পথে এর বেশি সম্পর্ক সম্ভব নয়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে অমিয়। বালির ঘর মুহূর্তে লোপাট হয়ে গেল—কিন্তু

খেলাটা জমেছিল চমৎকার। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত—সব ক'টা দিনের কথা মনে পড়ে অমিয়র।

এখন আর রোমন্থন করে লাভ কি? কিন্তু এই নিয়ে তাকে চলতে হবে সন্ধান করতে ফিরতে হবে দেশ হতে দেশান্তরে। শহরে শহরে জিজ্ঞাসা করতে হবে—তোমরা কি কেউ জানো দীপার এ্যাডরেস? যে দীপা দীপ্তি ছড়িয়েছিল কদিনের জন্য? উত্তর না পেলে অরণ্য-কান্তার-জল আকাশকে প্রশ্ন করতে হবে – তোমার কি জানো একটি বয়স্কা যুবতীর এ্যাড্রেস?

এমনি তার লম্বা ধরন, এমনি তার প্রফাইল।

গালে একটি টোল আছে অতি সু-শোভন। আর বুকে একটা প্রাণ আছে যার তুলনা মেলা ভার। অন্তত অমিয় জীবনে তো পায়নি।

অনিমা বলে, এখন তা হলে উঠুন -চারটি খেয়ে নিন।

উঠতে ইচ্ছা করছে না অমিয়র, এখনো যে ভাবা যায় না – দীপা নেই। সে আর ফিরবে না।

এই তো সেদিন ঐ বাতায়নে সারা রাত আলো জেলে পুলওভার বুনছিল সে। বড় জটিল গ্রন্থি পিয়েছিল, কিন্তু অদ্ভুত শিথিল—একটানে খুলে গেল সব। দীপা একি তোমার খেলা?

অমিয় বলে, আপনারা দেরী না করে খেয়ে নিন—আমি হয়ত যাব না।

গৌরী বলে আপনাকে যেতে হবে—হয়ত ওখানে পেয়ে যাবেন ঠিকানা। দীপাদি নিশ্চয়ই বাড়ি গেছেন।

তোমাদের দীপাদি সে মেয়ে নয়। চাকরি ছেড়ে বাড়ির সাহায্য নিতে যাওয়া ধাতে সইবে না। তা হলে কি সে সোজা এখানে চলে আসতে পারত না? যতদিন চাকরি না পায় কিসের অভাব হত তার? একটুকু মাথা নোয়ানোকে ঘৃণা করে সে। তাকে আমার চিনতে বাকি নেই।

তবু একবার আপনার যাওয়া উচিত। বাড়ির ঠিকানা পেলে, এখন না হক হয়ত কখনো দেখা হয়ে যেতে পারে। দীপাদির লজ্জা করছে, আপনাকে দেখলে হয়ত তা থাকবে না।

গৌরী তুই তা ঠিক বুঝেছিস?

হ্যাঁ বাবু—আপনার যাওয়া উচিত। চারদিকে চেয়ে গৌরী ধীরে ধীরে বলে, দীপাদি সত্যি আপনাকে ভালবাসে।

অভিমানে মুখখানা কালো করে বলে, তবে চলে গেল কেন? না বলে কয়ে এমন করে কেউ পালায়।

হয়তো দারুণ ঘা খেয়েছেন। কী যে হয়েছে বলা তো যায় না।

বিনয় নেই, তুই আমার সখা সচিব বন্ধু—তোর কথাই শুনব।

আজ আমিই আপনাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি, একদিন দু'জনে ফিরে আসবেন। বৌদিকে দেখব, গৌরী অমিয়র পায়ের ধুলো নেয়। সুশীলও আসে, অভিভাবক অমিয় কারুকে বারণ করে না।

ট্রেন ছাড়ার মুখে স্টেশনে এদের সঙ্গে আরো কতকগুলি করুণ চোখ দেখা যায়। কানাই এসেছে, ফুলের ইতিহাস-জানা সেই বুড়ো এসেছে, এসেছে কঠিন হৃদয় মাহাতো। আর তাদের সঙ্গে একদল উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ সৈনিক এসেছে—যারা একদিন অনেক কৌঞা ভাগিয়ে ছিল পরম উৎসাহে।

*　　　*　　　*

ছোট্ট স্টেশন, ছোট্ট প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু প্রকাণ্ড দেহ এক প্রৌঢ় সেখানে পায়চারি করছেন। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করেন এই সাহেব বেশধারী যুবক অমিয়কে। হয়ত কোনো চেকার। এখানে এসে পড়েছে।

আপনার নামটি, স্যার?

অমিয় অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেটের টিনটা এগিয়ে ধরে।

ব্লাক ক্যাট। নামটা এক লহমায় পড়ে ভদ্রলোক হাত বাড়ান। হেঁ হেঁ আপনাদের দয়া ছাড়া, এসব কি আমাদের মতো চাকুরের কিনে খাওয়া চলে?

অমিয় কিছু বলে না।

কোথায় যাবেন?

ঠিক নেই।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভদ্রলোক মন্তব্য করেন, যিনি আসবার কথা তিনি এলে বোধহয় ঠিক হবে? তা আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। দরকার হলে একটা প্রাইভেট রুমের ব্যবস্থা করে দিতে পারব আমি। আগন্তুকের কুতকুতে চোখ দুটো দিয়ে একপ্রকার অস্বাভাবিক হাসি ঠিকরে বার হতে থাকে। বাংলা দেশের মানুষ দেখলেই কেন যেন আমার মন ভিজে ওঠে। আপনার কোনো চিন্তা নেই—তাঁকে আসতে দিন।

তেমন কেউ তো আসবেন না।

না-ই বা এলো: তার জন্যে ভাবনা কি? আপনার নামটা, স্যার?

অমিয় রায়।

এখনো নিশ্চয়ই ব্যাচেলার? সঙ্গে যে কাউকে দেখছিনে। ও আমি ঠিক বুঝি। পাঁচশ যাত্রীর মধ্যে কেউ যদি টিকিট না কাটে তার চোখের নজর দেখলেই সব টের পেয়ে যাই। প্রায় কুড়ি বছর এ কাজ করছি, স্যার। একটু রাত্রি হোক, টাকা হলে এখানে আপনি সব সাপ্লাই পেয়ে যাবেন।

খাওয়া শোয়ার কোনো অসুবিধা হবে না। বাঙালী বাবুদের দেখলে আমার বড্ড মায়া লাগে। এখানে এসে না বোঝেন ওদের চাল-চলন, না বোঝেন কোনো কথা—যেন বোবাধন।

এখানকার আপনি বোধহয় স্টেশন মাস্টার?

অ্যাজ্ঞে হ্যাঁ।

ক'টি ছেলে মেয়ে?

তা আর বলেন কেন? কোম্পানীর মাইনেতে হপ্তা ঘোরে না।

এখন আর বলে লাভ কি—কিষ্কিন্ধ্যা।

আপনির বাড়ি?

অর্থ বুঝলাম না।

না মানুষ, না পশু—ডোমিসাইল্ড-এর এর চেয়ে আর মহৎ অর্থ হয় না। ক্ষমা করবেন, আপনিও কি ডোমিসাইল্ড?

এরও তবে আয় ব্যয় সামঞ্জস্য হয় না। একে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রলোভনের টোপ ফেলতে হবে, আর একটা সিগারেট ধরান—এই নিন। আমাকে একটা সংবাদ দিতে পারেন? অবিশ্যি আমি আপনাকে খুশী করে দেব।

কি কাজে লাগতে পারি বলুন।

এখানকার হেডমিস্ট্রেস দীপাদেবীকে চেনেন।

চিনব না কেন? আপনার সঙ্গে বুঝি ইয়ে ছিল—মানে পরিচয়? তা তিনি তো কাল চলে গেছেন এখান থেকে। একটু বোধহয় মন কষাকষি হয়েছে সেক্রেটারীর সঙ্গে। আর উনি যে লোক সকালবেলা মিস্ত্রেসদের টেলিগ্রাম করতে এসেছিল, তার কাছে সব শুনলাম।

কোথায় গেছেন দীপাদেবী?

আমার হাতেই টিকিট দিয়েছি। বড্ড ভাল মেয়ে ছিলেন, আহা!

কোথাকার টিকিট?

আগ্রার।

বলেন কি, সে আগ্রা যাবে কেন? বলুন মাস্টারমশাই, এ আপনার ফোর-টুয়েন্টি নয় তো? অমিয় একখানা হাত চেপে ধরে।

না, না, এ আপনাকে ঠিক বলেছি অমিয়বাবু। দীপাদেবীর ব্যাপারে ফোরটুয়েন্টির আশঙ্কা করবেন। না। তিনি আমার ছেলেকে হাফ ফ্রি করে দিয়েছিলেন অনেক কষ্টে।

যাক, তবু একটা সন্ধান পাওয়া গেল আপনার দয়ায়।

এমন সময় মিস্ট্রেসরা এসে পড়ে। কেউ বাকি নেই। সবাই এসেছে পাঁচ খানা রিকশায়।

অনিমা বলে, কোনো খাতা-পত্তর নেই।

অমিয় জবাব দেয়, তা যে থাকবে না তা আমি জানি। এতদিন আলাপ, আমারই উচিত ছিল এটুকু জানা। তবে স্টেশনমাস্টার একটা হদিস দিচ্ছেন—দীপা নাকি আগ্রার টিকিট কেটেছে কাল।

সত্যি ?

আপাতত এর চাইতে বেশি সত্যি কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ভাবছি আগ্রায় যাব।

ইন্দিরা এবং অনান্য সবাই বলে, চিঠি-পত্রে যোগাযোগ রাখবেন।

যাবার সময় শীলা একখানা বই অমিয়র হাতে দিয়ে বলে, আপনি পড়ে বিনয়বাবুকে দেবেন। মনে থাকবে তো ?

থাকবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তখন আর বইখানার নাম পড়া যায় না। ট্রেনে উঠে বিছানটা বিছিয়ে অমিয় চিৎ হয়ে শুয়ে বইখানা খোলে : এ যে একখানা কবিতার বই। প্রথম কবিতা বনলতা সেন। অমিয় পড়তে আরম্ভ করে।

কবিতা শেষ করে চোখ বুজে চুপ করে থাকে অমিয়। কতক্ষণ যে এভাবে কেটে যায় তা সে জানে না। আজ শুধু চুপ করে থাকতেই ভাল লাগছে যেন। আমারে দুদণ্ডশান্তি দিয়েছিল বনলতা সেন।

পঞ্চান্ন

আবার ডালহৌসা স্কোয়ারের দশটা পাঁচটার একটা অংশ। সস্তা ক্যানটিনে বিনয়ের সঙ্গে তার সহকর্মী নিখিল মুখ বাঁকিয়ে দু'স্লাইজ রুটি চিবুচ্ছে। সামনে একটা কংক্রিটের টেবিলে দু'কাপ চা। প্রায় জল হয়ে যাবার জোগাড়।

বিনয় বলে, ব্যাপারটা কি বুঝতেই পারছিনে। আজ প্রায় সাত দিন চিঠি দিলাম জবাব নেই। অসুখবিসুখ করল নাকি ? ও তো নিজেরটা নিজে চালাবে এ যোগ্যতা নেই।

তোকে আবার দৌড়ে ছাড়বে, তাই এ চালাকি। নিখিল বলে, ও তো সহজ ছেলে নয়। তুমি ইচ্ছা করে যাওনি, কায়দা করে টানছে। ওকি

বোঝে না, এক জনের ছুটি স্যাংশন হলে আর এক জনেরও কমন গ্রাউন্ড্‌স্‌-এ আটকায় না ?

কিন্তু তা কি ঠিক ? একটু চিন্তিত দেখায় বিনয়কে।

এর মধ্যে অমৃতা, শিপ্রা, রেবা, বনমল্লিকা ক্যান্টিনের দিকে আসতে থাকে।

বিনয় মৃদু কণ্ঠে মন্তব্য করে, এই রে প্লাস্টিকগুলো আবার আসছে।

নিখিল বলে, ঝালদার চানাচুরে এত অরুচি? এমন তোদের কখনো দেখিনি।

বলিস নি, এক্ষুনি আবার ফটো-ফটো করে মাথা খাবে।

কিসের ফটো ?

সেই যে চেঞ্জে গিয়ে এবার ক'খানা ফটো তুলেছি।

নিশ্চয় মেয়েদের ?

তবে কি মর্দাদের ছবি তুলে বেড়াব নাকি ? তোর মত গণ্ড গদাধর নই আমরা।

নিখিল চুপ করে থাকে।

মেয়ে চারটি একটু কাছাকাছি হতেই বিনয় কাষ্ঠহাসি টেনে বলে, চা খাবেন ?

শিপ্রা বলে, না—আমরা এ রেস্তোরাঁর চা হজম করতে পারব না। ও যারা নতুন চেঞ্জের থেকে ফিরেছে তাদের সইবে। কই ফটো কোথায় মশাই! খুব তো বাগাড়ম্বর করলেন।

অমিয়কে ফিরতে দিন আগে!

তিনি আর ফিরেছেন! আপনাকে ফাঁকি দিয়ে তিনি ডুব দিয়েছেন। যে যে হ্রদের ডেসক্রিপশন দিয়েছেন, যদি সত্যি হয় তো আর ওঠার আশা নেই।

খুক খুক করে হাসিতে ভেঙে পড়ে রেবা, যা বলেছিস মাইরি শিপ্রা।

নিখিল উঠব উঠব করে।

আরে, বসুন না আপনি। আপনার অত লজ্জা কিসের ? আপনি তো চেঞ্জে যাননি। শিপ্রা বলে চলে, এত দিন কাছে রইলাম একখানা ফটো তুলতে পারলেন না—একদিন চেঞ্জে গিয়ে একেবারে ডজনখানেক ফটো, এ কথায় বিশ্বাস আর যে করুক আমি করতে পারিনে। কি বলেন, নিখিলবাবু ?

বনমল্লিকার বাস ঠিক এলগিন রোডে নয়—তার লেজুড়ে। সে মুখে রুমাল দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কান পেতে সব শোনে।

নিখিল বলে চলে ব্ল্যাকে কেনা আমার সম্ভব নয়—যাদের সংগতি আছে দর কষাকষি করুন, আমায় রেশন তুলতে হবে, কিছু মনে করবেন না আমি চললাম।

বিনয় নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, আপনাদের কি এত দিনে দু দশ পয়সা ফটো তোলা হতনা—আসলে যে ছবি ভাল উঠবে না, ক্রনিক গাম বলেই যে আপনাদের সারে না।

ওরা কষ্ট হলেও সন্তুষ্ট হয়। এই খুনশুটিতেই ওরা যেন তৃপ্ত।

সেদিন বিনয় অত্যন্ত চিন্তিত মনে বাড়ি ফেরে। এ কথার পরও বনমল্লিকা চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিল সন্ধ্যার সময়, সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। মানুষটার হল কি? দীপাকে পেয়ে কি একেবারে সব ভুলে গেল? অনেক সময় এমন হয়ে থাকে। হক দু'দণ্ডের জন্যও যদি ওকে শাস্তি দিয়ে থাকে দীপা দিক, এ সব ভাবতেও বিনয়ের ভাল লাগে একটু ব্যথা হয়তো কোথায় যেন সরু ধারাল কাঁটার মতো বিঁধছে, তবু যেন উপছে উঠছে মন। দু'দণ্ডের জন্য কেন চিরদিনের জন্য ওকে শাস্তি দিক দীপা। প্রীতি, প্রেম বিশ্বাসে মধুর হয়ে উঠুক ওদের সান্নিধ্য, বিনয়কে ওরা ভুলতে পারে না? চিঠি লিখবেই।
তা দু'দিন বাদে লিখলে আর কি হবে।

বাড়ি ফিরে বিনয় সবে জামা কাপড় বদলে বসেছে, অতসী এসে জিজ্ঞাসা করে, চিঠি পেয়েছ দাদা?

না রে। বড্ড চিন্তায় আছি।

আমি একখানা কিন্তু পেয়েছি। কিছু খাওয়াও বার করে দিচ্ছি।

তোর কাছে লিখেছে বুঝি?

না দাদা, মেয়েদের কাছে তিনি লেখেন না—অন্তত আমাদের মতো শিক্ষিতাদের কাছে। ভয় আছে, পাছে বানান ভুল ধরা পড়ে। কথা ছিল চেঞ্জে গিয়ে চিঠি দেবেন, কিন্তু তা সাহসে কুলায় নি। এই নাও চিঠি।

তুই কি পড়েছিস?

কেন পড়তে যাব তোমার চিঠি? জেনো সকলেরই প্রেস্টিজবোধ আছে।
অতসী চলে যায় চিঠিখানা দিয়ে।

আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে বিনয় চিঠিখানা খোলে। তার মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সাগ্রহে কৌতুকে। কিন্তু খানিকটা পড়েই স্তম্ভিত হয়ে যায়—এরপর যেন আরো কি দুঃসংবাদ আছে।

ভাই বিনয়,

আমি আগ্রার পথে—দীপাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে হারিয়ে গেছে।

ইতি

তোর হতভাগ্য

অমিয়

বিনয় উল্টে পাল্টে খোঁজে চিঠির পাতা। আর কিছু লেখা নেই।

বিনয় সজোরে বলে ওঠে, একি করলি হতভাগা? তুই নিজে মরে আমাকেও মারলি? ঠিকানাপত্তর হদিশ কিছু নেই, এখন কোথায় যাই তোর খোঁজে?

বাসে উঠে বিনয় একেবারে কলোনীতে হাজির হয়। একটুখানি হাঁটা-পথ চেনা। চাঁদের আলো নেই তবু কষ্ট হয় না বিনয়ের। সে ছোট্ট একখানা টিনের ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়।

নিখিল, নিখিল!

কে, ভিতরে আসুন। নিখিল তো এখনো ফেরেনি। তার বাপ এগিয়ে আসে দোর খুল্লেন তুমি, এসো বাবা ভিতরে বসবে।

কখন ফিরবে নিখিল?

জানিনে, তবে সে এলে হাঁড়ি চড়বে।

নিখিল না আসা পর্যন্ত বিনয় ভিতরে বসতে পারে না। সে উঠোনটার এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করতে থাকে। নিখিলের ছোট ভাইটা ইতিহাস পড়ছে চেঁচিয়ে। অনেক কথার মধ্যে একটি কথা তাঁকে বার বার আঘাত করে। শাজাহানের চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ তার পত্নীপ্রেম। ১৬৩২ খৃঃ মমতাজমহলের সমাধির উপর তিনি যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে করে গেছেন, তা স্থাপত্য শিল্পের এক অনুপম নিদর্শন।…

ইতিহাস কি এখানে সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতা করে গেল। শাহানশার কি একটি বেগমই ছিল? ছিল তার একনিষ্ঠ প্রেম? খেয়ালি সম্রাট মমতাজকে ভালবাসতেন এই পর্যন্তই বলা চলে। তিনি যে খেয়ালে ময়ুর সিংহাসন গড়েছিলেন, যে খেয়ালে দেওয়ান-ই-খাস-দেওয়ান-ই-আম তুলে-ছিলেন—সেই খেয়ালেই তাজের সৃষ্টি। এ ঐকান্তিক পত্নীপ্রেমের স্বাক্ষর নয়।

বিনয়ের ইচ্ছা করে এগিয়ে গিয়ে বলে, খোকা, তুমি ও-বিষ আর গিলো না। আরোপিত স্বার্থদুষ্ট প্রেম প্রেম নয়। চণ্ডীদাসের প্রেমের কাছে শাহানশার প্রেম অতি নগণ্য। কিন্তু সে কথা বলতে পারেনি বিনয়। তাহলে খোকা এগজামিনে ফেল করবে যে। বিনয়ের মনের খাতায় ভরপুর হয়ে থাকে দীপা ও অমিয়। কেউ না দেখুক, কেউ না জানুক বিনয় মনে মনে যে-তাজমহল গড়ে, জগতের জড় প্রস্তরে সে হর্ম্যরচনা অসম্ভব।

নিখিল এসে পড়ে। কি রে তুই যে?

এখনো তো বিয়ে থা করলি নে, যা হাঁড়িটা চড়িয়ে আয় গে। জরুরী

কথা আছে। আমি বাইরে বসি একটু। টাকা জোগাড় হয়েছে, রেশন এনেছিস?

হ্যাঁ। অমিয়টা থাকতে আমি কখনো এমন ঠেকিনি। দু'টো বাজে কথা বললেও সময় মত ঘোরায় নি। বিনয় চুপ করে বসে থাকে। নিখিল তাড়াতাড়িই ফেরে।

অমিয় চিঠি লিখেছে।

কই দেখি?

নিখিল চিঠিখানা নিয়ে ভিতরে যায়। যে হ্যারিকেনের আলোতে খোকা ইতিহাস পড়ছিল—সেই আলোতে দাঁড়িয়ে সে চিঠি খোলে। নিখিলের মুখের ভাবান্তর দেখে খোকার কণ্ঠ বন্ধ হয়ে যায়। সে ইতিহাস বন্ধ করে রাখে।

নিখিল বেরিয়ে আসে।

বিনয় বলে, তোর কাছে তো সবই বলেছি—হঠাৎ দীপা নিরুদ্দেশ হবার কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ভাবছি, একবার আগ্রা যাব।

কোনো লাভ হবে না। যে চাকরি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়, সে আর যাই করুক লুকোচুরি খেলছে না। তাকে আগ্রা গেলেই পাওয়া যাবে না। অমিয়র মতো তোর অতটা উতলা হয়ে লাভ নেই।

আমি যে কিছু স্থির করতে পারছি নে।

স্থির হতেই হবে। অযথা খরচান্ত এবং হয়রান হয়ে লাভ কি? যে ধরা দেয় না তাকে তুই কোথায় খোঁজ করে মরবি, বল? আগ্রায় কেউ নেই। তখন তোর আরও কষ্ট হবে। ও জায়গাটা তো আসলে মহাশ্মশান।

তুই কি করে জানলি দীপা চাকরি ছেড়েছে?

প্রেমের ব্যাপার হলে অমিয়ই লিখত। তা যখন লেখেনি, তখন অন্য কিছু। এবং তা চাকরি। শিক্ষিতা মেয়েদের আজকাল এই দু'টো সমস্যাই প্রধান। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে। তাঁদের সম্বন্ধে যতটা শুনেছি, এই আমার ডিডাকসন্। নিখিল একটু চিন্তা করে বলে, দীপাকে পাওয়া সহজ হবে না—পলাতকা মেয়ে সহজে ধরা দেবে না তাই মাঝে মাঝে আউটবার্স্ট হবে অমিয়র, তুই আরও চিঠি পাবি।

তুই যে জ্যোতিষীর মতো সব বলে যাচ্ছিস।

তা নয়, কমনসেন্স থেকেই বলছি। কমনসেন্সের সুষ্ঠু প্রয়োগই আন্‌কমন্ শোনায়।

তা হলে তুই আমায় এখন কোথাও যেতে নিষেধ করছিস?

হ্যাঁ—সিচুয়েশনটা অবজারভ কর আপাতত।

কিন্তু দীপা মহাশ্মশানের দিকে ছুটল কেন চাকরি ছেড়ে? আগ্রায় কি চাকরি পাবে? দীপা তো এক অতৃপ্ত বাসনার শ্মশান—তাজ তার রূপময় চিত্র। বড় ভয় করে আমার নিখিল, দীপা না আত্মহত্যা করে আবার।

এবার জ্যোতিষী বলে, এ কথার তো ভাই কিছু জবাব দিতে পারছিনে।

বিনয়, বলে, তুই না পারলেও আমি দিব্য চোখে দেখছি, দীপা মরলে অমিয়ও মরবে। সে শাহানশাহের মতো পাথরের গম্বুজে মিনারে প্রেমের লেন-দেন শোধ করবে না।

নিখিল মনে মনে প্রার্থনা করে, ওরা কেউ যেন মরে না—তা হলে যে আর একটি মহাপ্রাণ ঘায়েল হবে শোকে দুঃখে মর্মপীড়নে।

ছাপ্পান্ন

বিরাট অফিস ঘর। ফেদার এ্যাণ্ড বার্ড ম্যানেজিং এজেণ্টস। এদের নানারকম কারবার আছে ভারতবর্ষ জুড়ে। অনেকটা মানচিত্রের রেল লাইনের মতো। দেখতে সরু সরু কিন্তু এখনো স্বাধীন ভারতে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ান। অনেকগুলি ডিপার্টমেণ্ট জন্মাবধি টেম্পোরারী। যদি কেউ প্রশ্ন করে, কেন? উত্তর অতি সহজ, মানুষের লেবার ঠকানর এ এক রকম পদ্ধতি। চাকরি ঠিক যাচ্ছে না, একটা তুলে আর একটায় টেনে নিচ্ছে। মধ্যখানের ফাঁকের জন্য এক সঙ্গে চাকরি কাউণ্ট হচ্ছে না। তাই স্থায়ী চাকুরেদের মতো এদের কারো সুখ সুবিধা নিরাপত্তা নেই। অথচ বলার মতো কোনো আইন নেই। মুখ বুজে মার খেয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু তার ভিতর আজ শোনা যায় জোর একটা গুজব।

নিখিল রিসিভ ডেসপ্যাচ নিয়ে ব্যস্ত। সে কেবলই ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে কখন দেড়টা বাজবে—দেখা হবে বিনয়ের সঙ্গে। আজ অফিসের বাবুদের মন বড্ড গরম—বিশেষ করে টেম্পোরারী ডিপার্টমেণ্টগুলোর। বিনয় বড় সাহেবের পার্সন্যাল ফাইলগুলো নিয়ে ডিল করে, সে হয়তো আসল সত্যটা জানতে পারে। আপাতত দীপা ও অমিয় নিখিলের মাথা থেকে সরে গেছে। শিপ্রা, রেবা, অনুভা আজ আর ফটোর কথা তোলেনি।

বরঞ্চ এই কিছুক্ষণ আগে বনমল্লিকা সমস্ত অহমিকা বিসর্জন দিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে গেছে নিখিলের কাছে, শুনছি নাকি র‍্যানডম ছাঁটাই হবে, কি উপায় করা যাবে বলুন তো? একজনের ওপর দশজন নির্ভর।

বিংশ শতাব্দীর গ্র্যাজুয়েট পুরুষ নিখিলের মুখ দিয়ে কোনো পৌরুষের বাণী নির্গত হয়নি, শোনা যায়নি সদম্ভ নির্ঘোষ। সে শুধু বলেছে, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফাইট করে যেতে হবে।

সময়মতো ইউনিয়ন গঠিত হয়। বিনয় এখন বেপরোয়া হয়ে ব্যারাকপুর শাখার জন্য কাজ করে। এখন তার ক্ষমতার দ্বিমুখী অভিযান চলে। তাই সে মাঝে মাঝে ইউনিয়নের খাতিরে হেড অফিসে আসে।

কোন চিঠি-পত্র তো এল না, বিনয়। নিখিল বলে, এতদিন আসা উচিত ছিল আমার হিসাব মতো।

বিনয় বলে, আর একটা সপ্তাহ দেখব—তারপর একটা কিছু করতেই হবে, নইলে একটা কিছু অঘটন ঘটলে চিরকার আপশোস থেকে যাবে আমার, আর যে ভাবে ছাঁটাই ঝুলছে খাঁড়ার মতো তাতে অত ছুটি নেওয়াও মারাত্মক।

একটা সপ্তাহ ঘুরতে পারে না। এর মধ্যে চিঠি আসে বিনয়ের নামে।

ভাই বিনয়,

দীপা চাকরি ছেড়ে আগ্রার পথে পাড়ি জমিয়েছিল—আমিও পাড়ি জমালাম তার পিছে। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না মণি মুক্ত মরকতে শ্বেত পাথরে নেই। দীপা নেই নীলা কিংবা মহা মূল্যবান জহরতে। সে কোথায়, তা বুঝতে পারছিনে। সকাল সন্ধ্যা দুপুর তাজের পাদমূলে কাটালাম, দীপার সন্ধান পাওয়া গেল না। রাত্রে রমজানের চাঁদের মতো এক ফালি চাঁদ উঠেছে ভুবন বিখ্যাত স্মৃতিসৌধের গম্বুজে।

ওরা বললে, এখানে নেই, আর তো আমরা জানিনে।

এখন মনে হল দীপা মরতেও চায় না, কোথায় যেন লুকিয়ে আছে। তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বার করতে হবে. সঙ্কল্প করেছি শুধু ভারতবর্ষ নয়, দ্বীপময় ভারত ঘুরে বেড়াব।

আজ আমি দিল্লীর পথে।

ইতি

তোর অমিয়

পুঃ কিছু টাকার দরকার। সুরজমলকে বলে এক হাজার টাকা পাঠিয়ে দিবি। সব চেয়ে ভাল হয় তার দিল্লি অফিসে জরুরী এ্যাডভাইস দিয়ে দিলে।

রাত প্রায় সাতটা। ডালহৌসি স্কোয়ার নির্জীব হয়ে এসেছে। পথে তেমন যান-বাহনের চলাচল নেই। শুধু ট্রাম আর বাসগুলো আলো এবং অন্ধকারে

সাঁতার কেটে চলেছে। মাঝে মাঝে দু'চারখানা প্রাইভেট। আর ভূতের মতো এক আধটা ট্যাকসি।

বিনয় বলে, হেঁটেই চল, বড়বাজার কতটুকু পথ।

নিখিল বলে, তাই চল—ওখানে কাজ সেরে সোজা কলোনীর বাস ধরব। আজ আর বাজার হবে না, শুধু ভাতে-ভাত, নয়ত খিচুড়ি।

তোর কথা মতো আমি না গিয়ে ভালই করেছি। এখন এ পাগলকে ফেরানো যাবে না।

নিখিল বলে, তা উচিতও নয়। নিজে নিজে ঘুরে সুস্থ হওয়ার ভিতর একটা সান্ত্বনা আছে। বাধা দিলে হিতে-বিপরীত হতে পারে।

সে কথা মিথ্যা নয়। এ-সব ধাক্কা সামলাতে না পারলে, অনেক সময় যা ঘটে থাকে তা আর কল্পনা করা যায় না, ঈশ্বর যেন তা না করেন।

ওরা সোয়ালো লেন ছাড়ায়।

নিখিল বলে, ক'দিনের জন্যই বা ছুটি নিয়ে চেঞ্জে গিয়েছিলি তোরা! এর মধ্যে যেন একটা মহাভারত ঘটে গেল।

বিনয় জবাব দেয়, ভয় হয় এই নাটকীয় যাত্রার আবার শেষ না হয় মহা-প্রস্থানে। অমিয়র চিঠির সুর ভাল নয়।

কী করবি বল, এর ওপর তোর-আমার হাত নেই।

ওরা সুরজমলের কুঠিতে ঢুকে পড়ে। গদি দোতলায় জুতো বাইরে খুলে রেখে ওরা গিয়ে জাজিমের এক প্রান্তে দাঁড়ায়।

রাম রাম।

রাম রাম বাবুজী আইয়ে, বইঠন। সুরজমল কানে টেলিফোন লাগালো: হ্যালো হ্যালো ডবল থ্রি এইট বড় বাজার!

নিখিল ও বিনয় একটু হকচকিয়ে যায়। এ বাঙলা দেশ, না অন্য কোনো স্থান। ওরা দু'জন ছাড়া আর বাঙালী নেই। অথচ হল-এ বোঝাই মানুষ। তাদের ভাষা ও সাজসজ্জা অপরূপ। কোনো মালের সঙ্গে দেখা নেই কিন্তু লেন-দেন চলছে একটা বড় ব্যাঙ্কের মতো। ক'জন সিন্ধি গুজরাটি ভাটিয়া আসে—আসে দু'জন পাকিস্তানী ও একজন আমেরিকান। আশ্চর্য, সকলের মুখেই রাম রাম।

নিখিল ও বিনয় এই মহা মিলনের ক্ষেত্রে যেন অপাংক্তেয় হয়ে থাকে। ওরা ভাবে, রানা প্রতাপের বংশধর অনেক তৃণশয্যায় শুয়ে বহু কৃচ্ছ্রসাধন করে এই সিদ্ধির কোঠায় পৌঁছে গেছে। সত্যি ভারত পরাধীনতার শৃংখল থেকে এত দিনে মুক্তি পেয়েছে।

সুরজমল তেমন অভদ্র নন, ঘণ্টাখানেকের বেশি তিনি ওদের অপাংক্তেয় করে রাখেন না, এ এক ঘণ্টা তার কাছে যেন কয়েকটি ব্যস্ত বিব্রত মুহূর্ত। দিন এবং রাতটা মিলিয়ে যদি চব্বিশের জায়গায় আটচল্লিশ ঘণ্টা হতো, তা হলে হয়তো আরো একটু স্বাধীন ভারতের শ্রীবৃদ্ধি করা সম্ভব হত। সুরজমল মোটা মানুষ—এগুতে কষ্ট হয় খুব। তাই ওরা দু'জনেই কাছে এগিয়ে যায়। তিনি মুহূর্তে সব বুঝে নেন। ওদের তেমন মুখব্যাদন করারও দরকার হয় না। স্টেনো তখনি সব খাতায় টুকে নেয়। সুরজমল একটু কমার্শিয়াল হাসি হেসে বলেন, রাম রাম বাবুজী, আচ্ছন তোবে!

নমস্তে, বলে ওরা উঠে আসে।

যে কাজ মনস্থ করে গিয়েছিল, তা হাসিল হয়েছে। যাওয়ার সময় দু'জনে কথা বলতে বলতে গিয়েছিল, এখন চুপচাপ। রানা প্রতাপের বংশধরের কোষ্ঠির আবহাওয়া ওদের কেমন যেন বীতশ্রদ্ধ করে দিয়েছিল!

এখন কোথায় যাবি নিখিল?

সোজা কলোনী। তুই?

বাসায়।

আবার মাসখানেক অমিয়র কোনো চিঠি পাওয়া যায় না। বিনয় ও নিখিলের দিন কাটে উৎকণ্ঠার ভিতর।

সাতান্ন

কোম্পানীর কৃপায় বিনয় জলপাইগুড়িই বদলি হয়। এবার আর ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করা সম্ভব হবে না, সে তল্পিতল্পা গুছায়। মাশুল দিতে চলে তার দক্ষতার। কালাজ্বর, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার কোন্‌টায় কাবু করে ঠিক নেই। তবু সে পোস্টার প্যাম্পলেটগুলো সযত্নে বেঁধে নেয় বিছানার সঙ্গে। আর বলে যায় নিখিলকে অমিয় এবং ওর সেতুবন্ধন ঠিক রাখতে! তোকে যোগাযোগ সচিব করে গেলাম, পোস্টটার দায়িত্ব বজায় রাখিস। আমার ভাই বোন বাপ আছে, ওর কিন্তু কেউ নেই। চাকুরিতে ঢুকে অবধি ওর সঙ্গে এমন ছাড়াছাড়ি আর হয়নি। দূরে যেতে ঠিক ভয় করছে না, তবে কেন যেন ভাল লাগছে না। কিন্তু উপায় কী?

ঠিক সেই সময় একখানা চিঠি আসে অমিয়র।

ভাই বিনয়,

দীপাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এ্যালিফেন্টার দ্বীপে, অজন্তার গুহায় দীপা নেই। প্রদক্ষিণ করলাম দীপ জ্বালিয়ে অন্ধকারে প্রাচীন কারুহর্ম্য দাক্ষিণাত্যের দেবালয়—সেখানেও পেলাম না। মোঘল যুগের মসজিদে, দেউলে-দরবারে খোঁজ করলাম কিন্তু দীপা ধরা দিলে না। মৃতের মধ্যে অমৃতের সন্ধান পেলাম না।

জীবনে তুই আমাকে অনেক বুদ্ধি এবং উপদেশ দিয়েছিস—বাঁচিয়েছিস বহু ত্রুটি বিচ্যুতির হাত থেকে। আজ কী বলে দিবি, ভাই, দীপা কোথায়?

ঠিকানা দিলাম অপর পৃষ্ঠায়।

আজ আমি কুতুব মিনারের পথে।

ইতি—

তোর অমিয়

একটা টেলিগ্রাম করে দে, নিখিল বলে, এক্ষুনি মুসাবিদা কর।

কী লিখব বল?

তাই তো, আমারও মাথায় কিছু খেলছেনা। তুই কিছু বল না, দেখি কী দাঁড়ায়।

বিনয় একটু ভেবে বলে, তবে কাগজ আন, আমি যা বলি তা সাজিয়ে ইংরাজী তর্জমা করে দিবি সুন্দর করে, যাতে কারুর বুঝতে কষ্ট না হয়।

নিখিল একটা প্যাম্পলেট টেনে নেয়। বল এখন।

বিনয় বলে, লেখ এ্যাড্রেসটা হবে—

ওরে বোকা, আজকার শিক্ষিতা বেকার দীপাকে শ্রাবস্তির কারুকার্যে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে না মরা বুনিয়াদে—তাকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খাতা ওলটালে।

ইতি—

তোর বিনয়।

নিখিল মন্তব্য করে যদি কেউ আত্মহত্যা করবে বলে কুতুব মিনার থেকে লাফ দেয় এবং মাঝ পথে এসে এমন একখানা টেলিগ্রাফ পায়, তবে সে তার লাফ উইথ ড্র করে মিনারে ফিরে যেতে বাধ্য। এখন তুই নিশ্চিন্ত মনে জলপাইগুড়ি কেন বিলেতেও যেতে পারিস।

বিনয় কতকটা আশ্বস্ত হয়ে ম্যালেরিয়া ও ব্ল্যাকওয়াটার ফিভারের রাজ্যে রওনা হয়ে যায়।

সময় মতো চিঠি আসে বিনয়ের।

ভাই নিখিল,

সব ভাল তো? আমি নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছে গেছি। আমার জন্য

ভাবিস নে। অমিয়র সংবাদ পেলেই জানাবি। কেমন আছিস?

ইতি—

তোমার বিনয়।

আজ সুরজমলের লোক আসার তারিখ। নিখিল গায়ের জ্বালায় পোস্টকার্ড টেনে জবাব লেখে।

বন্ধুবরেষু,

চমৎকার আছি। আত্মহত্যাপ্রবণ খামখেয়ালী এখনো কোন জবাব দেয়নি।

ইতি—

তোর যোগাযোগ সচিব।

বেলা দু'টোর সময় সুরজমলের লোক এসে হাজির। নিখিল ভেবেছিল আজ বোধহয় আর আসবে না। সে একটু নিশ্চিন্ত মনে চা খাচ্ছিল ক্যানটিনে বসে।

নমস্তে বাবুজী।

অমিয়বাবু তো আসেন নি।

তা না এসেছেন—আপনি আছেন। একটা কনট্রাকট বাগিয়ে দিন, সত্তর হাজার নাকি পিঁপে চাচ্ছে কোম্পানি।

আপনারা টেণ্ডার দিন।

শুধু টেণ্ডার দিলে কী আর হোবে, বাবুজী। বলেই লোকটি একটু তাৎপর্যপূর্ণ হাসি হাসে। মেহেরবাণী চাই আপনাদের।

অর্থাৎ টেণ্ডারের লোয়েস্ট রেটটা বলে দিতে হবে। জানলেও এটা বলা নিখিলের পক্ষে সম্ভব নয়, আর সে জানেও না। সে একটু ভেবে, আমি তো ও ডিপার্টমেণ্টে কাজ করিনে।

সুরজমলবাবু কোন ডিপার্টের খবর রাখেন? তিনি তো লাখ রুপয়া কামাচ্ছেন। জানেন তাঁর মাস বিতলে (গত হলে) বাইজী খরচা দশ হাজার। লোকটা চোখ দিয়ে ঘুড়ির মতো কান্নিক মারে। ব্যয়ের মাধাম এবং টাকার অঙ্কটা শুনে নিখিলের মাথা ঘুরে যায়। সে বলে, আমি তো সুরজমলবাবুর পায়ের যোগ্য নই।

জাবিন তো আপনি।

এই রে খেয়েছে। সময় মতো গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে বিনয়। বিধাতা কেন কোম্পানী বদলী করল না জলপাইগুড়ি। হ্যাঁ তা ঠিক লিখে জানাচ্ছি সব।

তার দরকার্র হোবে না। আমরা কি তাগাদা করছি আপনাদের? মানীর ইজ্জৎ কি বুঝি না? ফিন কাল আসব।

না, না—আরো দু'টো সপ্তাহ যাক।

আচ্ছা তাই হোবে, নমস্তে।

চা-টুকু আর নিখিল খেতে পারে না। প্রায় তিনটা বাজে। সে দু আনা পয়সা গচ্চা দিয়ে ছুটে পালায়।

পোস্টকার্ডখানা তখনও পোস্ট করা হয় নি। নিখিল পুনশ্চ দিয়ে লেখে: সুরজমলের লোক যেমন তাগাদা দিচ্ছে, যদি দু' এক সপ্তাহের ভিতর অমিয় না আসে, তবে এ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে লেকের জলে না ডুবে আমার আর উপায় নেই।

চিঠি পেয়েই বিনয় উত্তর দেয়।

তুই এত নারভাস হসনি, আমি, আমি সোজা চিঠি লিখে দিচ্ছি সুরজমল কোম্পানীকে, দেখিস, তোকে আর তাগাদা করবে না। এর বেশি দূরে বসে আমি আর কি করতে পারি? ও হতভাগাকে যে যখন জীবনে বন্ধু বলে বরণ করে নিয়েছে, সেই তখন দুঃখ পেয়েছে। তুই, আমি, দীপা তার জলন্ত নজির।

এখানে এসে প্রকৃতির এক অপূর্ব নিঃসঙ্গ রূপ দেখলাম। কিন্তু দু'দিন বাদেই তা যেন এ্যাসিডের মতো লাগছে। চুয়া ঢেকুর উঠছে গলা বেয়ে। ভাল লাগছে না আর নিঃসঙ্গ শালতরু পাহাড় ও পাথর। এমন সময় যদি হতভাগাটা এ্যালকালিটা হাতের কাছে থাকত! যে কখনো অম্লাধিক্যে ভোগেনি, সে কখনো আমার জ্বালা বুঝবে না! তুই হয়ত কতকটা বুঝবি, কারণ মাস কাবারে তোরও এ্যাসিড হয় বিস্তর! ও যেন সোডা, মুহূর্তে রিলিফ। স্বর্গসুখ বললে একেই বলতে হয়। স্বাস্থ্যবান লোকে এ হয় তো বুঝবে না কখনো।

ইতি—

তোর বিনয়।

এরপরও সুরজমলের লোক আসে কিন্তু বিরক্ত করে না নিখিলকে। সে শুধু অমিয়র সিটটা একবার দেখে চলে যায়। তবু ভয় কাটে না নিখিলের। যতক্ষণ লোকটা থাকে ও কেবলই ভুল করে এনট্রিতে।

একদিন প্রচণ্ড একটা সাইক্লোনের মতো অমিয় এসে হাজির হয়। অফিস শুধু চোখগুলো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সম্ভব হলে এক্ষুণি সবাই ভেঙে চুরে ছুটে আসত ওর কাছে।

নিখিল চিঠি লেখে। অতি কষ্টে আয়ত্তে রাখতে হয় তার হাত।

ভাই বিনয়,

আজ মহানন্দে ইস্তফা দিচ্ছি মন্ত্রিত্ব, শিকলি কাটা পাখি ফিরে এসে দাঁড়ে বসেছে। দেখবি যদি ছুটে আয়।

ইতি—

তোর যোগাযোগ সচিব।

চিঠি পেয়ে বিনয় ঘড়ি আংটি বন্ধক দিয়ে ছুটে আসে এয়ারে।

নিখিল বলে, সুরজমলের লোকটার সঙ্গে অমিয় দু'দিন একটু কথা বলল। জোর করেই আমাকে শ'তিনেক টাকা দিয়ে গেল। তারপর শুনি ছ'মাসের মেডিক্যাল লিভ নিয়ে আবার পালিয়েছে, ভাল কথা বলতে সময় দিলে না।

বিনয় প্রশ্ন করে, দীপার কথাটাও কি জিজ্ঞাসা করিস নি?

তার চেহারা ও হাবভাব দেখে সাহস হল না আমার।

বেশ করেছিস। বিনয় সুটকেসটা নামিয়ে রেখে অবসন্ন হয়ে একখানা চেয়ারে আশ্রয় নেয়।

শুধু একখানা চিঠি পায় বিনয় জলপাগুড়ি ফিরে এসে,—

ভাই বিনয়, দীপাকে কোনো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—আমার বিশ্বাস সে বেঁচে নেই। ইতি—

তোর অমিয়

তারপর আরো একটা বছর কেটে গেছে ক্যালেণ্ডারে।

আটান্ন

সুদীর্ঘ ছুটির পর অমিয় এসে যথারীতি অফিসে হাজির হয়েছে সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে নিখিল ছাড়া সবাই বুঝতে পেরেছে ও যেন বদলে গেছে একেবারে। চেহারায় যেমন একটা কালো চোয়াড়ের ছাপ পড়েছে তেমান চরিত্রেও দাগ পড়েছে বিষম। শীতের আবহাওয়ায় সাজের কোট-প্যাণ্টেও ঢাকা পড়েনি কিছু।

অবিনাশ বলে, আমি ওকে গত শনিবার দেখেছি রেসের মাঠে।

নিখিলের বুকটা ছ্যাক করে ওঠে। সে বলে,কারুর নামে মিথ্যা বলতে নেই।

বিশ্বাস না করিস, আমার সঙ্গে যাস আসছে শনিবার, দেখিয়ে দেব।

মানু বলে, শনিবার পর্যন্ত দেরী করতে হবে কেন, আজ দশটায় চাঁপাতলা গেলে হাতে কলমে দেখিয়ে দেব। ওরে, দেবতাদেরও মন টলে নিখিল।

অবিনাশ কলমটা কানে গুঁজে জিজ্ঞাসা করে, চাঁপাতলা কিরে? সেখানে তো জুতসই টিপ পাওয়ার কথা নয়, আর জকিদেরও আড্ডা নয় যে—

ওরে ফ্ল্যাসবোর্ড, ফ্ল্যাসবোর্ড—জুয়ার আড্ডায় রোজ যায় অমিয়। দেখছিস না চেহারাখানা হয়েছে কি বাছাধনের! এই ক'দিন এসেই ডান হাত বাঁ হাত কামিয়েছে, তার হিসাব নিয়ে দেখ না গিয়ে কেউ। একটা টাকা ধার দাও, বলবে মনিব্যাগ খালি।

নিখিল কোনো হিসাব নিতে চায় না। কিন্তু তার মনের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। সে দূর থেকে অমিয়র মুখের দিকে। চেয়ে দেখে কোথাও তো সন্দেহের মেঘ নেই, শুধু যেন শোকে দুঃখে শুষে খেয়েছে ভিতরটা তারই প্রতিফলন হয়েছে বাইরে।

সেদিন বাড়ি ফেরার মুখে নিখিল স্থির করে বিনয়কে আজই একখানা চিঠি লিখে দেবে। যে সব কথা সে শুনেছে তা যদি ঠিক হয়, সে পথ থেকে ফেরাতে পারলে একমাত্র বিনয়ই পারবে।

অমিয় ওকে গ্রাহ্য করবে না। আর সত্যিই অমিয় কেমন যেন একটু হালকা বদমেজাজি হয়ে গেছে। তার পরিচয় নিখিল যে দু'চারটে কথার ভিতর না পেয়েছে তা নয়।

কিন্তু বিনয়কে এখন কি জানানো উচিত হবে?

এত দিন বাদে অমিয় এসেছে, যদি সে অমানুষ হয়ে এসে থাকে, সে ধাক্কাও তো বিনয়ের পক্ষে সামলানো দায় হবে।

অতএব কিছুদিন অপেক্ষা করাই ভাল। মৃতের শোক মানুষ ধীরে ধীরে সহ্য করে নেয়, কিন্তু মৃত আত্মার তাণ্ডব কিছুতেই সইতে পারছে না সে।

একটা দু'টো করে দিন কেটে যায়।

মাস কেটে যায় দু'টো।

ঝাঁকে ঝাঁকে কথা আসে নিখিলের কানে। সে কোনোটাকে আমল দেয় না। কিন্তু সাহসও হয় না হাতে-নাতে অমিয়কে গিয়ে ধরতে। সে কতকটা সহানুভূতি এবং বেশিটা কৃতজ্ঞতায় যেন অন্ধ হয়ে থাকে।

একটি মেয়ে বলে, আপনার বন্ধুকে নাকি অবিনাশবাবু এই শীতের রাত্রেও এখন জায়গায়, এমন সময়, এমন অবস্থায় দেখেছেন, তা নাকি ভদ্র সমাজে বলা যায় না।

অবিনাশ নিজে একটা জুয়ারী এবং লুচ্চা। আপনি কি তার কথায় বিশ্বাস করেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করি। অবিনাশবাবুর যে চরিত্রেরই মানুষ হন না কেন—

সত্য কথা বলতে তিনি কখনো পরোয়া করেন না।

নিখিল জবাব দেয়, ও আর কিছু নয়, মীনাক্ষীদেবী, ও যে দুটো পয়সা এদিক-ওদিক করে কামায়—তার জ্বালা। এ সংসারে যে কে কে সাধু তা আমার জানা আছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই সময়ই অমিয় এসে পড়ে, বলে, এই চিঠিটা যেন শীগগির রিসিভ করে বড়বাবুকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অমিয় চলে যেতে মীনাক্ষী হেসে ওঠে। সে তার ছোট সেণ্ট মাখান রুমালটা নাড়ায়। পেলেন তো সুবাস? বাপস, যেন বমি আসছিল আমার।

নিখিল গুম মেরে কাজ করে যায়। ছুটির পর সে অমিয়র সম্বন্ধে আগাগোড়া ভাবে—ভেবে স্থির করে, মদ খেলেও এখনো ওর চরিত্র অনেকের চেয়ে বড়। নিখিল বার বার তার পরিচয় পেয়েছে।

শীতের এক স্মরণীয় রাত্রি সুমুখে। সন্ধ্যার একটু আগে ট্রেন এসে হার্ডিঞ্জ ব্রিজে ওঠে। শিয়ালদা থামবে। লোহালক্কড়ের টক্করের শব্দে বিনয় যেন সচকিত হয়ে ওঠে। সে ঘড়ি দেখে বার বার, তার, হৃদয়টা স্পন্দিত হচ্ছে। কারণ কি সে ঠিক বোঝে না। এতক্ষণ সে নির্জীব হয়েছিল এখন চনচন করছে কেন রক্তপ্রবাহ?

বহুদিন পর দেখা হবে অমিয়র সঙ্গে। সে এসে যদি কথা বলে তবে ভাল। যদি স্তব্ধ বিষণ্ণ হয়ে থাকে, বিনয় কি সান্ত্বনা দেবে? সে তার শেষ কথা বলে দিয়েছিল টেলিগ্রামে—ওরে বোকা, খোঁজ কর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে। সেখানেও নাকি তন্ন তন্ন করেছে। ঘুরেছে সারা ভারত। এখন আর কি বলবে বিনয়। অমিয় তো ওর একটি কথাও অগ্রাহ্য করেনি। আর কি নির্দেশ দেবে বিনয়? বললে হয়তো দুর্দান্ত সাগর বন্ধনেও সে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যত দূর জানা যাচ্ছে অশোক কাননে সীতা নেই। এখন কি নিজ হাতে চিতা জ্বালিয়ে তাতে আত্মাহুতি দিতে বলবে অমিয়কে? বিদুষী দুঃখিনী সীতার জন্য আজকার অমিয়র এই শেষ দক্ষিণা হোক?

কথার বেনিয়া বিনয়ও চুপ করে থাকে। এ কি বলা যায়?

ট্রেন এসে থামতে নেমে পড়ে। ঘড়ি দেখে সে একটা বেবী ট্যাকসি ডাকে ডালহৌসী স্কোয়ার···সোজা চালাও। প্রায় পৌনে পাঁচটায়, পাঁচটার আগে পৌছন চাই—বিশেষ জরুরী।

মিটারটা নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার স্টার্ট দেয়।

ট্যাকসিটা কিছু দূরে এগুলে বিনয় ফের বলে, অফিস ছুটির আগে যাওয়া চাই। এক জনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। নইলে ক্ষতি হবে অত্যন্ত।

সাংঘাতিক ভিড়। শত চেষ্টা করেও ট্যাকসিখানা তেমন এগুতে পারে না। বিনয় অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

পাঁচটা দশ কি পনের।

ডালহৌসী স্কোয়ারের অফিসগুলো দিয়ে জলপ্রবাহের মত মানুষ নামছে —বড় সাহেব, কেরানী, মেয়ে টাইপিস্ট, বেয়ারা।

ট্যাকসি এসে নির্দিষ্ট অফিসের সুমুখে থামে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বিনয় সিঁড়ির দিকে ছোটে। কিন্তু ওপরে উঠতে পারে না।

হ্যালো বিনয়, কেমন ছিলি জলপাইগুড়ি। অবিনাশ এসে কাছে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে আর তিন চার জন। মীনাক্ষীও আছে সেই দলে। তার দেহটি ভাল করে স্কার্ফে জড়ানো। চোখেমুখে হাসি।

আমি একটু ওপর থেকে আসছি, তোরা একটু দাঁড়া, ভাই।

মীনাক্ষী যেন ব্যঙ্গ মিশ্রিত স্বরে বলে, সে তো ওপরে নেই।

বিনয় জিজ্ঞাসা করে, কে ?

আর কে? এক্সকিউজ মি, অমিয়বাবু তো ?

হ্যাঁ।

একটু আগে বেরিয়ে গেছেন।

নিখিল ?

তিনি তো পচা বেগুন বাসি তরকারির সন্ধানে ছুটেছেন। নতুন বিয়ে করেছেন তো !

তাই নাকি ? ভাল, কিন্তু অমিয় কোথায় গেছে জানেন কি ?

আমরা জানব কি করে, আমরা তো আর চেঞ্জের মিসস্ট্রেস নই। দীপা হলে না হয় দ্বীপময় ভারত ঘোরাতে পারতাম।

এসব আপনি জানলেন কি করে ?

আগুন কি চাপা থাকে কখনো—ঘরবাড়ি পুড়িয়ে থাকে।

সকলে হেসে ওঠে। অবিনাশ একটু বেশি হাসে। সে বিষম খাওয়ার অভিনয় করে।

বিনয় ভাবে, হয়তো কোনো দুর্বল মুহূর্তে কথাটা বেরিয়ে গেছে, তা নিয়ে বিদ্রূপ করা উচিত ?

মানু বলে, আরো সংবাদ আছে—যাকে বলে সুখবর।

শিপ্রা বলে, চলুন না ক্যানটিনে।

বিনয় একটু ইতস্তত করে আবার জিজ্ঞাসা করে, সত্যি কি অমিয় বেরিয়ে গেছে ?

অবিনাশ বলে, হ্যাঁ একেবারে কুলে কালি দিয়ে টলতে টলতে।

আবার সকলে হাসে।

শিপ্রা বলে, ওকে এখন হয়তো পাবেন মেট্রোর নিচে। সেখানে নাকি একখানা চমৎকার ডান্স ড্রামা চলছে। আমাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিল, আমি রিফিউজ করেছি, রাত হবে বলে।

অবিনাশ মন্তব্য করে, মেট্রোর নিচে না পাস ওকে, একেবারে সোজা চাঁপাতলার টিকিট কাটবি। দেখবি ফ্ল্যাস, রানিং ফ্ল্যাস, ট্রায়ো করছে। আর নইলে বুঝবি ঘোড়ার পিছে ঘুরছে কোথাও।

ওখান থেকে বিনয় বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়।

অমিয়র চরিত্র চিরকালই একটু ঢিলে. এখন কি তা একেবারে শিথিল হয়ে পড়েছে ? মেয়েদের সঙ্গে একটু বেশি মাখামাখি করতে ভালবাসে, দু' একদিন কার্নিভালে গিয়েও দু'বার টাকা খুইয়েছে—তা বলে সে ডুবে যাওয়ার ছেলে নয়। এরা মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। যে অমিয়র ভিতরটা দেখতে পেয়েছে, তার তো এ শৈথিল্য সহানুভূতির সঙ্গে না দেখে উপায় নেই। সে কিছুতেই একেবারে অমানুষ হয়ে যেতে পারে না।

মেট্রোর নিচেটা ভাল করে দেখে বিনয় বাড়ি যায়। এবং তার বোন অতসীকে জিজ্ঞাসা করে, অমিয় এসেছিল ?

না—এদিকে তো তুমি চলে যাওয়ার পর তিনি মারান নি! চলে যাওয়ার আগে এসেছিলেন আর নয়। কেমন আছো ? কখন এলে ?

সব ভাল। একটু চা কপ—এক্ষুনি আমাকে বেরুতে হবে, ঘুরে এসে খবর বলবো।

অল্প সময়ের মধ্যে চা নিয়ে অতসী ফেরে। বন্ধুর খোঁজ পাচ্ছ না বুঝি ? তা সেই তোমাদের ফুটপাথ ক্লাবে হত্যা দিয়ে দেখ না গিয়ে। এই তো আসর জমার সময়, মেম্বররা সব হা হুতোম্বি করছে। অনেক দিন বাদে তোমাকে দেখে প্রাইম মিনিস্টারের মতো সংবর্ধনা জানাবে।

অতসী, আমার র‍্যাপারখানা দে—বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। ঠিক যে ঠাণ্ডা তা-ও নয়—শারীরিক দুর্বলতা রয়েছে বিনয়ের।

তবু ভাল লাগে নিঃসঙ্গ অরণ্য পরিবেশ থেকে এই শহরে জনকল্লোল। কতদিন বাদে সে কলকাতায় ফিরেছে! অনেক অভিমান আছে এর ইঁট কাঠ কংক্রিট প্লাস্টারের বিরুদ্ধে। কিন্তু আকর্ষণও আছে অত্যন্ত। দীর্ঘ বনবাস থেকে না ফিরলে তো বোঝা যায় না, উঃ ওকে কোথায় ঠেলে পাঠিয়েছে এফিশিয়েন্সির জন্য।

ফুটপাথ ক্লাবে গিয়ে পৌঁছা মাত্র ভোম্বল এ্যাণ্ড কোং ওকে মাথায় তুলে নাচবার উপক্রম করে। ওরে, এই শীতের মধ্যে একটা চোট খেলে আমি আর বাঁচব না।

সে কথায় কেউ কান দেয় না।

অমিয় কোথায়, ভোম্বল?

এক্ষুনি আসবে, বিনয়দা। আমরা তো অপেক্ষা করছি।

হাস্য পরিহাসে ফুটপাথ ক্লাব জম জম করে ওঠে।

তাই অমিয় এসে যখন পৌঁছয়, তখন পূর্বের মতো বিনয় মশগুল হয়ে যায় হাসি ঠাট্টা চটুল শ্লেষে।

অনেকটা সময় কেটে যায় ফুটপাথে।

রেস্তোরাঁয় আর কারুর ঢোকা হয় না। রণজিৎ, শিবু সেন, ভোম্বল সবাইর চা এবং মাংসের লিপ্সা উবে যায়। পেটের ক্ষুধাকে সাময়িক হটিয়ে দিয়ে অন্য কোন্ ক্ষুধা যেন এই অবিবাহিত ছন্নছাড়াদের পেয়ে বসে। ওরা সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে।

মিশ্র গাঢ় এবং হালকা রঙের স্কার্ফের পটভূমিতে একখানা প্রফাইল এগিয়ে আসছে এদিকে ওদেরই কাছে যেন।

অমিয় প্রথম একেবারে চমকে ওঠে। তারপর বোঝে দীপা নয়।

তবে সন্ধ্যাবেলার সেই পিক্‌পকেট মেয়ে রেবতী নাকি? কিন্তু কেমন করে সে ফিরবে ঘুঘুডাঙ্গা থেকে? বয়সই বা বাড়বে কি করে অতটা?

বিনয়ও বিস্মিত হয়েছিল—তার মনেও ঝলমলিয়ে উঠেছিল দীপার মুখখানা। কিন্তু সে নয়। তবে আদল আছে যেন অনেকটা।

প্রফাইলখানা এগিয়ে আসতে আসতে কী বুঝে যেন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়।

কয়েক মুহূর্ত বাদে বিনয় ও অমিয় ছাড়া অন্য সবাই গুঞ্জন করে ওঠে। ওদের আবার ফিরে এসেছে পেটের ক্ষুধা। চলো, চলো রেস্তোরাঁয় ঢোকা যাক।

ভণ্ডুল বলে, আমার হিরোয়িনে দরকার নেই।

বিনয় এবং অমিয় মুখোমুখি ঝুঁকে বসে। বিনয়ের নাকে একটা উগ্র উৎকট গন্ধ যায়। সে বাইরে একান্তে অমিয়কে টেনে নিয়ে আসে। ছিঃ ছিঃ, তুই মদ ধরেছিস? এ আমি অফিসে এসেই শুনেছি। সবাই হাসাহাসি করছিলো। লজ্জায় আমি আর মুখ দেখাতে পারিনে। এখন বুঝি আর কিছু বাকি নেই।

অমিয় অনেকটা সংযত হতে চেষ্টা করলেও মত্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ কণ্ঠ

বেরিয়ে আসে, একটা ব্যাপার আছে, ব্রাদার।

তাই বুঝি দাঁড়িয়ে থাকিস এখানে ?

যা মনে করিস তুই।

রেস ক্ল্যাস কিছু বুঝি বাদ দিসনে ? আমি নেই, বখাটে নচ্ছারগুলো এমন করে তোর মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছে।

ওরা খেতে যাবে কেন, আমার বুঝি হিম্মৎ নেই ? দু'হাতে রোজগার করি, দু'হাতে আবার উড়িয়েছি। আমি নিখিল অথবা তোর মতো সৎ ছেলে নই।

তোর মুখ দেখাও মহাপাপ। আজ কতখানি টেনেছিস ?

তুই সে হিসেবের কী বুঝবি ? কখনো কী পেগের নাম শুনেছিস ?

আমার আর শুনে দরকার নেই। আমি চললাম। এই তোর সঙ্গে শেষ দেখা জানবি।

অত রাগ করতে নেই মদের সঙ্গে মাইরি—শোন্ শোন্,—একটু টলমান অবস্থায় অমিয় এগিয়ে যায়। কিন্তু বিনয়কে ধরা সম্ভব হয় না,—শোন্ শোন্—শেষের অনুরোধ মাতালের গলারও ঝংকার।

বিনয় ফিরে দাঁড়ায়, আজ নয়—তবে একদিন শুনব, যেদিন আমাদের মতো সৎ ছেলে হয়ে সত্যি সত্যি থাকবি।

যাও, যাও—সৎ পবিত্র যারা দূরে চলে যাও। অমিয় কারুকে ডাকতে চায় না। সে একা একা অন্ধকারেই থাকবে। এর বেশি এখন সে ভাবতে পারছে না। অনেক দূরে সে ভেসে এসেছে অবহেলা অশ্রদ্ধায়।

উনষাট

সহসা বিনয় চলে যাওয়ায় ফুটপাথ ক্লাবের মেম্বাররা একটু ঝিমিয়ে পড়ে। অমিয় চুপচাপ বসে আছে। সে কিছু মুখে দিচ্ছে না। তার মুখের দিকে চেয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায় না।

ভণ্ডুল বলে, আমার বিতংস অপেরায় রিহার্সেল আছে। আমি উঠি।

ভোম্বল বলে, চারটা পয়সা দাও না অমিয়দা, বিড়ি কিনব।—সে আর বিড়ি কিনে ফেরে না।

শিবু সেন বলে, আমার একটা ফাংশনে নেমন্তন্ন আছে। কাল আবার দেখা হবে। নমস্কার, অমিয়বাবু।

অমিয় একটু হেসে মাথা নোয়ায়।

এই সুযোগে বাদ বাকি সবাই কেটে পড়ে।

অমিয় সেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া প্রফাইলখানাই যেন দেখে সুমুখে। ভ্রান্তি নয় তো? নেশা নয় তো? সে ভাল করে চোখের পলক ফেলে কয়েকবার।

আমি রাস্তাটা খুঁজে পাচ্ছিনে। অনেকদিন বাদে এ অঞ্চলে আসছি, সব যেন পালটে গেছে।

হ্যাঁ তা বটে—চেনাই দায়।

মেয়েটি এক টুকরো কাগজ অমিয়র হাতে দেয়।

আসুন, আমার সঙ্গে।

কতদূর যেতে হবে?

বেশি দূর নয়।

আপনার তো অসুবিধা হবে না।

না, না, কিছু অসুবিধা নেই।

অমিয়র পিছু পিছু মেয়েটি হেঁটে চলে। দু'টো বড় রাস্তা পার হয়ে অমিয় একটা ছোট রাস্তার মোড় ঘোরে। এ পথটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার, নির্জনও বটে। মেয়েটি একটু যেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে। তবু এগিয়ে চলে অমিয়র সঙ্গে, গোটা চারেক বড় বাড়ি ছাড়ায়, একটা কয়লার আড়ৎ।

আর কতদূর? অনেকখানি তো এলাম।

অমিয় হাসে। একটু চেয়ে দেখে মেয়েটির সর্বাঙ্গ।

নিজের দুর্বলতায় মেয়েটি যেন লজ্জিত হয়। সে দ্রুততর করে দেয় তার চলার গতি। কিছু দূর এগিয়ে আসতে না আসতে আবার সে পিছিয়ে পড়ে।

আপনি দেখছি পরিশ্রান্ত। একটা রিকশা ডাকব না কি?

বলেন কী! এখনো রিকশা ডাকতে হবে? মেয়েটি মাঝপথেই দাঁড়িয়ে পড়ে। ক্ষণিকের জন্য তার কেমন যেন সন্দেহ জাগ্রত হয়।

অমিয় বলে, দূর বলে রিকশা ডাকতে চাইছে নে, চাইছি আপনার কষ্ট লাঘব করতে।

হোক—আর কতদূর বলুন তো?

ঐ যে, ঐ মোড়টা ছাড়িয়ে আর ক'কদম হাঁটলেই। শিব মন্দিরটার পাশ দিয়ে যে গলিটা উঠেছে দক্ষিণমুখী।

রাস্তার লোক চলাচল একেবারে পাতলা হয়ে গেছে। শীতের রাত্রি—দশটা তো বটেই। মেয়েটি চারদিকে তাকিয়ে একটু যেন দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

অমিয় সমস্ত বুঝতে পেরেও কিছু বলে না। সে হেঁটে চলে অনেকটা নিস্পৃহচিত্ত পরোপকারির মতো কিন্তু সহস্র প্রশ্নে উদ্বেল হয়ে ওঠে তার অন্তর।

এ মেয়েটি তো দীপা নয়। তবে কে? কেন এসেছিল এখানে? দীপার সঙ্গে ওর কী কোনো সম্পর্ক থাকা সম্ভব? অমিয় আলোর অভাবে এবং নিজের এই অস্বাভাবিক অবস্থার দরুন ভাল করে দেখতে পারেনি মেয়েটির গালে একটি নিটোল টোল আছে কিনা? সব ভুলে গেলেও ওটি ভোলা যায় না। ওটি ছিল দীপার মুখের সবচেয়ে বড় খুঁত—কিন্তু নিখুঁতভাবে কুঁদে দিয়েছিলেন বিধাতা।·

ওরা আরো কতকটা পথ ছাড়ায় নীরবে।

অমিয় স্মৃতির অতল থেকে পুরানো ঝাঁপিটা খুলে একটা ছবি বার করে। বার বার চেয়ে দেখে সঙ্গিনীর দিকে। পর্যাপ্ত আলোর অভাবে মিলাতে পারে না দুটি মুখ, একটি বহুদূরে অপসৃয়মান কিন্তু অপরটি তো তারই সঙ্গে হেঁটে চলেছে—রক্ত-মাংস উত্তাপে জীবন্ত।

এই যে গলিটা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলাম, কত নম্বর বলুন তো?

পঁচিশ।—মেয়েটি বলে, ধন্যবাদ আপনাকে। এতটুকু পথের জন্য রিকশা ভাড়া করতে চাচ্ছিলেন? দু'জনে আসতাম কী করে? আপনি যে কী উপকার করলেন ধন্যবাদ।

মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে বাড়ির নম্বর দেখে কড়া নাড়তে আরম্ভ করে।

এক্ষুণি অদৃশ্য হয়ে যাবে মেয়েটি। তবু অমিয় কুয়াশার ভিতর দাঁড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ মগজটা নেশায় যেন চন চন করে ওঠে। সে সিগারেট ধরায়। শুনতে পায়—

সুলতাদি, সুলতাদি!

কে গা?

অম্বিকা চক্রবর্তীর স্ত্রী সুলতাদি'কে খুঁজছি।

দোতলা থেকে গলা শোনা যায়। কে অম্বিকা চক্রবর্তী, সে তো এখানে থাকে না। নম্বর ভুল হয়েছে বাছা, অন্য বাড়ি দেখ। সুলতা বলে তো কারুর নাম শুনিনি আজ পর্যন্ত।

এইটে পঁচিশ নম্বর নয়?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তোমার নম্বর পঁয়ত্রিশও তো হতে পারে। ওরে বীণা, তোর বরের নাম কী অম্বিকা চক্রবর্তী না কি?

অ্যা, মরণ আর কী! প্রতি মাসে ভাড়ার রসিদ দাও কার নামে।

মেয়েটি ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে।

অমিয় অদূরে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে কুয়াশায় সে এক অব্যক্ত রূপ ধরেছে।

এখন আমি কী করি, বলুন তো? ভাগ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হল।

অমিয় যেন এমনি চায়—এমনি অসহায় অবস্থা।—চলুন, চিন্তা করবেন না। যা হোক একটা ব্যবস্থা হবেই।

খানিক হেঁটে একখানা ট্যাকসি পাওয়া যায়। মেয়েটির মুখ থেকে কোনো প্রশ্ন বার হয়ে আসার পূর্বেই সে দেখে যে নরম গদির ভিতর তলিয়ে গেছে।

কিছু সময়ের জন্য মেয়েটি দিশে হারিয়ে ফেলে—অন্তত অমিয় তা ভাবে, অপরিচিত একটি নারীদেহ বার বার তার স্নায়ু-চেতনাকে উত্তেজিত করে। শীতের ভিতর সে যেন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নাক মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে তার।

ট্যাকসিতে উঠে শুধু একটা নির্দেশ দিয়েছে অমিয় সোজা চালাতে। কিন্তু কোন পথে?

ভীরু কণ্ঠে মেয়েটি প্রশ্ন করে, কোথায় চলেছেন?

হঠাৎ অমিয়র সম্বোধন বদলায়, তুমি যেখানে যাবে।

আমি, আমি শেয়ালদা স্টেশনে। কিন্তু ট্যাকসি ভাড়ার অত টাকা কোথায় পাব? রাতটা না হয় ওখানে থেকে কাল চাকরির ইণ্টারভিউ দেব। আমার সঙ্গে মাত্র পাঁচসিকা আছে।

ট্যাকসি চালক একটু গতি মন্থর করে দিয়ে পথ জিজ্ঞাসা করে নেয়। অমিয় যে-পথ দেখায় সেটা শিয়ালদার পথ নয়।

ওঃ, চাকরির খোঁজে এসেছিলে? থাকো কোথায়?

ঘুঘুডাঙা স্টেশন থেকে মাইলটাক দূরে। আজ ইণ্টারভিউর কথা ছিল, কিন্তু হয়নি। কাল হবে বলেছে।

ঘুঘুডাঙার নামটা শুনে অমিয়র মাথাটা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। মনে পড়ে সন্ধ্যাবেলার পিকপকেট মেয়ের মুখখানা। এও রেবতীর মতো আর একটি নাকি?

অমিয় জিজ্ঞাসা করে, পাঁচসিকায় এতক্ষণ তোমার চলবে কী করে? ভাতের কথা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি, দু'বার একটু চা জল খাবার খেতেই তো ফুরিয়ে যাবে।

না—তা যাবে না। তারপর সে নিচু গলায় বলে, আমাদের কী অত খরচ করা পোষায়?

পুষিয়ে নিতে হবে, খরচা করতে হবে, নইলে ইণ্টারভিউতে সুফল হবে না।

কেন, কেন বলুন তো?

শরীরে না কুলালে কে ইণ্টারভিউ দেবে? আর কলকাতার শহরে কী পয়সার অভাব একটু কুড়িয়ে নিতে জানলে?

কলকাতা থেকে তো বেশি দূরে থাকিনে— আপনি কী ঠাট্টা করছেন?

কেন, এ কথা কী নতুন শুনছ ?

অনেক শুনেছি, কিন্তু জীবনে প্রমাণ পাইনি।

চলো, আজ পাবে।

আবার ঠাট্টা করছেন ? কিন্তু আর কত দূর শেয়ালদা ?

দেখছি বড্ড ব্যস্ত হয়েছে। ঐ তো—

মোটরের হেডলাইট নেভে। কিন্তু জ্বলে উঠে ফ্লাড বাতির লাইট। দ্বিতলের একখানা কোঠার দামী আসবাব পর্দা ঝকমঝ করে ওঠে। একটা বিলেতি কুকুর অভিনন্দন জানায় ঘেউ ঘেউ করে।

এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন ?

তুমি যেখানে যেতে চাচ্ছ—শেয়ালদা। ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেণ্ট নইলে তুমি শীতে কষ্ট পাবে যে।

মেয়েটি যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ করার পূর্বেই ভিতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

আমি চীৎকার করব।

কোনো কাজ হবে না—সে সময় উৎরে গেছে। আর যে চেঁচায় সে শাসায় না কখনো। তুমি কী আমাকে একেবারে বোকা ঠাওরালে।

মেয়েটি একটু কী যেন ভাবে। কী যেন মনে মনে তর্জমা করে! তারপর প্রস্তাব করে, তবে প্রথমে চায়ের ব্যবস্থাটা করতে বলুন চাকরকে।

অমিয় চায়ের হুকুম করে নিজের বেশবাস বদলাতে যায়। অচমকা মেয়েটির পরিবর্তন তার কানে বড্ড বেসুরো ঠেকে। গজল গাইতে গাইতে আকস্মিক যেন রাগপ্রধান সঙ্গীতে উত্তরণ।

তবে কী মেয়েটির সবই কৃত্রিমতা. সমস্তই মেকি ? সেও কী অভিনব উপায় শিকার সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল এই শীতার্ত শহরে ?

মুহূর্তে যেন নেশার বহ্বলতা কেটে যায় অমিয়র, তার ভিতর একটা বর্বর হিংস্রতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বার বাব সে ঠকেছে—তার প্রতিশোধ নিতে চায় অদম্য আক্রোশে।

পায়জামার ওপর গেঞ্জি ও র‍্যাপার চড়িয়ে অমিয় তাড়াতাড়ি ফেরে মেয়েটির কাছে—তোমার তো শাড়ি বদলাতে হবে ?

হ্যাঁ, তা হবে বৈকি—সারাদিনের নোংরা কাপড়। স্কার্ফটাও ভাল লাগছে না আর যেন।

তা তো লাগবেই না। আমার ঘরে শাড়ি নেই কিন্তু, ধুতিতে কী চলবে ?

কেন চলবে না ? গরীবের মেয়ে সব অভ্যাস আছে।

কথার বেলা তো মনে হয় টাটা কিংবা বিড়লার ভগ্নী।—অমিয় আলো জ্বালিয়ে বাথরুম দেখিয়ে দেয়।

এখন একটু চটপট সেরে নাও—নইলে চা জুড়িয়ে যাবে কিন্তু।

একটু বাদেই মেয়েটি ঘুরে এসে বলে, আমি কারুর বাসি কাপড় পরতে ভালবাসি না। যদি ধোপা বাড়ির কাপড় না থাকে—

থাকবে না কেন? আছে, আছে, এই রাসকেল, কী দিয়েছিস?

চাকরটা ছুটে যায়।

কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি একখানা ফিনফিনে ধুতি পরে সোফায় এসে বসে। আলোর ঝলকে শায়ার লেস পর্যন্ত চকচক ওঠে।

এই র‍্যাপারখানা নাও, বেশ জড়িয়ে মড়িয়ে বসো, আমি না হয় আর একখানা এনে গায় দিচ্ছি। বলে অমিয় নিজেই জড়িয়ে দেয় র‍্যাপারখানা মেয়েটির গায়।

—ওকি, অমন করলে যে।

বড্ড শীত, গায় যেন কাঁটা দিচ্ছে।

এবার তো ধোপ খাওয়ান নয় বলে আপত্তি তুললে না!

পশমী কাপড় সব সময়ই শুদ্ধ।

দেখছি শাস্ত্র জ্ঞানও আছে টনটনে। এমন আইবুড়ো বিধবা আমার নজরে পড়ল এই প্রথম।

মেয়েটি যেন অভিমানে ফুটে ওঠে। আপনি অনুগ্রহ করে একটা রাত্রির জন্য আশ্রয় দিয়েছেন, যা খুশি বলতে পারেন।

চোখের পাতা দু'টি-যেন সজল হয়ে ওঠে মেয়েটির।

অমিয়র পিত্ত জ্বলে যায়। এত ন্যাকামিও জানে এরা।

চা আসে। অমিয় আপ্যায়ন করে, চা খাও।

—আপনি?

—একটু পরে খাব।

অমিয় চা খাবে কী, মেয়েটির পাতলা দু'খানা ঠোঁটের দিকে চেয়ে থাকে আড় চোখে। পেয়ালাটার প্রতিটি চুমুক দিয়ে নেবে এক্ষুণি। সামান্য একটু প্রসাধনে কেমন অনবদ্য দেখাচ্ছে মুখশ্রী। সে ভুলে যায় একটু আগের বাক-বিতণ্ডা।

কিন্তু কী আশ্চর্য, মেয়েটি ধীরে ধীরে কোনো অপূর্ব ভঙ্গী না করে ঢক ঢক করে গিলে ফেলে চা টুকু।

এমন সময় নৈশ আহার্য পরিবেশন করে যায় চাকরটা। মেয়েটি কোনো

অনুরোধের অবকাশ না খেতে থাকে গোগ্রাসে।

অমিয় নীরবে চেয়ে থাকে—সময় কেটে যায় নীরবে। আজ দেওয়ালের ঘড়িটাও কেন যেন বন্ধ।

এমনি যেন একটা আকুল ব্যগ্রতা ছিল রেবতীর গোলাপী লাঠি চোষার ভিতর। একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র আবিষ্কার ক'রে চিন্তিত হয়ে পড়ে অমিয়।

পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করে আরো দু'খানা পরোটা ও ব্যঞ্জন দিয়ে যায় চাকরটা। অবশেষে আরো খানিকটা মিষ্টি সামগ্রী।

হাত মুখ ধুয়ে মেয়েটি বলে, ও কি, আপনার দেখি এখনো চা-ও খাওয়া হল না!

তাই নাকি! এঁ্যা, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অমিয় পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে খাবারের থালাটা টেনে নেয়, ঐটুকু খাবার খেতে তার যে কতক্ষণ গত হয় তা বুঝতে পারে না। সে ভাল করে খেতেই পারে না।

এক সময় সে স্বপ্নোত্থিতের মতো ওঠে, তুমি যে কথা বলছ না, রাগ করলে নাকি?

মেয়েটি নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলে, না, এমন আতিথ্য পেয়ে রাগ করব?

আচ্ছা, তোমার সঙ্গে যে তুমি তুমি করে কথা বলছি, তার জন্য তো কিছু মনে করো নি? কেন না তুমি একটি অপরিচিতা ভদ্রমহিলা!

যেন লাস্যজড়িত কণ্ঠে মেয়েটি হেসে ওঠে।—কি যে বলেন আপনি।

এতক্ষণ আলাপ, তোমার নামটি তো বললে না?

ভদ্রমহোদয়ের জিজ্ঞাসা করার সৌজন্যও তো দেখলাম না।

সে ত্রুটি অবশ্য আমি স্বীকার করে নিতে বাধ্য।

তা নয়, আমার সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি আপনি কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক।

না, না—এ তোমার একেবারে ভুল কনক্লুসন। সে একটু ঘুরে বসে, তার পিছনে একটি ড্রেসিং টেবিলে উজ্জ্বল আলো পড়ে। কতকগুলি সাজান জিনিস চিক-মিকিয়ে ওঠে।

এখন শুনুন আমার নাম—

ওকি থামলে কেন?

যদি মিথ্যা বলি?

জগৎই তো মিথ্যা—ওতে কিছু এসে যাবে না। তবু বলো, শুনি। ওর জন্য আমি আর কোর্টে যাব না। মিথ্যা যদি বলো, তোমার মতো মানান সই-ই একটা কিছু বলো।

মেয়েটি একটু ঘাড় ঘুরিয়ে বলে। চকিতে তার মুখ-খানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে চীৎকার করে ওঠে। এ ফটোখানা আপনি কোথায় পেলেন? এ যে দিদির ছবি।

চেঞ্জে পরিচয় হয়েছিল প্রায় বছর দুই আগে।

শুধু পরিচয় নয়, ঘনিষ্ঠতা ছিল বলুন।

হ্যাঁ, তা বলতে পার--কতকটা ছিল বইকি। তোমার দিদির নাম!

বাড়ির নাম সুনন্দা—ইস্কুলের নাম দীপাদেবী।

সত্যি!

এখনো অবিশ্বাস করছেন? আমরা তিন বোন। রেবতী ছোট, আমি শিখা—মেজো, সুনন্দা কি দীপাই বলুন—সে বড়।

আজ কি তোমার বাবা কলকাতা এসেছিলেন?

ঠিক জানিনে। আমি সকালে বেরিয়েছি। তবে তার পক্ষে একা আসা সম্ভব নয়—নিশ্চয়ই ছোটকি সঙ্গে ছিল।

ছোটকি কে?

রেবতী।

এখন কোনো সন্দেহ থাকে না অমিয়র।—এই, এখানে এ ছবিটা এল কোত্থেকে রে?

চাকরটা জবাব দেয় যে একটা পুরানো সুটকেসে ছিল—আজ সে ফ্রেমে এঁটে এখানে রেখেছে। সে হতবুদ্ধি হয়ে থাকে।

শিখা আবার উচ্চস্বরে বলে, নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠতা ছিল—নইলে হঠাৎ কেউ কি কোনো অপরিচিতার ফটো তুলে ঘরে বাঁধিয়ে রাখে? আপনি অন্য কোনো কথা বললে বিশ্বাস করব কেন?

আমি তো অস্বীকার করছিনে কিছু, তুমিই তো কোনো কথা বিশ্বাস করতে চাইছ না।

তবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এখন দিদি কোথায়?

না, তা ঠিক বলতে পারছি নে, এটাই হচ্ছে ট্রাজেডি।

সব জেনেশুনেও আপনি আবার ঠাট্টা করলেন? উঃ!

সত্যিই আমি কিছু জানিনে, শিখা। তুমি বিশ্বাস করো। আর যা জানি, বলার মতো তেমন কিছু নয়।

অনেক চেষ্টার পর দিদি ওখানে চাকরি পেয়েছিল। কর্তৃপক্ষ কাদের দু'জনকে যেন সারপ্লাস বলে নোটিস দিতে চাইল—তারই প্রতিবাদে দিদি নাকি এলো চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘুঘুডাঙা। তারপর এখানে সেখানে ঘুরে,

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে মাথা খুঁড়ে খুঁড়েও কিছু লাভ হল না। ক'দিন রক্ত উঠল গলা দিয়ে, হঠাৎ একদিন কোথায় যেন ডুব দিল মনের দুঃখে। আমাদের দু'বোনের পড়া বন্ধ হল—বাবা প্রায় অন্ধ হলেন শোকে দুঃখে। শিখা আর কিছু বলতে পারে না।

অমিয় বলে, আমিও অনেক খুঁজেছি তোমার দিদিকে। ঘরে ঘরে এই তো ইতিহাস। তুমি দুঃখ কর না শিখা।

তবু মেয়েটির দু'চোখ বেয়ে বড় বড় দু বিন্দু অশ্রু ফটোখানার ওপর ঝরে পড়ে।

আজ তুমি পরিশ্রান্ত, এখন ঘুমোও, কাল সব বলব ও শুনব? আলোটা নিবিয়ে দিয়ে অমিয় দ্রুত পদে অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে শিখার চোখ দুটো মুছিয়ে দিয়ে যায়।

অমিয় তার ঘরে গিয়ে একটা জানালা খুলে দিয়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে—শীতের নিশ্ছিদ্র নিশ্চুপ অন্ধকার। কতক্ষণ এভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকে বলা যায়। না। সে কত কি ভাবে, তাও লিখে শেষ করা যায় না।

ভোরের একটু আগে কলিং বেলের আওয়াজ হয়।

এ অসময় কে ডাকে?

অমিয় নিচে নেমে আলো জ্বালিয়ে দুয়ার খুলে দিয়েই বিস্ময়ে হতবাক

ষাট

একটু আগে একখানা ট্রেন এসে হাওড়া স্টেশনে ইন করেছে।

একটি বৃদ্ধার সঙ্গে একটি বয়স্কা মেয়ে থার্ডক্লাস থেকে নেমে এসে দেখা ক'রে এক পাশে দাঁড়ায়।

কি, তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে? বাড়ি থেকে গাড়ি এসেছে, তোমার কোনো কষ্ট হবে না। সকাল নাগাদ তুমি ঠিকানা মতো পৌঁছে যাবে।—তারপর তিনি একান্তে ডেকে বলেন, মোগলসরাই বসে বললে যে হাতে পয়সা নেই, সঙ্গেও লোক নেই, এসো আর লজ্জা কোরো না। লজ্জা করলে হয়ত তোমার জরুরী কাজটাই পণ্ড হবে। কারণ তোমার নাকি সকাল বেলায় সাক্ষাৎ করার দরকার।

মেয়েটি তবু যেন একটু সংকোচ বোধ করে। কারণ বৃদ্ধার সঙ্গে তার পোশাক-পরিচ্ছেদে অনেক পার্থক্য।

এসো, শীতে এখানে বসে কষ্ট করতে হবে না। বিপদে পড়ে একটু

সাহায্য নিলে মান যায় না।

বৃদ্ধার সঙ্গে মেয়েটি এসে গাড়িতে বসে।

সময় মতো গাড়ি বালিগঞ্জে পৌঁছায়।

বৃদ্ধা বলেন, তোমার যেমন ঠেকা তাতে আর দেরী করবে না, পারলে সুবিধা মতো এসে এক সময়—জানিয়ে যেও চিঠির কি ফলাফল হয়। যাও নীলু, ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো।

মিনিট পনের বাদে প্রাইভেটখানা আবার এসে একটা নিম্নমধ্যবিত্ত পল্লীতে থামে। ড্রাইভার বলে, সুমুখের বাড়িটা কুড়ি নম্বর।

মেয়েটি নেমে পড়ে।

একটি ছেলে বোধহয় একজামিনের পড়া পড়ছিল। তাকে মেয়েটি ডেকে বলে, ভাই, বিশ্বনাথবাবু আছেন। বছর সতের-আঠারো ছেলেটি একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। বই বন্ধ করে বলে, আছেন, বসুন, ডেকে দিচ্ছি বাবাকে।

এখন কি তিনি উঠেছেন? ক'টা বাজল? এখনো তো রাত আছে। বরং আমি এখানে একটু বসি। গায় স্কার্ফ নেই, তেমন কোন গরম জামাও নেই। আঁচলখানা ভাল করে জড়িয়ে বসে তরুণী। আধ-ময়লা শাড়ির একটা ছেঁড়া সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয় তাকে। বড্ড তাড়াতাড়ি আসা হয়েছে। বালিগঞ্জে একটু অপেক্ষা করলেই হত। মেয়েটি আবার ছেঁড়া সামলাতে প্রয়াস পায়। উসখুস করে একটু।

তরুণীর ঐ অবস্থা দেখে ছেলেটি ভেতরে যাওয়ায় জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে—তুমি বসে পড়ো, লজ্জার কি আছে, আমি বসছি।

সে হয় না, আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি গিয়ে!

তিনি তো অসন্তুষ্ট হবেন না?

কেন অসন্তুষ্ট হবেন? বরঞ্চ না ডাকলেই হয়তো রাগ করবেন। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

এই চিঠিখানা নিয়ে যাও, মুখে কিছু বলতে হবে না।

একটা ভাঙা আলমারীর পাশ দিয়ে ছেঁড়া পর্দাটা সরিয়ে সে ভিতরে চলে যায়।

বাবা, তোমাকে একজন ভদ্রমহিলা ডাকছেন।

বিনয় লাফিয়ে ওঠে। বাবাকে ডাকিস নে—রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি তাঁর।

বিনয়ের ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। সে শুয়ে শুয়ে কত কি যে ভাবছিল! এই ক'টা দিনের মধ্যে অমিয়টা কি হয়ে গেল যখন মানুষের পরিবর্তন হয়, তা এমনি মোড় ঘোরে। আর ওর সঙ্গে মেশার কোনো সম্ভাবনা নেই। মান

ইজ্জৎ খুইয়ে বন্ধুত্ব বজায় রাখা চলে না। অথচ বিনয় ওর জন্য হাতে পেয়েও কোহিনুর ত্যাগ করেছে। কিন্তু হতভাগা এমন অমূল্য পাথরখানা সামলে রাখতে পারল না। ওর বোকামির জন্যই কারুর ভোগে লাগল না। যদি এখন একবার টেরাইয়ের নির্জন অরণ্যের উপল-পাথরের ভিতর সে খোঁজ পায়— তবে আর বোকাকে জানাবে না। তুলে বন্ধ করে রাখবে সিন্ধুকে। এমন মহার্ঘ্য রত্ন মুর্খের জন্য নয়।

দাদা, যিনি এসেছেন তিনি একখানা চিঠি নিয়ে এসেছেন—এই ধরো খামখানা।

সুইচটা টিপে দে।

ভাই বিশ্বনাথবাবু,

অনেক দিন কলকতায় আপনার সঙ্গে থেকে আলাপ। একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন তখন—সে সময় আমায় ছেলেটি বেকার ছিল। আপনাদের দশজনার আশীর্বাদে একটা কোনো প্রকারে কাজ জুটিয়েছে। তাই তখন আর যাওয়া হয়নি। বলেছিলেন আপনার বড় ছেলের বন্ধুর মারফৎ সাহায্য করবেন।

এই পত্রবাহিকা একজন দুঃস্থ শিক্ষিতা ভদ্র মহিলা। এখন এঁকে যদি একটা চাকরি দিয়ে সাহায্য করেন, তবে চিরদিন আপনার কথা স্মরণ করব। আশা করি আপনার ছেলের বন্ধু তা পারবেন।

ঠিকানার কাগজটা অনেক দিন পকেটে থাকায় আপনার নামটা ছিঁড়ে গেছে শুধু বাড়ির নম্বরটা ঠিক আছে। আমিও অনেক চেষ্টা করে কিছুতেই মনে করতে পারলাম না আপনার সম্পূর্ণ নামটা। তার জন্য আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন। এমন ক্ষীণ সূত্র ধরে যিনি আপনার কাছে যাচ্ছেন তিনি যে কি পরিমাণ ঠেকা তা অবশ্যই আপনি বুঝতে পারছেন। ঈশ্বরের দোহাই তাঁর যেন অমর্যাদা না হয়। মহিলার নাম দীপা দেবী।

ইতি

ভবদীয়

শ্রীনিবারণ সেন।

ঠিকানাটা পড়েই বিনয় খালি গায়ে ছুটে আসে। চপ্পল জোড়া পর্যন্ত সে পায় দিতে ভুলে যায়।

অতসী মাঝের কোঠায় শুয়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করে, ও কি দাদা. অমন করে কোথায় যাচ্ছে ?

বিনয় দাঁড়িয়ে। সত্যি তো সে কোথায় যাচ্ছে ? ও কোহিনুরে তো

তার লোভ দেওয়ার কথা নেই মালিকের হাতেই তো পৌঁছে দেওয়া উচিত। মাতাল হলেই তো আইনের ঘরে তার স্বত্ব লোপ হয় না না।

মনের পাগলা হাতিকে সে অংকুশ মারে নির্মম ভাবে। তবু খানিকটা লাফালাফি করে।

ছেঁড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দীপার মুখখানা দেখা যাচ্ছে। বিনয় বলে, অতসী, একটু ওঠ, বোন। কে যেন একজন মহিলা দেখা করতে এসেছেন অমিয়র সঙ্গে। বোধ হয় কিছু সাহায্য চান। তোরা দু'ভাই-বোন দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েই চলে আসবি। অনুগ্রহ করে প্রয়োজনের বাইরে কিছু জিজ্ঞাসা করবি নে। আমার শরীরটা জ্বর জ্বর করছে, নইলে আমিই যেতাম। এই চিঠিখানা অমিয়কেই দেখাতে বলিস।

ওরা কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে যায় দীপাকে নিয়ে।

বিনয় ভিতরে একটা চেয়ার শক্ত করে ধরে বসে থাকে। দীপার জুতোর আওয়াজগুলোর যেন তার বুকের ওপর দিয়ে দাগ রেখে যাচ্ছে। যখন আর তা শোনা যায় না, তখন সে হাতটা ছেড়ে দেয় চেয়ারের। দিয়েই জামা গায় দেয় একটা, তারপর র‍্যাপারখানা টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

অতসী ও তার ছোট ভাইয়ের দীপাকে নিয়ে পৌঁছে দিতে খুব বেশি সময় লাগে না। ওরা পথে কোনো কথাবার্তা বলে না। বিনয়ের নির্দেশমত ওরা ওরা দোর গোড়া পর্যন্তই যায়। অমিয় কপাট খোলা মাত্র ওরা চলে আসে। অন্য দিন হলে অতসী হয়তো কিছু বলত কিন্তু আজ সে আবহাওয়া নয়।

দু'জনে দু'জনকে দেখে খানিক স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

অমিয় ভাবে, একি সত্যি, না সে জেগে স্বপ্ন দেখছে? কিন্তু একি শ্রী হয়েছে দীপার! তার বুকের মধ্যটা তোলপাড় করে ওঠে।

দীপা বলে, নমস্কার অমিয়বাবু, একখানা চিঠি আছে।

পাশের ঘর থেকে শিখা ছুটে আসে। কার যেন গলা শুনলাম—কে? দিদি তুই! তুই কোথেকে এলি এখানে? তুই কি বেঁচে আছিস? বাবা তোর জন্য প্রায় পাগল হওয়ার জোগাড়। ও এসে দীপার গলা জড়িয়ে ধরে।

এতক্ষণ তবু দীপা সামলে ছিল—এবার আর তা পারে না। সমস্ত পরিস্থিতির ধাক্কায় তার মাথার ভিতরটা যেন বন বন করতে থাকে। শিখা এখানে কি করে এলো, কেমন করে তা সম্ভব হল—সে কথা দীপা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যায়। ধরা গলায় সে অমিয়কে অনুরোধ করে, যে কোনো কারণে আপনার সঙ্গে আবার দেখা—বুঝতেই পারছেন একটা সংসার

আমার দিকে হাঁ করে রয়েচে—পারলে আমাকে একটা কিছুতে ঢুকিয়ে দিন—দীপা অমিয়র হাতে চিঠিখানা দেয়।

নিকটে একটা পার্কের ভিতর বিনয় হঁন হন করে ঘুরছে। আর মাঝে মাঝে চেয়ে দেখেছে, উষার আলোয় রাঙা হয়ে উঠছে এই পাষাণ নগরীর চিমনি কল-কারখানার শেড্। দিগ্‌বলয়ে কে যেন অগ্নিময়ী নারী। বেকারী দারিদ্র্যে সে ছিন্নবাস কৃশতনু—তবু অগ্নিময়ী। বিনয়ের চিনতে কষ্ট হয় না এ নারীকে। সে মনে মনে বলে, তোমার সঙ্গে শুধু চেয়ে দেখা সত্য নয়—তোমার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের জীবনের দাবি আদায়। তুমি নিপীড়িতা হলেও অগ্নিময়ী। আমার নতুন কর্ম-জীবনে ঠিক তোমাকে না দেখতে পেলেও তোমার প্রতিভূ অনেককে দেখতে পেয়েছি। তাই আজ আমার দুঃখ নেই।

সন্ধ্যা বেলা দেখা যায় যে, বিনয় একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে। সে যেন ভুলে গেছে সমস্ত বিগত স্মৃতি। কেন্দ্রীয় অফিসে সে গভীর আলোচনায় মগ্ন—এর পর আমাদের কি করণীয়?